৩৫-৪-৫২

ISSN 1605-7023

ষষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪০৮, নভেম্বর ২০০১

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

ISO 9001: Certified

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

সম্পাদনা পর্ষদ

ড. মো. ওমর ফারুক খান	চেয়ারম্যান
মোশারফ হোসেন	সদস্য
নূরুল আলম খান	,,
ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান	,,
শেখ আলতাফ আলী	,,

সম্পাদক ঃ বণিক গৌর সুন্দর





বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 6th Year Issue, Kartik, 1408
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকাল ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২

পি এ টি সি গ্রন্থাগার ঃ ০৫০.৩৫

টেলিফোন ঃ ৭৭১০০১০-১৫ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স ঃ ৭৭১০০২৯
ই-মেইল ঃ bpatc@bangla.net

গ্রাহক হওয়ার জন্য
যোগাযোগ-এর ঠিকানা ঃ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।

বিনিময় ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ ইছামতি অফসেট প্রেস
১/১ ডিআইটি রোড, হাজীপাড়া,
ঢাকা-১২১৭।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

১.	বৈদেশিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ বাংলাদেশের গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা বণিক গৌর সুন্দর	১
২.	পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবার কল্যাণ/ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ উন্নয়নে পরিকল্পিত জনসংখ্যার ভূমিকা **এস,এম, জোবায়ের এনামুল করিম**	১৭
৩।	**হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ তিনটি হাসপাতালের উপর একটি সমীক্ষা** **সৈয়দা পাপিয়া নাহিদ পপি** **মহামায়া আচার্য্য**	৪১
৪.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্হায় মানবসৃষ্ট সমস্যা ও কয়েকটি সুপারিশ মোঃ মাহমুদ হাসান	৫৭
৫.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া **মোঃ শাহ আলম গাজী**	৬৯
৬.	বাংলাদেশের বন্যা ঃ সমস্যা ও সম্ভাব্য প্রতিকার ব্যোমকেশ তালুকদার	৮৯
৭.	দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত মোঃ আবুল বাশার	১১৩
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ঃ বাস্তবতা ও বাস্তবায়ন মেহেদী মাসুদ	১২৭
৯.	বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য: তত্ত্ব এবং বাস্তবতা খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব	১৪৩

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

বৈদেশিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ বাংলাদেশের গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা

বণিক গৌর সুন্দর*

Foreign Aid and Economic Development: The experiences of last three decades in Bangladesh

Abstract

In the last three decades (1971/72 – 1999/00), Bangladesh received US$ 3634 crore as foreign aid. The question is how far this large amount of foreign aid has contributed to economic development of Bangladesh. This study has made an attempt to analyse the trends of different macro variables like growth, savings, investment, poverty, export, import, etc. over the last few years. The study also tried to relate whether the volume of foreign aid received in this period had any impact on the trends of the above macro variables. It has found very tenuous relationship between these macro variables and the volume of foreign aid. Therefore, the notion that foreign aid has contributed in the economic development process of Bangladesh remains questionable. In the study, it is found that in recent years, the economic growth has increased and the national savings ratio to GDP has also increased. Developments along these two macro variables are expected to reduce the country's dependence on foreign aid.

১.০ ভূমিকা

১.১ গত তিন দশকে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য এসেছে (১৯৭১/৭২-১৯৯৯/২০০০ পর্যন্ত মোট প্রায় ৩৬৩৪ কোটি মার্কিন ডলার, সারণী-১)। এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতখানি ভূমিকা রেখেছে সেটি এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। স্বাধীনতার পর থেকে এই বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পেছনে প্রত্যাশা ছিল যে বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে, সঞ্চয় বাড়িয়ে বিনিয়োগ ঘটাবে এবং অবশেষে বাংলাদেশের পরনির্ভরতা দূরীভূত হবে। অমর্ত্য সেন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "Development as Freedom" এর মুখবন্ধে বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উন্নয়ন মানে পরাধীনতার অবসান।

১.২ গত তিন দশকে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কেমন ভূমিকা রেখেছে সেটি বুঝতে হলে প্রথমেই বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রবন্ধটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা ও দাতাদের সাহায্য দেবার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে এবং তার কাঠামোগত পতিবর্তন নিয়ে কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদেশিক ঋণের সুবিদাভোগী কারা তা চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাম্প্রতিককালে দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্রো চলক যেমন প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আমদানি-রপ্তানী এবং দারিদ্র বিমোচন পরিস্থিতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ সাহায্য আসলে কতখানি প্রয়োজন তা মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.০ বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা ও দাতাদের সাহায্য দেবার কারণ

২.১বৈদেশিক সাহায্য কাকে বলে ?

২.১.১ আন্তর্জাতিকভাবে 'বৈদেশিক সাহায্য' কে অর্থনৈতিক সাহায্য বলা হয়ে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে বিশ্ব পুঁজি বাজারে প্রচলিত ঋণদান ব্যবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত নমনীয় শর্তে দাতা দেশ কর্তৃক গ্রহীতা দেশে সম্পদ হস্তান্তরকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। জাতিসংঘের ব্যাখ্যা মতে বৈদেশিক সাহায্য শুধুমাত্র কোন সরকার বা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি অনুদান বা দীর্ঘ মেয়াদী বেসামরিক ঋণকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে ।

২.১.২ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) এর উন্নয়ন সহায়তা কমিটি (DAC) এবং জাতিসংঘ বৈদেশিক সাহায্যের উপাদান হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে ঃ

ক. কোন সাহায্য অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে (সরকারিভাবে) প্রদান ও গ্রহণ করতে হবে । খ. সাহায্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে গ্রহীতা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন । সেজন্য পুঁজি বাজারের তুলনায় নমনীয় শর্তাধীনে ঋণ প্রদান করা হবে । গ. সামরি সাহায্য কখনো অর্থনৈতিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না । ঘ. খাদ্য সাহায্য, পণ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরী সাহায্য অর্থনৈতিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঙ. তাৎক্ষণিক জরুরী সাহায্য ও ত্রাণ অর্থনৈতিক সাহায্যের আওতাভুক্ত হবে ।

২.১.৩. বৈদেশিক সাহায্যের অবয়ব অনুসারে একে তিনভাগে ভাগ করা হয় - খাদ্য সাহায্য, দ্রব্য সাহায্য এবং প্রকল্প সাহায্য । সাহায্যের ব্যবহার অনুযায়ী একে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য এবং সাহায্যের বাণিজ্যিক দাম অনুসারে একে অনুদান (Grant) ও ঋণ (Loan) হিসেবে বিভক্ত করা হয় । সুদের হার অনুযায়ী ঋণ কঠিন (hard) অথবা কোমল (soft) হতে পারে। সাহায্যের শর্ত অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য শর্তহীন (untied) ও শর্তযুক্ত (tied) হতে পারে ।

২.১.৪ শর্তযুক্ত সাহায্য হচ্ছে সেই ধরণের সাহায্য যার প্রাপ্তি দাতার বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ইচ্ছাপূরণের উপর নির্ভর করতে পারে । শর্তযুক্ত সাহায্যের মধ্যে দাতার বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক শর্তও থাকতে পারে, যেমন, প্রাপ্ত সাহায্য

দ্বারা শুধুমাত্র দাতা দেশ থেকে পণ্য সামগ্রী কিনতে হবে, প্রাপ্ত সাহায্য ব্যবহারের জন্য দাতা দেশের বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে ইত্যাদি ।

২.১.৫ বৈদেশিক সাহায্যের চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের চরিত্র অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য দ্বি-পাক্ষিক অথবা বহু-পাক্ষিক হতে পারে। সরাসরি দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যে সম্পদ দাতা দেশ থেকে গ্রহীতা দেশে হস্তান্তরিত হয় তাকে দ্বি-পাক্ষিক সাহায্য (bilateral aid) বলে। অপরপক্ষে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা গ্রহীতা দেশে যে সাহায্য দেয় সেগুলো বহু-পাক্ষিক সাহায্য (multilateral aid) । কারণ, এসব সংস্থা অনেকগুলো দেশের প্রতিনিধিত্ব করে ।

২.২ দাতাদের সাহায্য দেবার কারণ

২.২.১ দাতা দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র পরার্থপরতা থেকেই সাহায্য দিতে উৎসাহিত হয় না । তাদের স্বার্থপরতাও অনেকাংশে এর সাথে জড়িত । ষাট-এর দশকের পর থেকে উন্নত বিশ্বে প্রবৃদ্ধির হার কমে এসেছে চাহিদার স্বল্পতাহেতু । অনুন্নত বিশ্বের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে উন্নত বিশ্বের দ্রব্যের চাহিদা বাড়ার কথা । এ ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যেও উন্নত বিশ্ব অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে থাকে ।

২.২.২ দাতা দেশসমূহের ঋণ বা সাহায্য প্রদানের পেছনে গ্রহীতা দেশসমূহের উপর দাতা দেশসমূহের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান । আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে একে 'নব্য উপনিবেশবাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় । দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক শক্তি সমূহের পতনের পর ষাট দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় একে একে নতুন নতুন অনেক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে । বেশীর ভাগ দেশই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল । কিন্তু ভগ্নদশাগ্রস্ত অর্থনীতি ও পংগু সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত উন্নয়নের প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যুদস্ত হয় । এ সুযোগে পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি যারা উপনিবেশ শোষণের মাধ্যমে ধনী দেশে রূপান্তরিত হয়েছে- সুযোগ বুঝে নতুন কায়দায় এই সকল দরিদ্র দেশে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা চালায় । যা অর্থনৈতিক সাহায্যের অবয়বে তাদের নগ্ন পরিকল্পনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে ।

৩.০ বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এবং এর কাঠামোগত পরিবর্তন

৩.১ স্বাধীনতার পর থেকে ২০০০ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত আমরা সরকারিভাবে প্রায় ৩৬৩৪ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান পেয়েছি (সারণী-১) । তাছাড়া গত দশ বছরে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের কাছ থেকে বৈদেশিক অনুদান এসেছে আরও ৭৫৬৭ কোটি টাকা (সারণী-৩)। ১৯৭১/৭২ অর্থবছরে যেখানে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ডলার সেটা ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫৯ কোটি ডলারে, অর্থাৎ তিরিশ বছরে বৈদেশিক সাহায্য প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী- ১
বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের অঙ্গীকার ও অবমুক্তি

(কোটি মার্কিন ডলারে)

বছর	অংগীকার			ব্যয়ন		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৭১/৭২	৫১.৩	৯.৮	৬১.১	২৪.৫	২.৬	২৭.১
১৯৭২/৭৩	৪৮.৩	৩৯.৫	৮৭.৮	৪৮.৬	৬.৫	৫৫.১
১৯৭৩/৭৪	১০.৭	৪৪.৮	৫৫.৫	২১.৮	২৪.৩	৪৬.১
১৯৭৪/৭৫	৩৪.৫	৯২.১	১২৬.৬	৩৭.৫	৫২.৬	৯০.১
১৯৭৫/৭৬	৩৮.০	৫৭.৮	৯৫.৮	২৩.৪	৫৬.৭	৮০.১
১৯৭৬/৭৭	৪০.০	৩২.৬	৭২.৬	২৫.৬	২৭.৯	৫৩.৫
১৯৭৭/৭৮	৪৩.৩	৭১.৪	১১৪.৭	৩৯.৩	৪৪.১	৮৩.৪
১৯৭৮/৭৯	৯৩.৬	৮২.৪	১৭৬.০	৫০.২	৫২.৮	১০৩.০
১৯৭৯/৮০	৪৮.৫	৬৬.৮	১১৫.৩	৬৫.০	৫৭.৩	১২২.৩
১৯৮০/৮১	৫৫.০	১০০.৯	১৫৫.৯	৫৯.৩	৫৫.৩	১১৪.৬
১৯৮১/৮২	৮০.৫	১১.৭	১৯২.২	৬৫.৪	৫৮.৬	১২৪.০
১৯৮২/৮৩	৮৩.৭	৬৮.৫	১৫২.২	৫৮.৭	৫৯.০	১১৭.৭
১৯৮৩/৮৪	৮৫.৯	৮৩.৬	১৯৯.৫	৭৩.৩	৫৩.৫	১২৬.৮
১৯৮৪/৮৫	৮৭.৫	১১০.৫	১৯৮.০	৭০.৩	৫৬.৬	১২৬.৯
১৯৮৫/৮৬	৮৭.৪	৭৮.৭	১৬৬.১	৫৪.৬	৭৬.০	১৩০.৬
১৯৮৬/৮৭	৮৯.৪	৭০.৯	১৬০.৩	৬৬.১	৯৩.৪	১৫৯.৫
১৯৮৭/৮৮	৮৮.১	৬৪.৮	১৫২.৯	৮২.৩	৮১.৭	১৬৪.০
১৯৮৮/৮৯	৬৬.১	১২১.২	১৮৭.৩	৬৭.৩	৯৯.৫	১৬৬.৮
১৯৮৯/৯০	৮৮.৫	১২৯.০	২১৭.৫	৭৬.৬	১০৪.৪	১৮১.০
১৯৯০/৯১	৪৮.৫	৮৮.৫	১৩৭.০	৮৩.১	৯০.১	১৭৩.২
১৯৯১/৯২	১১৪.০	৭৭.৫	১৯১.৫	৮১.৭	৭৯.৪	১৬১.১
১৯৯২/৯৩	৭৩.৪	৫৪.০	১২৭.৪	৮১.৮	৮৫.৭	১৬৭.৫
১৯৯৩/৯৪	৪৬.৪	১৯৪.৬	২৪১.০	৭১.০	৮৪.৯	১৫৫.৯
১৯৯৪/৯৫	৮৬.১	৭৫.১	১৬১.২	৮৯.০	৮৪.৯	১৭৩.৯
১৯৯৫/৯৬	৮৬.৪	৪১.৬	১২৮.০	৬৭.৭	৭৬.৬	১৪৪.৩
১৯৯৬/৯৭	৮৪.২	৮১.৯	১৬৬.১	৭৩.৬	৭৪.৫	১৪৮.১
১৯৯৭/৯৮	৫৮.৫	১২০.৬	১৭৯.১	৫০.৩	৭৪.৮	১২৫.১
১৯৯৮/৯৯	৮৬.২	১৭৮.৭	২৬৪.৯	৬৬.৯	৮৬.৭	১৫৩.৬
১৯৯৯/০০	৬১.৯	৮৫.৬	১৪৭.৫	৭২.৬	৮৬.২	১৫৮.৮
সর্বমোট	১৯৬৫.৯	২৪৩৫.১	৪৪০১.০	১৭৪৭.৫	১৮৮৬.৬	৩৬৩৪.১
শতকরা হার	৪৫	৫৫	১০০	৪৮	৫২	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১, পৃষ্ঠা ১৭৩ ।

৩.২ সারণী ২-এ এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বাস্তবায়িত চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের অংশ দেখানো হয়েছে। প্রথম থেকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়কালে দেখা যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তেমন একটা বাড়েনি । কিন্তু পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা দিন দিনই বেড়েছে (সারণী -২, সারি ২ এবং ৪)। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ব্যর্থতা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি থেকেই আমাদের সাহায্য নির্ভরতা বেড়েছে । ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অভীষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪০%। প্রকৃতপক্ষে সেটা বেড়ে হয় ৭২% । ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অভীষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৭৪% । প্রকৃতপক্ষে সেটা বেড়ে হয় ৭৭% । ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অভীষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৬৩.৫%, প্রকৃত পক্ষে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০% এ । অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকে ৯০ পর্যন্ত পরনির্ভরতা ক্রমশঃ বেড়েছে । ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অভীষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪৪.২৭%, প্রকৃত পক্ষে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭.৬৪% এ। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে, ৯০ পরবর্তী বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য কমেছে। সারণী -১ থেকেও এটি স্পষ্ট যে, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ গত প্রায় ত্রিশ বছরে ছয় গুণ বৃদ্ধি পেলেও গত দশ বছরে তা ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ১৯৮৯-৯০ সনে বাংলাদেশ ১৮১ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ করেছে। যেখানে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা কমে এসে পৌছেছে ১৫৮.৮ কোটি ডলারে।

সারণী-২
বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনায় পরিকল্পনা আয়তন, প্রবৃদ্ধির হার এবং বৈদেশিক সাহায্য

(কোটি টাকায়, প্রতিটি পরিকল্পনার ভিত্তি বছরের মূল্যে)

		FFYP ৭৩-৭৮	প্রকৃত	TYP ৭৮-৮০	প্রকৃত	SFYP ৮০-৮৫	প্রকৃত	TFYP ৮৫-৯০	প্রকৃত	FFYP ৯০-৯৫	প্রকৃত
১।	পরিকল্পনা আয়তন	৪৪৫৫	২০৭৪ (৪৭)	৩৮৬১	৩৮৫৯	১৭২০০	১৫৫৯৭ (৮৯)	৩৮৬০০	২৭০১১ (৭০)	৬২০০০	৫৯৮৪৮ (৯৬)
২।	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)	৫.৫	৪.০	৫.৬	৩.৫	৫.৪	৩.৮	৫.৪	৩.৮	৫.০	৪.১৫
৩।	মোট বৈদেশিক সাহায্য	১৭৮২	১৪৯১	২৮৫৭	২৫৮১	১৬২৫৪	১৩৬১৬	২৪৮৯৭	২৪৪১২	৮৩৩৮*	৭৫১৪*
৪।	পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের অংশ (%)	৪০	৭২	৭৪	৭৭	৬৩.৫	৮৯	৬৪.৫	৯০	৪৪.২৭	৪৭.৬৪

উৎস ঃ বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিল, পরিকল্পনা কমিশন, বন্ধনীর ভিতর শতকরা হার বুঝানো হয়েছে,* মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

সারণী-৩

বাংলাদেশে এনজিও-দের উদ্দেশ্যে বিদেশী অনুদান প্রবাহঃ ১৯৯০-১৯৯৯

সময়কাল (অর্থ বছর)	মোট এনজিও	মোট প্রকল্প	কোটি টাকা	কোটি ডলার
১৯৮৯-৯০	৩৮২	৮	২১.৭	০.৫
১৯৯০-৯১	৪৯৪	৪৬৪	৪২৬.৪	১০.৬
১৯৯১-৯২	৫৩৪	৫৪৯	৪৮৬.৫	১২.১
১৯৯২-৯৩	৭২৫	৬২৬	৭৮২.৮	১৯.৫
১৯৯৩-৯৪	৮০৭	৫৮১	৬৮৪.০	১৭.১
১৯৯৪-৯৫	৯১৯	৫৭৯	৮৩৮.০	২০.৯
১৯৯৫-৯৬	১০১৪	৭০২	১০৩৭.২	২৫.৯
১৯৯৬-৯৭	১১৩২	৭৪৬	১০৪১.০	২৫.০
১৯৯৭-৯৮	১২৩৯	৭০৫	৯৩৬.০	২০.৬
১৯৯৮-৯৯	১৩৬১	১০৪৫	১৩১২.৮	২৭.৩
মোট			৭৫৬৬.৭	১৭৯.৯

উৎস ঃ এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, প্রধান মন্ত্রীর অফিস (১ ডলার=৪৫.২৫ টাকা) ।

৩.৩ বাংলাদেশে গত প্রায় তিরিশ বছরে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের প্রবাহে কিছু কাঠামোগত রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) ঋণ-অনুদান কাঠামোতে পরিবর্তন

সারণী-৪ থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের ঋণ-অনুদান কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। গত তিরিশ বছরের মোট প্রাপ্তির প্রায় ৫২ শতাংশ ছিল ঋণ ও ৪৮ শতাংশ ছিল অনুদান। তুলনামূলক হিসেবে উত্তরোত্তর ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি ও অনুদানের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। মোট প্রাপ্তিতে যেখানে ১৯৭১/৭২ সনে ঋণের অংশ ছিল প্রায় ১০ ভাগ সেটা ১৯৯৮/৯৯ সনে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫৬ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দাতা গোষ্ঠী বৈদেশিক সাহায্যের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুদান দিয়ে শুরু করলেও উত্তরোত্তর আমাদেরকে অধিকহারে ঋণের চক্রে আবদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয় উত্তরোত্তর ঐ ঋণজাল হয়েছে অধিকতর শর্ত জালের ঋণ (tied loan) । আর এই শর্ত জালের ঋণ আমাদের দেশে নির্ভরশীল ভাড়াটে অর্থনীতির একটা কাঠামো সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে।

সারণী-৪

বৈদেশিক সাহায্যের কাঠামোগত পরিবর্তন (শতকরা ভাগে)

সাল	খাদ্য সাহায্য	পণ্য সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	ঋণ	অনুদান	বহুমাত্রিক	দ্বিপাক্ষিক
১৯৭১.৭২	৪৭.৯	৫০.৮	১.৩	৯.৫	৯০.৫	১৪.৩	৮৫.৭
১৯৭২.৭৩	৩৩.১	৫২.৪	১৪.৫	১১.৮	৮৮.২	৩৬.৭	৬৩.৩
১৯৭১.৭৩	৩৮.০	৫১.৯	১০.২	১১.০	৮৯.০	২৯.৩	৭০.৭
১৯৭৩.৭৪	৪৯.৬	২৩.৪	২৭.০	৫২.৬	৪৭.৪	১৯.৪	৮০.৬
১৯৭৪.৭৫	৪২.৪	৪১.৭	১৫.৯	৩৮.৪	৪১.৬	২৪.৫	৭৫.৫
১৯৭৫.৭৬	৩৯.২	৪৫.২	১৫.৭	৭০.৮	২৯.২	২৮.৬	৭১.৪

সাল	খাদ্য সাহায্য	পণ্য সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	ঋণ	অনুদান	বহুমাত্রিক	দ্বিপাক্ষিক
১৯৭৬.৭৭	২২.৭	৪৭.৬	২৯.৭	৫২.২	৪৭.৮	২৭.৫	৭২.৫
১৯৭৭.৭৮	২১.৩	৪৫.৬	৩৩.০	৫২.৯	২৭.১	২১.৮	৭৮.২
১৯৭৩.৭৮	৩৪.৭	৪১.৯	২৩.৪	৫৮.২	২১.৮	২৪.৬	৮৫.৪
১৯৭৮.৭৯	১৭.৪	৪৬.৯	৩৫.৮	৫১.৩	৪৮.৭	২৯.৫	৭০.৫
১৯৭৯.৮০	৩০.৬	৩০.৯	৩৮.৪	৪৬.৮	৫৩.২	২৭.৩	৭২.৭
১৯৭৮.৮০	২৪.৬	৩৮.২	৩৭.২	৪০.৮	৫১.২	২৮.৩	৭১.৭
১৯৮০.৮১	১৬.৯	৩৪.২	৪৮.৮	৪৮.২	৫১.৮	২৭.৯	৭২.১
১৯৮১.৮২	১৮.৬	৩৩.৯	৪৭.৫	৪৭.৩	৫২.৭	৩২.২	৬৭.৮
১৯৮২.৮৩	২১.৭	৩৮.৪	৩৯.৯	৫০.১	৪৯.৯	৩২.৫	৬৭.৫
১৯৮৩.৮৪	২১.৮	৩৪.৬	৪৩.৬	৪২.১	৫৭.৯	৩৫.৭	৬৪.৩
১৯৮৪.৮৫	১৯.৫	৩৪.০	৪৬.৫	৪৪.৬	৫৫.৪	৪৩.২	৫৬.৮
১৯৮০.৮৫	১৯.৭	৩৫.০	৪৫.৩	৪৬.৪	৫৩.৬	৩৪.৫	৬৫.৫
১৯৮৫.৮৬	১৫.৫	৩০.১	৫৪.৪	৫৮.২	৪১.৮	৫২.১	৪৭.৯
১৯৮৬.৮৭	১৪.১	২৫.২	৬০.৬	৫৮.৫	৪১.৫	৩৩.৯	৬৬.১
১৯৮৭.৮৮	১৮.৩	৩১.১	৫০.৬	৪৯.৮	৫০.২	৪৪.৯	৫৫.১
১৯৮৮.৮৯	১৩.৬	৩২.২	৫৪.২	৫৯.৭	৪০.৩	৪৬.৪	৫৩.৬
১৯৮৯.৯০	১০.৪	২৫.২	৬৪.৪	৫৭.৭	৪২.৩	৪৯.৬	৫০.৪
১৯৮৫.৯০	১৪.৩	২৮.৭	৫৭.১	৫৬.৭	৪৩.৩	৪৫.৩	৫৪.৭
১৯৯০.৯১	১৫.৫	২৩.৬	৬০.৯	৫২.০	৪৮.০	৬০.৭	৩৯.৩
১৯৯১.৯২	১৫.০	২৪.০	৬১.১	৪৯.৩	৫০.৭	৫৩.৪	৪৬.৬
১৯৯২.৯৩	৭.২	২২.২	৭০.৬	৫১.১	৪৮.৯	৪৫.৩	৫৪.৭
১৯৯৩.৯৪	৭.৬	২৯.০	৬৩.৫	৫৪.৪	৪৫.৬	৫৩.১	৪৬.৯
১৯৯৪.৯৫	৭.৯	১৯.১	৭৩.০	৪৮.৮	৫১.২	৪৭.২	৫২.৮
১৯৯৫.৯৬	৯.৬	১৫.৯	৭৪.৬	৫৩.১	৪৬.৯	৪৭.৬	৫২.৪
১৯৯০.৯৬	১০.৫	২২.৩	৬৭.২	৫১.৪	৪৮.৬	৫১.৩	৪৮.৭
১৯৯৬.৯৭	৬.৮	১৭.৮	৭৫.৪	৫০.৩	৪৯.৭	৫১.৬	৪৮.৪
১৯৯৭.৯৮	৭.৪	৯.৬	৮৩.০	৫৯.৮	৪০.২	৬১.০	৩৯.০
১৯৯৮.৯৯	১১.৫	২১.১	৬৭.৪	৫৬.৪	৪৩.৬	৫৭.৪	৪২.৬
১৯৯৬.৯৯	৮.৭	৯.০	৭৪.৮	৫৫.৩	৪৪.৭	৫৬.৪	৪৩.৬
মোট	১৬.৮	২৮.১	৫৪.২	৫১.৮	৪৮.২	৪২.৯	৫৭.১

উৎস ঃ Flow of External Resources into Bangladesh, ERD, ২০০০, পৃঃ ৩৮।

খ) ঋণ-অনুদানে খাতওয়ারী পরিবর্তন

বেশ দীর্ঘকালব্যাপী মোট বৈদেশিক সাহায্যে প্রকল্প খাতের বিপরীতে খাদ্য ও পণ্য খাতের আধিক্য থাকলেও উত্তরোত্তর প্রকল্প খাতই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে, যেমন ১৯৭২/৭৩ সনে মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮৫ শতাংশই ছিল খাদ্য ও পণ্য খাতে। খাদ্য খাতে ছিল ৩৩% ও পণ্য খাতে ছিল ৫২%। পরবর্তীতে এ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে (সারণী-৪) । গত ত্রিশ বছরের প্রবণতা সেটাই নির্দেশ করে। যেমন ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮৩ ভাগই এসেছে প্রকল্প খাতে। প্রকল্প-জালের বেষ্টনী যত শক্তভাবে কাজ করে গ্রহীতা দেশ থেকে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের অংশ তত অধিক হারে দাতা দেশে স্থানান্তরিত হয় ।

গ) সাহায্যের উৎসগত পরিবর্তন

উৎসগত দিক থেকে দ্বিপাক্ষিক দাতার (bilateral donors) বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতা (multilateral donors) প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিপাক্ষিক দাতার বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতা গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত অধিক অনড় ও পারঙ্গম। আর তাই দেখা যাচ্ছে যে উল্লিখিত শর্ত জালের কর্মকৌশল অধিকতর ফলপ্রদ করার স্বার্থে উত্তরোত্তর দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের বিপরীতে বহুপক্ষীয় দাতাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-৫

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের দায় দেনার বোঝাঃ ১৯৭১/৭২ - ১৯৯৯/২০০০

(কোটি মার্কিন ডলারে)

সাল	মোট প্রদেয়	ঋণ পরিশোধ			অপরিশোধিত ঋণ
		কিস্তি (মূল)	সুদ	মোট	
১৯৭১-৭২	২.৬				২.৬
১৯৭২-৭৩	৬.৫				৬.৫
১৯৭৩-৭৪	২৪.৩	০.৯	০.৯	১.৮	৩২.৪
১৯৭৪-৭৫	৫২.৬	৫.৮	১.৩	৭.১	৭৯.৩
১৯৭৫-৭৬	৫৬.৭	৩.৬	২.০	৫.৬	১৩২.৪
১৯৭৬-৭৭	২৭.৯	২.২	২.৮	৫.০	১৫৮.০
১৯৭৭-৭৮	৪৪.১	৩.৪	৩.১	৬.৫	২৫২.১
১৯৭৮-৭৯	৫২.৮	৫.০	৩.৯	৮.৯	২৯৩.৪
১৯৭৯-৮০	৫৭.৩	৭.০	৪.২	১০.৮	৩০০.৯
১৯৮০-৮১	৫৫.৩	৪.৪	৪.১	৮.৫	৩৫১.২
১৯৮১-৮২	৫৮.৬	৪.৫	৪.৭	৯.২	৩৯১.৬
১৯৮২.৮৩	৫৯.০	৮.৫	৫.১	১৩.৬	৪৩৫.২
১৯৮৩-৮৪	৫৩.৫	৭.১	৫.৮	১২.৮	৪৮১.০
১৯৮৪-৮৫	৫৬.৬	১০.৬	৬.৪	১৭.০	৫২৬.৮
১৯৮৫-৮৬	৭৬.০	১১.১	৭.৩	১৮.৪	৬১৪.০
১৯৮৬-৮৭	৯৩.৪	১৫.২	৮.১	২৩.৩	৭৫২.৮
১৯৮৭-৮৮	৮১.৭	১৬.৬	১২.৩	২৮.৯	৮৬৭.৫
১৯৮৮-৮৯	৯৯.৫	১৭.০	১২.৪	২৯.৪	৮৯২.৩
১৯৮৯-৯০	১০৪.৪	১৮.৬	১১.৬	৩০.২	৯৮০.৯
১৯৯০-৯১	৯৫.১	১৯.৭	১২.০	৩১.৭	১১৯৩.৪
১৯৯১-৯২	৭৯.৪	২১.০	১২.৭	৩৩.৭	১২৩৭.১
১৯৯২-৯৩	৮৫.৭	২৩.৯	১৩.৫	৩৭.৪	১২৭৪.৮
১৯৯৩-৯৪	৮৪.৯	২৬.৩	১৩.৯	৪০.২	১৪৫৬.২
১৯৯৪-৯৫	৮৪.৯	৩১.৪	১৫.৪	৪৬.৮	১৫৯৪.৭
১৯৯৫-৯৬	৭৬.৬	৩১.৭	১৫.৩	৪৬.৯	১৪৪৫.৪
১৯৯৬-৯৭	৭৪.৫	৩১.৬	১৪.৭	৪৬.৩	১৪৩৭.৩
১৯৯৭-৯৮	৭০.৬	৩০.৭	১৩.৭	৪৪.৪	১৩৪১.৮
১৯৯৮-৯৯	৮৬.৭	৩৭.০	১৬.৫	৫৩.৫	১৪৩৫.৪
১৯৯৯-২০০০	৮৬.২	৪৪.৭	১৭.২	৬১.৯	১৬২১.১
মোট	১৮৮৬.৬	৪৩৯.৩	২৪১.০	৬৮০.৩	

উৎস ঃ Flow of External Resource into Bangladesh, ERD ২০০০ (পৃঃ ১২০)

৩.৪ ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ আমাদের ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি করেছে। ক্রমবর্দ্ধমান ঋণের পরিমাণ, গ্রেস পিরিয়ড পার হয়ে যাওয়া এবং প্রতিকূল বিনিময় হার ক্রমান্বয়ে আমাদের পরিশোধিতব্য ঋণের (debt service payment) বোঝা বৃদ্ধি করেছে। যেমন, ১৯৭২/৭৩ সনে আমাদের মোট অপরিশোধিত ঋণের বোঝা ছিল ৬.৫ কোটি ডলার আর ১৯৯৯/২০০০ সনে তার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ১৬২১ কোটি ডলারে (সারণী-৫) । ঋণের কিস্তি ও সুদ প্রদানের পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪-এর ১.৮ কোটি ডলার থেকে ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬২ কোটি ডলারে। গত প্রায় তিরিশ বছরে (১৯৭১/৭২-১৯৯৯/২০০০) ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধে ব্যয় হয়েছে ৬৮০ কোটি ডলারের বেশী।

৪.০ বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা

৪.১ গত প্রায় ত্রিশ বছরে (১৯৭১/৭২-১৯৯৮-৯৯) সরকারিভাবে প্রাপ্ত ৩৪৭৫ কোটি মার্কিন ডলারের (প্রায় ১,৮০,০০০ কোটি টাকা) বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিধাভোগী কারা এ বিষয়ে হিসাব নিকাশ করা দুরুহ। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প দলিলের বিশ্লেষণ এবং বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ও কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কিছু অনুমান নির্ভর হিসাব করার প্রয়াস নেয়া হয়েছিল । বিভিন্ন ধরনের অনুমান নির্ভরতার কারণে হিসাবটি অত্যন্ত মোটা দাগের হলেও সেটা যথেষ্ট মাত্রায় মূল প্রবণতা নির্দেশ করতে সক্ষম । এক হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের প্রবাহ আমাদের দেশে আয়ের অসম বন্টন ত্বরান্বিত করেছে এবং সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে দেশী ও বিদেশী কিছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের হাতে । এই হিসাবে (সারণী-৬) দেখা যাচ্ছে যে, বিদেশের যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এজেন্ট ও পরামর্শকরা সম্মিলিতভাবে মোট সাহায্যের ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫,০০০ কোটি টাকা নিজেদের অনুকূলে প্রযোজিত করেছেন।

সারণী-৬

গত প্রায় তিন দশকে (১৯৭১/৭২-১৯৯৮/৯৯) বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের সুবিদাভোগী শ্রেণী সমূহ

সুবিধাভোগী শ্রেণীসমূহ	মোট সুবিধার পরিমাণ (কোটি টাকা)	সুবিধার শতকরা হার
বিদেশী যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী	২৩,৪০০	১৩
বিদেশী পরামর্শক	২১,৬০০	১২
দেশের কমিশন এজেন্ট	১০,৮০০	৬
আমলা-রাজনীতিবিদ	১২,৬০০	৭
নির্মাণ ঠিকাদার	২৩,৪০০	১৩
অন্যান্য ধনী ব্যক্তি (শহর ও গ্রাম)	৩৬০০০	২০
শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী যেমন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে নিয়োজিত শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, গ্রামীণ ঋণ গ্রহীতা ইত্যাদি	৪৫,০০০	২৫
মোট	১৮০,০০০	১০০

উৎস ঃ বারকাত, আবুল (২০০১), বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজনঃ গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত 'বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন?' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

৪.২ দেশের ভেতরের আমলা, রাজনীতিবিদ, কমিশন এজেন্ট, পরামর্শক ও নির্মাণ ঠিকাদাররা হাতিয়ে নিয়েছেন মোট সাহায্যের ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৪ হাজার কোটি টাকা । দেশের শহরে ও গ্রামীণ ধনী ব্যক্তিরা (উচ্চ মধ্যবিত্তসহ) পেয়েছেন ২০ শতাংশ অর্থাৎ ৩৬,০০০ কোটি টাকা । আর যাদের নামে মূলত: সাহায্য এসেছে ঐ গরীব শ্রমজীবী মানুষ পেয়েছেন মাত্র ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫০০০ কোটি টাকা। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায় যে, গত তিন দশকে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের নামে ৪৫০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে ১৩৫,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ধনস্ফীতির একটি সংগঠিত পথ সৃষ্টি করা হয়েছে। হতাশা উদ্রেককারী এই পরিস্থিতিতে কেউ কেউ মনে করেন বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে হয়ত বা শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত হবে এমন কিছু করা, যাতে করে ভবিষ্যতে শুধুমাত্র ঐ সমস্ত গরীব শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্যটুকুই গ্রহণ করা যায়।

৫.০ অর্থনীতির কয়েকটি ম্যাক্রো চলকের সাম্প্রতিক প্রবণতা

৫.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

৫.১.১. ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জিডিপি বেড়েছে বছরে গড়ে ৩.২ শতাংশ হারে। জনসংখ্যার হার (২.৬%) বাদ দিলে মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র দশমিক ৬ শতাংশের মত। বাংলাদেশ আমলে জিডিপির বৃদ্ধি ঘটেছে তার চেয়ে বেশী হারে, মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার (জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসার ফলে) আরও বেশী। ৭০ এর দশকে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.২%, আশির দশকে ৪.৪% , ৯০ এর দশকের প্রথমার্ধে ৪.৫% এবং শেষার্ধে তা ছিল ৫.৫% (সারণী-৭)। ২০০০ সালে তা ৬% পেরিয়ে যায়। মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৭০ এর দশকে ১.৪৬ শতাংশ হারে (পাকিস্তান আমলের চেয়ে ২.২ গুন বেশী)। আশির দশকে তা বেড়েছে ২.২% হারে (পাকিস্তান আমলের চেয়ে ৩.৩ গুণ বেশী) আর ৯০ এর দশকের প্রথমার্ধে ৩.৫% এবং শেষার্ধে ৪% এর বেশী (পাকিস্তান আমলের ৯ গুণ এর বেশী) হারে মাথাপিছু আয় বেড়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বিশেষ করে ভারতের চেয়ে প্রবৃদ্ধির দৌড়ে ৭০ ও ৮০ এর দশকে বাংলাদেশ বেশ পিছনে ছিল। ৯০ এর দশকে এই দুই দেশের প্রবৃদ্ধির হারে পার্থক্য কমতে থাকে এবং শেষ দিকে এসে বাংলাদেশ প্রায় ভারতকে ধরেই ফেলেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় এবং মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে ৯০ এর দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির এ সফল উত্তরণ ঘটে । স্বাধীনতা পরবর্তী গত তিন দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাত্রার সঙ্গে গত তিন দশকে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের বৃদ্ধির মাত্রা (সারণী - ১, ২ ও ৭) বিশ্লেষণ করলে দুটি অর্থনৈতিক ম্যাক্রো চলকের মধ্যে ক্ষীন সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ গত তিন দশকে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ সাহায্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে তেমন একটা ভূমিকা রেখেছে বলে প্রমাণ মেলে না ।

সারণী-৭
অর্থনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্রো চলকের সাম্প্রতিক প্রবণতা

খাত/উপখাত	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%), (১৯৯৫/৯৬ স্থির মূল্যে)	৫.০৪	৪.৫৭	৪.০৮	৪.৯৩	৪.৬২	৫.৩৯	৫.২৩	৪.৮৭	৫.৯৪
জিডিপির তুলনায় শতকরা হার									
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৩.৮৬	১২.৩০	১৩.১০	১৩.১৩	১৪.৯০	১৫.৯০	১৭.৪১	১৭.৭১	১৭.৮৮
জাতীয় সঞ্চয়	১৯.৩০	১৭.৯৬	১৮.৭৯	১৯.১২	২০.১৭	২১.৫৮	২১.৭৭	২২.৩১	২৩.১০
মোট বিনিয়োগ	১৭.৩১	১৭.৯৫	১৮.৪০	১৯.১২	১৯.৯৯	২০.৭২	২১.৬৩	২২.১৯	২৩.০২
সরকারি বিনিয়োগ	৬.৯৭	৬.৪৮	৬.৬৫	৬.৭৪	৬.৪২	৭.০৩	৬.৩৭	৬.৭২	৭.৪১
বেসরকারি বিনিয়োগ	১০.৩৩	১১.৪৭	১১.৭৬	১২.৩৮	১৩.৫৮	১৩.৭০	১৫.২৬	১৫.৪৭	১৫.৬১
আমদানী	১১.২২	১২.৭০	১৩.৩১	১৫.৫০	১৬.৯০	১৬.৯৩	১৭.০৯	১৭.৫৪	১৭.৮৩
রপ্তানী	৬.৩৭	৭.৪১	৮.০৫	৯.২১	৯.৫৫	১০.৪৮	১১.৭৬	১১.৬৫	১২.২৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১, পৃষ্ঠা ১৩৩।

৫.২ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে যে কোন দেশের জন্য বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আহরণ অত্যাবশ্যক। এই বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আহরনের প্রধান দুইটি উৎসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বা জাতীয় সঞ্চয় হচ্ছে একটি উৎস। বাংলাদেশ এর অভ্যুদয়-এর পর বেশ অনেক বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এর হার কাংখিত ও প্রয়োজনীয় মাত্রায় অর্জন করতে পারেনি বলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিনিয়োগ করার জন্য বাংলাদেশকে অধিক মাত্রায় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে বলে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করেন । সাম্প্রতিক কালে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এর হার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১/৯২ সালে সঞ্চয় এর হার যেখানে ছিল ১৩.৮৬ সেখানে ১৯৯৯/০০ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ১৭.৮৮। আর অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলশ্রুতিতে সঞ্চয়-বিনিয়োগ ফাঁক (Savings–Investment Gap) পূরণের জন্য কম মাত্রায় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করলেও অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম ।

৫.৩ আমদানী ও রপ্তানী

৫.৩.১ বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ আহরণে অন্য একটি উৎস হচ্ছে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (রপ্তানী আয়-আমদানী ব্যয়)। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সকল সময়ে আমদানীর হার রপ্তানী আয়ের উপরে অবস্থান করেছে । যদিও সাম্প্রতিক কালে রপ্তানী বৃদ্ধির হার আমদানী বৃদ্ধির হারের চেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়েছে তথাপিও আমদানী ব্যয় সকল সময়ে রপ্তানী ব্যয়ের উপরে অবস্থান করেছে।

সুতরাং আমদানী-রপ্তানী ফাঁক (Export–Import Gap) পূরণের জন্য হলেও বাংলাদেশকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে শুধুমাত্র সঞ্চয়-বিনিয়োগ ফাঁক এবং আমদানি-রপ্তানি ফাঁক পূরণের জন্যই দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়নি । পরিকল্পনাসমূহে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের কাম্য বরাদ্দ (optimum allocation) এবং এর পূর্ণ ব্যবহার (full utilisation) না হওয়ার কারণেও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে পারে । বাংলাদেশে সম্পদের বরাদ্দ সব সময় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ ছিল - এটা যেমন বলা যাবে না, তেমনি এও বলা যাবে না যে, বাংলাদেশে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সবসময় কাঙ্খিত মাত্রায় হয়েছে । তাছাড়া সম্পদের কাম্য বরাদ্দ হলেই যে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে - এমন বলা যাবে না। সম্পদ ব্যবহারের সংগে যে সকল মানুষ জড়িত তাদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও সততার উপর সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া নির্ভর করে । বাস্তবিক পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক এবং পূর্ণ ব্যবহার প্রত্যাশিত মাত্রায় হলে হয়তো বা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হতো না ।

৫.৪ দারিদ্র পরিস্থিতি

৫.৪.১ ৯০ এর দশকে দারিদ্র নিরসনে সামান্য হলেও বাংলাদেশ ইতিবাচক অবদান রেখেছে । ৯০ এর শেষার্ধে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র কমেছে (সারণী-৮)। ৯০ এর দশকের শেষার্ধে দারিদ্র যে কমেছে তার প্রমাণ মেলে গ্রাম বাংলায় প্রকৃত কৃষি মজুরীর পরিবর্তন থেকে। ৯০ সালে কৃষক গড়ে যে মজুরী পেত তা দিয়ে ৪.১৮ কেজি চাল কিনতে পারত । আর ২০০০ সালে ঐ মজুরী দিয়ে ৫.১১ কেজি চাল কেনা সম্ভব হয়েছে । জিনিসপত্রের দাম তেমন বাড়েনি বলে ক্ষেত মজুরদের প্রকৃত আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। পাশাপাশি পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণও তাদের বেড়েছে। তবে এই হারে দারিদ্র কমলে দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আরও বহুবছর লেগে যাবে। এই দারিদ্র মূলতঃ আয়ের অভাব থেকে উৎপন্ন।

সারণী-৮

সাম্প্রতিক দারিদ্র পরিস্থিতিঃ মাথা গণনা অনুপাত (%)

	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
জাতীয়	৪৭.০	৪৬.০	৪৬.৭	৪৪.৭
পল্লী	৪৭.৯	৪৬.৮	৪৭.৬	৪৪.৯
শহর	৪৪.৪	৪৩.৪	৪৪.৩	৪৩.৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১, পৃষ্ঠা ১০৭ ।

৫.৪.২ বাংলাদেশ আয়-দারিদ্র নিরসনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বড় মাপের সাফল্য দেখাতে না পারলেও মানবিক দারিদ্রের নিরসনে তুলনামূলক ভাবে ভাল করেছে। স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ ৯০ এর দশকে বিশেষ করে শেষার্ধে খুবই ভাল

করেছে। শিশু মৃত্যুর হার ৮০ এর দশকের শেষার্ধে ছিল প্রতি হাজারে ১০৫ । ৯০ এর দশকের প্রথমার্ধে তা কমে দাড়ায় ৮১ তে এবং শেষার্ধে তা আরও কমে দাড়ায় ৫১ এ । মায়েদের মৃত্যুর হারেও অনুরূপ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। শিশুদের পুষ্টি ক্ষেত্রেও একই রকমের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় । ৯০ এর দশকের শেষার্ধে বিশেষ করে এই অগ্রগতি লক্ষ্যনীয়। পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের ওজন সূচকে বড় মাপের উন্নতি ঘটেছে এই সময়ে। তবে লিঙ্গভেদে এই অগ্রগতি ভারসম্যপূর্ণ ছিলনা। অঞ্চলভেদেও পার্থক্য লক্ষণীয় । স্বাস্থ্য খাতে সরকারি খরচও এই দশকে বেড়েছে । কিন্তু স্বাস্থ্য সেবার মান বাড়েনি । শিক্ষা ক্ষেত্রেও একই দশা । সংখ্যাগত উন্নতি হয়েছে কিন্ত মান বাড়েনি । ১৯৯১ সালে বয়স্ক শিক্ষার হার ছিল ৩৯% । ২০০০ সালে এই হার ৬৪% এর উপরে উঠে গেছে । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ১৯৯১ সালে ছিল ৭৬% । ১৯৯৯ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯৭% । এই ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার বেশী । তবে শিক্ষার মান ছিল খুবই খারাপ । আয় বহির্ভূত দারিদ্রের নিরসন তুলনামূলকভাবে ভাল হওয়ার কারণে আমরা জাতিসংঘ উদ্ভাবিত মানব উন্নয়ন সূচকে কিছুটা ভাল অবস্থানে পৌচেছি । মানব উন্নয়ন সূচক বেড়েছে সামাজিক খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং গ্রাম বাংলার এনজিওসহ নানাবিধ উন্নয়ন তৎপরতার কারণে । খুব স্বাভাবিকভাবে আশা করা গিয়েছিল যে, এর প্রভাব নিশ্চয়ই গরীব মানুষের আয় উন্নতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে । খানিকটা সহায়তা নিশ্চয় করেছে । তবে পুরোপুরি সহায়তা করতে পারেনি ।

৫.৪.৩ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, একদিকে আয়ের বৈষম্য বেড়ে গেছে অন্যদিকে সুশাসনের অনুপস্থিতির কারণে দারিদ্র্য পরিস্থিতি ততটা উন্নত হয়নি । কৃষির প্রবৃদ্ধি না ঘটলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হত । তবে গবাদি পশু ও মাছ খাতের উন্নতির ফলে যে দ্রুত প্রবৃদ্ধি কৃষিতে লক্ষ্য করা গেছে তার সিংহ ভাগই ধনী কৃষকদের ঘরে উঠেছে । গরীবরা এর সুফল তেমন পায়নি । তবে কৃষির প্রবদ্ধির কারণে কম দামে চাউল কিনতে পেরে গরীব মানুষের কোনমতে বেচে থাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে । এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে গরীব লাভবান হলেও দরিদ্রতম অংশ তেমন উপকৃত হয়নি । তাছাড়া, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রবৃদ্ধি তেমন হারে ঘটেনি বলে চাকুরীর সুযোগ বাড়েনি । চোরাচালানের কারণেও শিল্পায়নে গতি আসতে পারেনি । ফলে প্রচুর বেকার যুবককে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত হতে দেখা যাচ্ছে ।

৫.৪.৪ এই পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ বলতে চান যে, এত বাজেট বরাদ্দ এবং এনজিওদের এতসব কর্মকান্ড (যা প্রায় পুরোটাই বিদেশী সাহায্যপুষ্ট) সত্বেও দারিদ্র নিরসনের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে ঘটছে না কেন । মূলতঃ সরকার ও এনজিওদের কাজের সমন্বয়, সহযোগিতা এবং সুশাসনের অভাবের কারণে এ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অনেকেই মনে করেন । যার যেখানে দক্ষতা সেখানে যদি সে বা তারা বেশী বেশী কাজ করত তাহলে দারিদ্র্য নিরসনে আরো খানিকটা সাফল্য

অর্জন করতে পারত। যেমন সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন (বিদ্যুৎ, রাস্তা-ঘাট, আইটি ব্যাকবোন, যোগাযোগ), শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং মানবপুজি উন্নয়নে বেশী মনোযোগী হলে বেসরকারি খাত তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে আরো পারদর্শিতা দেখাতে পারতো । কোন একটি এলাকায় সরকার যদি ভাল রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়ায় তাহলে সে এলাকার ব্যক্তিখাত মিল, ফ্যাক্টরী স্থাপন করে স্থানীয় বাজারের প্রসার ঘটাতে পারে এবং সেখানে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডের প্রভাবে দারিদ্র্য নিরসনের মাত্রা না বেড়েই পারেনা । এভাবে সকলের কাজে এক ধরনের সিনার্জি বা সমন্বিত সংযোগ ঘটতে পারে । বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের এত অর্থ বরাদ্দ সত্বেও সে ধরনের সিনার্জি ঘটেনি এবং সে কারণেই দারিদ্র্য নিরসনে তেমন গতি আসেনি । এজন্য বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকসহ দাতা গোষ্ঠী সরকারকে দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনা প্রণয়নে চাপ দিচ্ছে । অতিসম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত দাতা সংস্থাদের উন্নয়ন সভায় দারিদ্র্য নিরসন ও সুশাসন নিয়েই বেশী আলাপ আলোচনা হয়েছে ।

৬.০ বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য আসলে কতখানি প্রয়োজন

৬.১ বাংলাদেশে গত প্রায় ত্রিশ বছরে সরকারি খাতে যে ১৮০,০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য এসেছে সেটা বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে খুব একটা ত্বরান্বিত করতে পারেনি বলেই উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হচ্ছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক ঋণ সাহায্য খুব একটা ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয়না । দেশে সুরক্ষার বিধান নিশ্চিত করতেও বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য খুব একটা ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয়না । অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ঐ ঋণ-সাহায্যের ভূমিকা কতখানি সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ । উন্নয়ন বৈদেশিক ঋণ-সাহায্যের লক্ষ্য নয় - উপলক্ষ মাত্র । শুধু তাই নয় বৈদেশিক ঋণ সাহায্য তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশে স্বকীয়, সার্বভৌম আর্থ সামাজিক কাঠামো সৃষ্টিতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ।

৬.২ গত ত্রিশ বছরে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যে যে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছে সেটা দাতা গোষ্ঠীর স্বার্থেই ঘটেছে । দাতা গোষ্ঠির স্বার্থ চরিতার্থ করার স্বার্থেই উত্তরোত্তর অধিকতর অগ্রাধিকার পেয়েছে শর্ত বন্ধনযোগ্য প্রকল্প ঋণ । দাতা গোষ্ঠী উত্তরোত্তর অধিক হারে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সরাসরি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । ফরেন এইড নামক বিষয়টি একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশজ এলিট শ্রেণীর জীবন যাত্রা, মানমর্যাদা ও ক্ষমতা চিরস্থায়ী করণে সহায়তা করেছে । ফলে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে; যার স্থায়ী করণে দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে রাজনীতি ।

৬.৩ এমতাবস্থায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা যা বিবেচনা করতে পারি তাহলো প্রতিকূল শর্তের সকল ঋণ সাহায্য বর্জন করা । বিষয়টি শুধুমাত্র জরুরীই নয়, সেই সাথে সম্ভবও বটে।

প্রথমতঃ আমাদের দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিদেশী ঋণ সাহায্যের সাথে সহ সম্পর্কিত নয় । ১৯৯০ পরবর্তি বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমেছে । কিন্ত প্রবৃদ্ধি কম মাত্রায় হলেও ক্রমশঃ বেড়েছে। অপরদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী ৯০-এর দশক পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েছে কিন্তু তখন প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশী বাড়েনি । দ্বিতীয়তঃ মোট জিডিপির অনুপাত হিসেবে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের অবদান ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে । ১৯৮০-৮১ তে এই অবদান ছিল জিডিপির ১০% আর এখন জিডিপির ৪% । তাছাড়া জিডিপিতে কিছু অমূল্যায়িত দ্রব্য-সামগ্রী থাকে (যেমন বাজার সম্পর্কের আওতা বহির্ভূত উৎপাদন কার্যক্রম ও কালো অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম) যেগুলো হিসাব করলে বর্তমানে জিডিপির অনুপাতে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য হবে সর্বোচ্চ ২%, যা বর্জন করলে অর্থনীতির কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই ।

৬.৪ বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য আর যা বিবেচনা করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অনুকূল শর্তে ঋণ সাহায্য প্রাপ্তির উৎস অনুসন্ধান করা এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিটেন্স বৃদ্ধি করার জন্য সম্ভাব্য সকল বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া । এছাড়া বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

৭.০ উপসংহার

৭.১ যদি কোন দেশ বৈদেশিক সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নয়ন না করতে পারে তবে কি বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে উন্নয়ন সম্ভব? উন্নয়ন মূলত একটি স্বউদ্যোগী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বদেশজাত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সাথে সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নও সংঘটিত হয় । বৈদেশিক সাহায্য এ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে শুরু করতে পারে না । কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি শুরু হলে, তাকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে । তবে বৈদেশিক সাহায্য কী জন্য নেয়া হবে, কার জন্য নেয়া হবে এবং কতদিন পর্যন্ত নেয়া হবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে ।

৭.২ বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশের আর্থিক সম্পদ বাড়ায় । এই সম্পদ দেশের প্রকৃত সম্পদ (Real Resources) এবং উৎপাদন বাড়াবে কি না, সেটা নির্ভর করে নিম্নোল্লিখিত বিষয়ের উপর ঃ

১। আইনের শাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ,
২। প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি,
৩। যান্ত্রিক ও তথ্যগত কাঠামোর উন্নয়ন এবং
৪। মানব শক্তির উন্নয়নের পর্যায় ।

৭.৩ বাংলাদেশের গত ত্রিশ বছরের বৈদেশিক সাহায্যের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজেদের আস্থা

এবং জাতীয়তাবোধ ও মর্যাদাবোধ গত তিন দশকে অনেক হ্রাস পেয়েছে । এর ফলে আমরা নিজেদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে আবিস্কার করতে পারছি না । জাতির সামনে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা থাকতে হবে । দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টার ভূমিকা পালন করতে পারে না । আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উজ্জীবিত করে আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই সমাধান করতে হবে । কল কারখানা চালু না করে, উৎপাদন না বাড়িয়ে, বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে শুধু বিলাসবহুল গাড়ী আমদানী করে, অফিসের সাজ-সরঞ্জাম, ভোগ বিলাস ইত্যাদি অব্যাহত রেখে অনুদান পেয়েও কোন লাভ হবে না । বৈদেশিক অনুদান ও সাহায্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন । ভোগ নয়, বিলাসিতা নয়, উৎপাদনকেই করতে হবে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

Government of the People's Republic of Bangladesh, 2000, Flow of External Resources into Bangladesh, Economic Relations Division, Ministry of Finance, Dhaka.

Government of the People's Republic of Bangladesh, 2000, Mid-Term Review of the Fifth Five Year Plan, 1997-2002, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka.

Sobhan, Rehman and Islam,T. 1988. "Foreign Aid and Domestic Resource Mobilization in Bangladesh", The Bangladesh Development Studies, Vol.XVI. No.2.

Sobhan, Rehman, 1990. From Aid Dependence to Self–Reliance: Development Options for Bangladesh, Dhaka : University Press Limited.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১ম - ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

বারকাত, আবুল (২০০১), "বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজনঃ গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন? শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবার কল্যাণ/ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ উন্নয়নে পরিকল্পিত জনসংখ্যার ভূমিকা

এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম*

Review of the Activities of Family Welfare/Population Control in the Fifth Five Year Plan: Role of Planned Population in Development

Abstract

Bangladesh is a over populated country in terms of its density of population and total area of land. This leads to serious adverse consequences for our overall development. This article tries to highlight the concept of planned population growth and economic development, significance or implication of population growth, objectives & aims related to policies, strategies and programmes regarding family welfare and population control in the light of the Fifth Five Year Plan (FFYP). Roles of non-government organizations to build a planned family have also been discussed in this article. Besides, an attempt has been made to find out the challenges we are to face in future to build a small family. And the probable steps to overcome these situations are also discussed.

ভূমিকা

ক্ষুদ্র একটি ভূখন্ড, সীমিত সম্পদ, অনুন্নত অর্থনীতি, প্রত্যাশিত হারের নীচে শিক্ষিতের হার, বিশাল জনসমষ্টি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা সম্বলিত বাংলাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা ১৩ কোটি ১৫ লক্ষ (জানুয়ারী ২০০১) যার মধ্যে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত যথাক্রমে ১০৬ঃ১০০। এদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৮৮২ জন লোক বাস করে। পরিবার প্রতি আমাদের সদস্য সংখ্যা ৫.৬ জন এবং সক্ষম দম্পতির সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪২[১] । সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নে দেখা যেতে পারে[২]।

---

* ঊর্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

১. বিবিএস(১৯৯৯), "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯৯, ঢাকা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়(২০০১) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০১, ঢাকা।

২. আলম বিলকিস আরা ও আযম, কে,কিউ (সম্পাদক) (১৯৮৬), ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল, এনআই এলজি, ঢাকা।

বছর	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার
১৬৫০	১ কোটি	-
১৭০০	১ কোটি ৭০ লক্ষ	-
১৮০০	১ কোটি ৭০ লক্ষ	-
১৮৫০	২ কোটি	-
১৮৭২	২ কোটি ২৮ লক্ষ	-
১৮৮১	২ কোটি ৪১ লক্ষ	-
১৮৯১	২ কোটি ৭০ লক্ষ	-
১৯০১	২ কোটি ৮৯ লক্ষ	.৮২
১৯১১	৩ কোটি ১২ লক্ষ	.৫৬
১৯২১	৩ কোটি ৩২ লক্ষ	.৮৭
১৯৩১	৩ কোটি ৫৫ লক্ষ	১.৪৪
১৯৪১	৪ কোটি ১৯ লক্ষ	.৯১
১৯৫১	৪ কোটি ২১ লক্ষ	২.১৬
১৯৬১	৫ কোটি ৪৫ লক্ষ	৩.১৫
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ	৩.০০
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ	২.৩২
১৯৯১	১০ কোটি ৮০ লক্ষ	২.১৭
১৯৯৫	১১ কোটি ৯৭ লক্ষ	১.৮২
১৯৯৭	১২ কোটি ৪০ লক্ষ	১.৬
২০০০	১২ কোটি ৯২ লক্ষ	১.৩৮
২০০৫	১৩ কোটি ৬৫ লক্ষ(প্রক্ষেপিত)	১.২৩

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যায়, প্রথম পর্যায়ে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছিল ২০০ বছর (১৬৫০ থেকে ১৮৫০)। কিন্তু এরপর ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩০ বছরে এদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে।

অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অব্যাহত ধারা আমাদের জনসংখ্যাকে সমস্যায় পরিণত করেছে। জনসংখ্যার এ অব্যাহত বৃদ্ধি খাদ্য,আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, নিয়োগ, বস্ত্রও বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ও পরিবহণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, লেনদেন ভারসাম্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনীতি প্রভৃতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যার আশু সমাধানের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি। এ প্রবন্ধে পরিকল্পিত জনসংখ্যার ধারণা, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির তাৎপর্য ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া, পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা/কল্যাণ সংক্রান্ত উদ্দেশ্যাবলী এবং সংশ্লিষ্ট নীতি, কৌশল ও কর্মসূচি, জনসংখ্যা কার্যাবলীতে মন্ত্রণালয় ও এনজিওসমূহের ভূমিকা, পরিবার পরিকল্পনা/কল্যাণ সংক্রান্ত ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা, ইত্যাদি সম্পর্কে

আলোকপাত করা হয়েছে। সাধারণভাবে পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি বলতে বুঝি পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ। এ পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে জনসংখ্যার হার কত হবে তা বর্তমানেই নির্ধারণ করা হয়। এ পরিকল্পনার প্রাক্কালে জনসংখ্যার সহিত দেশের সামগ্রিক সম্পদের তুলনা করা হয়। অর্থাৎ দেশে জম্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা, যার ফলে জনসংখ্যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বোঝা না হয়ে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। যদি কোন দেশের জম্মহার মৃত্যুহার থেকে অস্বাভাবিকভাবে বেশী হয় তবে দেশের সম্পদ ও ভোগের অনুপাতে অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। তখন জনগণ তার প্রয়োজনের তুলনায় কম ভোগ করে, পক্ষান্তরে, দেশের জনসংখ্যা যদি তার সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে তাহলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হয়।

পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জনসংখ্যার আকার, ঘনত্ব, জনসংখ্যার কাঠামো ও বৃদ্ধি মোট জনসংখ্যার সহিত সম্পদের হিসাব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়ে কি পরিমাণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে তা সে সময়ের জনসংখ্যার আকার হতে নির্ণয় করা হবে। তাই ভবিষ্যতে জনসংখ্যার আকার, ঘনত্ব, বৃদ্ধির হার, স্ত্রী-পুরুষের হার, শ্রম শক্তির পরিমাণ, গ্রাম ও শহরবাসীর সংখ্যা, কৃষিজীবীর সংখ্যা, বিদ্যালয়ে যাতায়াতকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির ধারণা থেকে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক পরিকল্পনারই লক্ষ্য থাকে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয়। ভবিষ্যতে মোট শ্রমশক্তির পরিমাণ কত হবে এবং এর মধ্যে শিক্ষিত দক্ষ শ্রমশক্তির পরিমাণ কত থাকবে, তাছাড়া অদক্ষ শ্রমশক্তি দক্ষ করার জন্য কি পরিমাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য কি পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে প্রভৃতি পরিকল্পিত জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

খাদ্য মানুষের জীবনধারণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ভবিষ্যতে জনসংখ্যার জন্য কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হবে এবং উক্ত খাদ্যের প্রয়োজন মিটাবার জন্য কৃষি ক্ষেত্রে কি পরিমাণ নতুন বিনিয়োগ এবং কারিগরী ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে তা পরিকল্পিত জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির ধারণা থেকে জানা যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণের শিক্ষাক্ষেত্রের সম্প্রসারণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে কি পরিমাণ জনসংখ্যার জন্য ক'টি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় নতুনভাবে স্থাপন করতে হবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কি পরিমাণ আসবাবপত্র ক্রয় করতে হবে এবং কি পরিমাণ পুস্তকাদি উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ক্রয় করতে হবে তাও পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির ধারণা হতে নির্ণয় করা যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে জনগণের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে হয়। জনগণের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে তজ্জন্য হাসপাতাল, চিকিৎসা, ঔষধপত্র এবং সুষ্ঠু পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা সরকারকে করতে হয়। পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির ধারণা হতে জানা যাবে যে কি পরিমাণ চিকিৎসকের, হাসপাতালের, বেডের, ঔষধপত্রের, পয়ঃপ্রণালীর প্রয়োজন হবে। শুধু তাই নয়, উক্ত জনসংখ্যার জন্য কি পরিমাণ রাস্তা-ঘাট, বাড়ী/ঘর, যানবাহণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে তাও আমরা পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হতে জানতে পারি। অতত্রব, পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার কথা অতি সহজেই অনুমেয়।

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির তাৎপর্য

বস্তুত যুব বয়সের জনসংখ্যার বিরাট ভিত্তির কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির অত্যধিক সম্ভাবনা রয়েছে। স্বল্প মেয়াদে ২০০৫ সালে অর্জিত এনআরআর-১ এর আশাবাদী অনুমানের উপর ভিত্তি করে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে জনসংখ্যা ১৯৯৭ সালের ১২৩.৮ মিলিয়নের সাথে নীট ৮.৮ মিলিয়ন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে, ধরা যাক ২০২০ সালে, জনসংখ্যার নীট বৃদ্ধি দাঁড়াবে ৪২.৭৪ মিলিয়ন। অর্থনীতির বর্তমান অবস্থায় জনসংখ্যার এই প্রবৃদ্ধি আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নানা ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলবে[৩]।

প্রথমতঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধির সবচাইতে গুরুতর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হবে সামাজিক খাতে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় নিবন্ধনকৃত ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৭.৩ মিলিয়ন যা নীট নিবন্ধন হিসেবে ৯২ শতাংশ এবং শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ছিল ১ঃ৭০। সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১ঃ৫০-এ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এর জন্য প্রয়োজন হবে অধিক সংখ্যক শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ সুবিধা, সরঞ্জাম ইত্যাদি যেগুলোর সংস্থান করতে বর্তমান সম্পদের দ্বিগুণ প্রয়োজন হবে।

দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য খাতে নৈরাজ্যমূলক দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যেখানে প্রাথমিক ও বিশেষ উভয় ধরনের স্বাস্থ্য সেবাই এখনো অপর্যাপ্ত। এখানে এখনোও ডাক্তার, নার্স, ঔষধ, হাসপাতাল সেবা, প্রভৃতির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে ডাক্তার-জনসংখ্যা অনুপাত ১ঃ৫৫০৬, হাসপাতাল শয্যা-জনসংখ্যা অনুপাত ১ঃ৩২৩১ এবং মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় বছরে ১৩৫ টাকা[৪]। যদি বর্তমান সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটিয়ে ন্যূনতম সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়, তবে মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় দ্বিগুণ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ ভুমির উপরে তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়বে। বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৮২ জন যা' বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে দাঁড়াবে ১১৩০ জনে। এতে করে বিদ্যমান জন/ভূমি অনুপাত (শতাংশ হিসেবে) ১ঃ১৮ মারাত্বকভাবে প্রভাবিত

৩। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পৃঃ ৪৪৩।
৪। পূর্বোক্ত।

হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে এবং ভূমিহীন জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে যা দারিদ্র পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটাবে।

চতুর্থতঃ মোট ভূমি যার দুই-তৃতীয়াংশ বর্তমানে আবাদযোগ্য তা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন এবং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহের উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বর্তমানে খাদ্য আমদানীর জন্য সরকারের বার্ষিক ব্যয় ৫৬০০ মিলিয়ন টাকা । যদি ২০০২ সালে প্রাক্কলিত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয়, তাহলে সরকারের খাদ্য আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যা অর্থনীতির অন্যান্য খাতের উন্নয়ন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে মেটাতে হবে।

পঞ্চমতঃ জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষম জনসংখ্যা (১৫-৫৯ বছর) ১৯৯৭ সালের ৬৬.৬ মিলিয়ন হতে ২০০২ সালে ৮০.২ মিলিয়ন, ২০১০ সালে ৯৮.১ মিলিয়ন এবং ২০২০ সালে ১০৯.১ মিলিয়নে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে[৫]। ফলে অর্থনীতিতে কর্মক্ষম এই জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যা আয় বর্ধনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে। সবশেষে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি মাথাপিছু জিডিপি ও জিএনপি-র প্রবৃদ্ধিকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করবে।

ষষ্ঠতঃ জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মক্ষম জনসংখ্যার ওপর মোট জনসংখ্যার নির্ভরশীলতা বেড়ে যাচ্ছে; যা দেশের অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সপ্তমতঃ সীমিত সম্পদ ও অধিক জনসংখ্যার কারণে বাসস্থান, যানবাহণ, চাকুরী, শিক্ষা, খাদ্য সবকিছুর ওপর চাপ বেড়েছে এবং পাশাপাশি বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অষ্টমতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সকলের মৌলিক চাহিদা পুরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯০ এর মধ্যে জনসংখ্যা এবং অপরাধের সংখ্যা সমান্তরাল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। (বারকাত, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন, ডিসেম্বর ১৯৯৩)।

নবমতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আর্ন্তজাতিকভাবে এবং দেশের অভ্যন্তরে গ্রাম থেকে শহর অভিমুখী মানুষের ভিড় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের প্রতিটি শহরেই জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। রাজধানী ঢাকা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৮৯ (উননব্বই) লক্ষ। ঢাকা শহরের বিদ্যমান নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলে ঢাকায় প্রায় ২৬ লক্ষ লোক বস্তিতে জীবন-যাপন করছে। এ ক্ষেত্রে আরও উদ্বেগের কারণ এই যে, জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে (১৯৯৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০০০ সাল নাগাদ ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি হবে।

৫। পর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৫।

দশমতঃ দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের ভূখন্ডে প্রায় ২৩ শতাংশ বনাঞ্চল ছিল। বাড়তি মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে ৮ ভাগে নেমে এসেছে। অথচ কোন দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম ২৫ শতাংশ বনাঞ্চল। বনাঞ্চল কমে যাওয়ার কারণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। ফলে দিনে দিনে পরিবেশ তার স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে বিপর্যয়ের মুখোমুখী হচ্ছে। বাড়তি মানুষের খাদ্যের চাহিদা পুরণ করার জন্য কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং জমির অধিক ব্যবহারের কারণে ভূমির স্বকীয় উর্বরতা শক্তিও লোপ পাচ্ছে। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার সম্প্রসারণ, চাকুরীর ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নয়ন, খাদ্য-শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে জোরদার কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে যে সাফল্য অর্জিত হচ্ছে, তা ক্রমাগত বেড়ে চলা জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার উত্তরণে দেশের সকল উন্নয়ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিকে একটি ধারণযোগ্য অবস্থানে রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া এবং জনসংখ্যা কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী এবং ব্যাপকভিত্তিক ও জোরদার করা প্রয়োজন। এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতির সামনে ২০০৫ সালের মধ্যে জননীতি প্রণয়ন ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না।

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা বিষয়ক উদ্দেশ্যাবলী

পঞ্চম পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে দেশব্যাপী সামাজিক আন্দোলন ও ব্যাপক সরকারি কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ২০০৫ সালে জনমিতিক লক্ষ্য এনআরআর-১ অর্জনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। পরিকল্পনায় দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে মা ও শিশু স্বাস্থ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা, পুনরুৎপাদনশীল স্বাস্থ্যসেবা, উন্নতমানের সেবা প্রদান, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং সম্পদ সমাবেশের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনা মেয়াদের জনতাত্ত্বিক লক্ষ্যসমূহ সারণী ১ ও ২-এ দেখানো হলো।

সারণী-১

কতিপয় নির্বাচিত খাতের ভিত্তি পরিমাপক এবং তাদের প্রক্ষেপিত পরিবর্তন

১৯৯৬-২০১০

পরিমাপকসমূহ	১৯৯৬	২০০২	২০০৫	২০১০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১২২.০০	১৩২.৫০	১৩৭.৫০	১৪৬.৪০
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	২৭.০০	২১.০০	২১.০০	২০.৮০
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৯.০০	৭.৮০	৭.৮০	৭.৭০
জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার (%)	১.৮০	১.৩২	১.৩২	১.৩১
মোট প্রজনন হার প্রতি মহিলায়	৩.৪০	২.৬০	২.২০	২.২০
শিশু মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ জীবিত জনে	৭৮.০০	৫৫.০০	৫০.০০	৩৫.০০

পরিমাপকসমূহ	১৯৯৬	২০০২	২০০৫	২০১০
নীট পুনরুৎপাদন হার প্রতি মহিলায়	১.৫০	১.৩০	১.০০	০.৯৩
জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ুকাল (বছরে) পুরুষ	৫৮.১০	৬০.০০	৬২.০০	৬৪.০০
জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ুকাল (বছরে) মহিলা	৫৭.৬০	৫৯.০০	৫৯.৪০	৬৪.০০
প্রতি ১০০ মহিলায় পুরুষ	১০৫.০০	১০৪.৮০	১০৪.৪০	১০৪.২০
নির্ভরতা অনুপাত (%)	৫৯.০০	৬২.০০	৪৬.০০	৪০.০০
মহিলা প্রজনন বয়স (১৫-৪৯) মিলিয়ন	২৭.৫০	৩২.৬০	৩৯.২০	৪৩.১০
গর্ভনিরোধ ব্যবহার (%)	৪৮.০০	৬০.০০	৬৮.০০	৭২.০০

সারণী-২

পঞ্চম পরিকল্পনায় কতিপয় নির্বাচিত জনমিতিক পরিমাপকের প্রক্ষেপিত পরিবর্তন ১৯৯৭-২০০২

পরিমাপকসমূহ	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২
জানুয়ারীতে জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১২৩.৮০	১২৫.৬০	১২৭.৪০	১২৯.২০	১৩১.০০	১৩২.৫০
স্থূল জন্ম হার প্রতি হাজারে	২৬.৫০	২৪.৭০	২৩.৫০	২২.৪০	২১.৮০	২১.০০
স্থূল মৃত্যুহার প্রতি হাজারে	৯.০০	৮.৭০	৮.৫০	৮.২০	৭.৮০	৭.৮০
জাতিয় প্রবৃদ্ধির হার (%)	১.৭৫	১.৬০	১.৫০	১.৪২	১.৪০	১.৩২
মোট প্রজনন হার	৩.৪০	৩.২০	৩.০০	২.৮০	২.৭০	২.৬০
শিশু মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ জীবিত জনে	৭৫.০০	৭২.০০	৬৬.০০	৬১.০০	৫৮.০০	৫৫.০০
গর্ভনিরোধ ব্যবহার (%)	৪৮.০০	৫১.০০	৫৪.০০	৫৬.০০	৫৮.০০	৬০.০০

প্রক্ষেপিত পরিবর্তনের অনুমিতিসমূহ সরকারি অবদান, বহুমুখী জনমিতিক কর্মসূচি এবং এনজিওসমূহের প্রচেষ্টার ভিত্তিতে করা হয়েছে। অন্য একটি অনুমিতি হচ্ছে বিদ্যমান মহিলা কর্মসূচিসমূহকে নিবিড় ও সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে পুনরুৎপাদনশীল বয়স গ্রুপের ১.৫ মিলিয়ন মহিলাকে মহিলা সমবায় ও মাতৃকেন্দ্রের অধীনে আনা। প্রত্যাশা করা হয়েছে যে, ২০০২ সালে এই মহিলাগণের মধ্যে এনআরআর-১ অর্জিত হবে[৬]।

জনমিতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের সম্ভাবনাঃ মোট প্রজনন হার (৩.৪), গর্ভনিরোধ ব্যবহার হার (৪৮ শতাংশ), এবং তিনটি মহিলা কর্মসূচিতে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশ ২০০৫ সালে এনআরআর-

৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৫

১ এর জনমিতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ক্ষুদ্র পরিবার ধারণাটি বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে সরকার ও এনজিওসমূহ বিভিন্ন সামাজিক খাতের কর্মসূচিতে, যেমন- (১) শিক্ষা, (২) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, (৩) নারী উন্নয়ন ইত্যাদিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া, সকল পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি আরো জোরদার করা হবে এবং আইইসি কর্মসূচি প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা হবে। এসকল বিষয় মনে রেখে পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য নিম্নোক্ত জনমিতিক লক্ষ্যসমূহ এবং গর্ভনিরোধ ব্যবহার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে[৭]।

সারণী-৩

প্রক্ষেপিত মোট প্রজনন হার গর্ভনিরোধ ব্যবহার হার এবং ব্যবহারকারীর প্রাক্কলিত সংখ্যা ১৯৯৬-২০১০[৮]

বছর	গর্ভনিরোধ ব্যবহার হার (%)	মোট ব্যবহারকারী (মিলিয়নে	মোট প্রজনন হার প্রতি মহিলায়
১৯৯৬/৯৭	৪৮.০০	১১.৫০	৩.৪০
২০০২	৬০.০০	১৭.৫০	২.৬০
২০০৫	৬৮.০০	২৬.৬০	২.২০
২০১০	৭২.০০	৩১.০০	২.২০

পদ্ধতি সংমিশ্রণ ঃ গর্ভনিরোধ সংমিশ্রণ বলতে এ পর্যন্ত জনসাধারণ যে সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী, এইচএফডব্লিউসি, হাসপাতাল, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং সোশাল মার্কেটিং কোম্পানীসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত উপায়সমূহকে বোঝায়। বর্তমান গতিধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে পঞ্চম পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগত সংমিশ্রণ প্রস্তাব করা হয়েছে।

সারণী-৪

গর্ভনিরোধ ব্যবহারকারীদের প্রক্ষেপিত শতকরা হার ১৯৯৬/৯৭-২০০১/২০০২[৯]

পদ্ধতি সংমিশ্রণ	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/২০০০	২০০০/২০০১	২০০১/২০০২
খাবার বড়ি	২১.০০	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০	২৩.০০	২৩.০০
বন্ধ্যাকরণ	৭.০০	৮.০০	৮.০০	৯.০০	১০.০০	১১.০০
আইইউডি	৩.০০	৩.৫০	৪.০০	৪.৫০	৫.০০	৫.০০
সুচ প্রয়োগ	৫.০০	৫.৫০	৬.৫০	৭.০০	৭.০০	৭.৫০
কনডম	৪.০০	৫.০০	৫.৫০	৬.০০	৬.৫০	৭.০০
অন্যান্য	৮.০০	৭.০০	৭.০০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০
মোট	৪৮.০০	৫১.০০	৫৪.০০	৫৬.০০	৫৮.০০	৬০.০০

৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৫
৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৬
৯। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৬

সারণী-৫

১৯৯৬/৯৭-২০০১/২০০২ গর্ভনিরোধ ব্যবহারকারীদের প্রাক্কলিত সংখ্যা[১০]

(মিলিয়ন)

পদ্ধতি সংমিশ্রণ	১৯৯৬/ ৯৭	১৯৯৭/ ৯৮	১৯৯৮/ ৯৯	১৯৯৯/ ২০০০	২০০০/ ২০০১	২০০১/ ২০০২
খাবার বড়ি	৫.১০	৫.৪৮	৬.৩৮	৬.২০	৬.৪৬	৬.৭০
বন্ধ্যাকরণ	১.৬৭	২.০০	২.০৫	২.৪২	২.৮১	৩.২০
আইইউডি	০.৭৩	০.৮৭	১.০৩	১.২১	১.৪১	১.৪৬
সুচ প্রয়োগ	১.২২	১.৩৬	১.৪৫	১.৮৮	১.৯৬	২.২০
কমডম	০.৯৫	১.২৫	১.৩৮	১.৬৩	১.৮৩	২.০৪
অন্যান্য	১.৯০	১.৭৪	১.৭৬	১.৭৬	১.৮৩	১.৯০
মোট	১১.৫০	১২.৭০	১৪.০৫	১৫.১০	১৬.৩০	১৭.৫০

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বিষয়ক নীতি ও কৌশল

নীতিমালা ঃ জনতাত্ত্বিক এবং বিভিন্ন ভৌত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে পঞ্চম পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নোক্ত নীতি ও কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

ক. জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দু'সন্তান বিশিষ্ট পরিবার গঠনের প্রতি জাতীয় অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা মেয়াদে সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। যতদূর পারা যায়, সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ. পুনরুৎপাদনশীল স্বাস্থ্য সেবা যেমন পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এসটিডি/এইচআইভি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথাযথ সেবা প্রদান করা হবে এবং নববিবাহিত দম্পতিদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হবে।

গ. গর্ভনিরোধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান চাহিদা পূরণ এবং নতুন চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে মান সম্মত সেবা এবং আইইসি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং এনজিওসমূহকে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ঘ. কর্মসূচি পরিকল্পনা, কৌশল প্রণয়ন এবং সম্পদ সমাবেশ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে।

ঙ. কর্মী-জনসংখ্যা ঘনত্ব হ্রাস এবং নিবিড়ভাবে পরিবার কল্যাণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তারদের অধীনে রেখে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাঠ কর্মীদের কাজে লাগানো হবে, যারা

১০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৬।

পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম সম্বন্ধে থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে এবং স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্বন্ধে থানা স্বাস্থ্য প্রশাসকের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

চ. বিদ্যমান তিনটি মহিলা বিষয়ক কর্মসূচিসহ বহুমুখী জনসংখ্যা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং পূর্বে যে সকল মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, যেমন- স্থানীয় সরকার, কৃষি, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতি মন্ত্রণালয়কে জনসংখ্যা কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।

ছ. যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে সকল ক্ষেত্রে সরকার ও এনজিও-র মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে এবং জনমিতিক লক্ষ্যসমূহ ও অন্যান্য সামাজিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে এনজিওসমূহকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা হবে।

জ. মেডিকেল ও প্যারামেডিকেল ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে পুনরুৎপাদনশীল স্বাস্থ্য পরিচর্যা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ঝ. জনসংখ্যা খাতের জন্য একটি ব্যাপক সমন্বিত মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় জনসংখ্যা শিক্ষা পর্যালোচনা, উন্নীতকরণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

ঞ. বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোতে জনসংখ্যার ব্যাপক অভিগমন রোধে উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের যথার্থ আঞ্চলিক বন্টনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ অর্থনীতি পরিবেশ ও সমাজের উপর জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করবে।

ট. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলীর প্রধান নিয়ামক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড কমিটি এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে কাজে লাগানো হবে।

ঠ. স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী যাদের পরিবারের আকার বড় এবং যারা শহরের বস্তিতে বসবাস করে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে এবং বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং

ড. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলীতে স্থানীয় নেতবৃন্দ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দসহ নীতি প্রণেতাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে[১১]।

কৌশলসমূহ ঃ উপরোক্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গৃহীত হবে

ক. উন্নত সেবা প্রদানপূর্বক কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলী পূরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে জনমিতিক এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য/পরিবার কল্যাণের লক্ষ্যসমূহ অর্জন;

খ. যথাযথ সেবা প্রদানের মাধ্যমে ক্লিনিকাল পদ্ধতিসমূহ যেমন বন্ধ্যাকরণ, আইইউডি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি.

১১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫১।

গ. নিয়মিত পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আইইসি কর্মসূচিসমূহ জোরদারকরণ;

ঘ. প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং জনসমর্থন পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সমন্বয় কমিটিসমূহকে উজ্জীবিত করা

ঙ. যে সকল স্থানে কর্মসূচির বাস্তবায়ন-অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের, সেখানে ফলমুখী স্বল্পমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ

চ. সম্পদ সমাবেশ এবং জনগণের মালিকানার মাধ্যমে কর্মসূচির গতিময়তা রক্ষা

ছ. মাঠকর্মী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গর্ভনিরোধক ক্লিনিক্যাল পদ্ধতিসমূহ জনপ্রিয় করা

জ. দেশে গর্ভনিরোধকের ও চিকিৎসা সরঞ্জামসমূহের উৎপাদনের সামর্থ বৃদ্ধি এবং

ঝ. মূল্যায়ন গবেষণা ও ব্যবহারিক গবেষণা নিশ্চিত করা; গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমুহের বাইরে বাঞ্ছনীয় হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/পরিকলপনা কমিশন দ্বারা একটি উপযুক্ত কেন্দ্রীয় সমন্বয় ব্যবস্থা স্থাপন করা।

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা কর্মসূচি

জনসংখ্যা খাতের কার্যাবলীকে প্রধান ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) মা ও শিশু স্বাস্থ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের প্রতি প্রাথমিক দৃষ্টি দিয়ে পুনরুৎপাদনশীল স্বাস্থ্য; (খ) তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি), (গ) প্রশিক্ষণ ও জনশক্তি উন্নযন; (ঘ) অবকাঠামো উন্নয়ন; (ঙ) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ; (চ) জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন কর্মসূচি এবং (ছ) নীত পরিকল্পনা, সমন্বয় ও জনসংখ্যা উন্নয়ন কার্যাবলী। এই সাতটি বৃহৎ ভাগ অনুসারে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে[১২] ঃ

সেবা বিতরণ

ক. প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ পুনঃপ্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ পরিহার ও সন্তান জন্মদান স্থগিত রাখা, গর্ভপাতের চিকিৎসাসহ নিরাপদ গর্ভধারণ এবং ডেলিভারীর জন্য সেবা প্রদান এসটিভি/এইচআইভিসহ প্রজনন ঘটিত রোগ ও মৃত্যুর ব্যবস্থাপনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যের পরিচর্যা ইত্যাদি। মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যাপারে অদ্যাবধি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অবকাঠামো থাকা সত্তেও নিরাপদ মাতৃত্বের ধারণা ও অত্যাবশ্যকীয় মাতৃ পরিচর্যা (ইওসি) বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সরকার প্রয়োজনীয় সেবা প্যাকেজ চালু করবে যার মধ্যে থাকবেঃ (ক) আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য (খ) প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, (গ) শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, (ঘ) সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং

১২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৮।

(ঙ) সহজে নিরাময়যোগ্য রোগসমূহ। পদ্ধতির প্রত্যেক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্যাকেজসমূহ বর্ধিত হারে এবং উন্নত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হবে। প্রজনন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং জন্মদান প্রলম্বিত করা, জম্ম নিরোধক ব্যবহারের হার বজায় রাখা ও উন্নত করা এবং উন্নতমানের সার্জিক্যাল জম্ম নিরোধকের যোগান দেয়া। এর জন্য প্রয়োজন হবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের। পরিপূরক ভূমিকা এই পরিকল্পনা কমিউনিটির অংশগ্রহণ, দু'সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের প্রতি সমর্থন সূচক সামাজিক আন্দোলন, প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবে। বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং জনসংখার প্রতি অনুকূল নীতির মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে।

খ. সমন্বিত সেবা প্রদানের জন্য বাস্তবায়ন কৌশলঃ বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ১৯৭০ দশকে স্থাপিত হয়েছে। পুনঃপ্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার বর্তমান অঙ্গীকার পালনে প্রয়োজন সমন্বিত সেবা প্রদান পদ্ধতি। ইপিএস কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন বর্তমান প্রদান কাঠামোর সমন্বয়। এই সেবা প্রদানের নিম্নতম কার্যকরী একক হবে ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র- যেগুলো সামগ্রিক ভাবে চিকিৎসা সহকারী কিংবা মেডিকেল অফিসারদের তত্ত্বধানে থাকবে। চিকিৎসা সহকারী ও মেডিকেল অফিসার উভয়েই গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা কাঠামো পর্যবেক্ষণ করবে যার মধ্যে থাকবেঃ ইপিআই, মা ও শিশু পরিচর্যা, মৌলিক পুনপ্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, যেমন- পরিবার পরিকল্পনা, পুনজনন মননশীলতা, ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ প্রসব, প্রাথমিক পর্যায়ে নিমূর্লযোগ্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং যথাযথ ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যাবলী। জনসংখ্যা ঘনত্ব হ্রাসের উদ্দেশ্যে পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীগণ একীভূত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং ইউনিয়ন তত্ত্বাবধায়কদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। এ সকল মাঠ কর্মীরা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারী হিসেবে পরিচিত হবে। একটি নির্দিষ্ট ছকে তারা তাদের কার্যক্রমের বিবরণ দেবে। প্রস্তাবিত পুনর্গঠন কর্মসূচি ইউনিয়ন পর্যায় হতে বাস্তবায়ন শুরু হবে যেখানে ডাক্তারদের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পূর্ব প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে কোন বাস্তবায়ন শুরু হবে না।

গ. মান নিশ্চয়তাঃ সকল পর্যায়ের সেবার ক্ষেত্রেই মান নিশ্চিত করা হবে। সেবা প্রদানকারীদেরকে চাকুরীপূর্ব ও চাকুরীপরবর্তী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত সেবা মান নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া যথাযথ পেশাজীবীদের মাধ্যমে এনআইপিওআরটি, আরটিসি ও এফডব্লিউভিটিআই-এর প্রশিক্ষণ মান উন্নত করা হবে।

নারী উন্নয়ন কার্যাবলীঃ বিদ্যমান জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট মহিলা বিষয়ক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত তিনটি সংস্থা, যথা- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর, এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে তাদের কার্যক্রম নিবিড়করণের

জন্য শক্তিশালী করা হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে এ সকল কর্মসূচি কার্যকরী এবং অংশগ্রহণমূলক করার প্রধান উপকরণ হবেঃ দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কার্যকরী শিক্ষা, পুনপ্রজনন স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, ঋণ সহায়তা ইত্যাদি। ২০০২ সালে এনআরআর-১ অর্জনের লক্ষ্যে এসকল মহিলা কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত মহিলাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। প্রত্যাশা করা হয়েছে যে, এসকল কর্মসূচির আওতায় সরাসরি প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মহিলাকে আনা সম্ভব হবে। এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের পরিচিতকরণ বিবাহ এবং প্রথম সন্তান লাভ বিলম্ব করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাবে। যেহেতু এসকল কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীরা নিম্ন আয় গ্রুপের হবে, সেহেতু প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান তাদের পরিবারের আকার সীমিত করণের উপর অনুকূল প্রভাব রাখবে।

নীতি পরিকল্পনাঃ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যাবলী সংক্রান্ত নীতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে পরিকল্পনা কমিশন/অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করবে। এছাড়া, কমিশন খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ণে জনসংখ্যা নিয়ামকগুলোরও সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

আঞ্চলিক জনসংখ্যা বন্টনঃ বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে শহর এলাকাসমূহ বিশেষ করে বড় শহরগুলো, যেমন- ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি। শহরের জনসংখ্যা বছরে গড়ে ৬-৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যার অন্যতম কারণ গ্রাম হতে শহরে ব্যাপক অভিগমন। তাই সরকার আঞ্চলিক শহর ও নগর উন্নয়নের নীতি পরিবর্তন করবে এবং গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আয় সৃষ্টিকারী কর্মসূচি গ্রহণ করবে। যেন এ অভিগমনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সম্পর্কিত পর্যলোচনাঃ সরকার সেবা প্রদান, তথ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন তথা গবেষণা, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনগণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ সকল কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হতে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা খাত উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করলেও বিভিন্ন দিক থেকে বাধার সম্মুখীন হয়েছে যা দ্রুত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করেছে।

সেবা প্রদান ঃ সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে পরিবার পরিকল্পনা ধাত্রী (শিশু প্রসবকালে সহায়তাদানকারী এবং গর্ভনিরোধ সরবরাহকারী গ্রাম্য মহিলা)কে পূর্ণকালীন পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডব্লিউএ) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয় যার সংখ্যা বর্তমানে ২৩,৫০০ জন। বাংলাদেশের তৎকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এটি ছিল একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ। এর ফলে গর্ভনিরোধ ব্যবহারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায় এবং এটা প্রজনন হার হ্রাস তথা ছোট পরিবারের অনুকূলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়তা করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (এইচএফডব্লিউসি), হাসপাতাল, গ্রামীণ দাতব্য চিকিৎসালয়, স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং

সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী (এসএমসি)-র মাধ্যমে সেবা ও সরবরাহ সহজলভ্য করা হয়।

তথ্য শিক্ষা এবং যোগাযোগ (আইইসি)ঃ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যেখানে শিক্ষার হার নিম্ন, মিডিয়ায় প্রবেশাধিকার সীমিত, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে সামাজিক বাধা এবং উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ অপর্যাপ্ত, সেখানে আইইসি কার্যাবলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবার পরিকল্পনার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আইইসি কর্মসূচিসমূহ গুরু ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আইইসি কর্মসূচিসমূহের মধ্যে ছিলঃ লিফলেট বিতরণ, জারীগান, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, যেমন- বেতার ও টেলিভিশন তথ্য সংবাদ মিডিয়ার প্রচারণা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, গণর‍্যালী, মাঠকর্মীদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের বাইরে সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন, দম্পতিদের দলগত সভা এবং গ্রাম পর্যায়ে নেতাদের বক্তব্য। জনসংখ্যার জন্য আইইসি কৌশলে বেতার শক্তিশালী মিডিয়া হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।[১৩]

প্রশিক্ষণঃ মা ও শিশু স্বাস্থ্যভিত্তিক (এমসিএইচ) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মতো একটি সামাজিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, চিকিৎসা সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ প্রদান একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ১৯৭৫-৮০ মেয়াদে ঢাকায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান(এনআইপিওআরটি), মাঠকর্মীদের জন্য ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরটিসি), এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ (এফডব্লিউভিটিআই) এর জন্য বৃহত্তর জেলা কেন্দ্রে ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ ও মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও অফিসার, মাঠকর্মী, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক (এফডব্লিউভি) এবং চিকিৎসা সহকারীদেরকে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উপরন্তু, তত্ত্বাবধায়কদের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী (এমএস/এমপিএক) এবং বিদেশেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যেন তারা এ কর্মসূচিতে যথার্থ নেতৃত্বদানে সমর্থ হয় । কিন্তু এনআইপিওআরটি-এর অনুষদ খুব দুর্বল এবং নিপোর্টের প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের পদ্ধতি থাকা সত্তেও প্রশিক্ষণের মান অজানা। এক্ষেত্রে এখনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

গবেষণা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ (আরইএম)ঃ এটা একটি দুর্বল ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন সংস্থা সম্পৃক্ত এবং প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- এনআইপিওআরটি বিভিন্ন কোর্সের মূল্যায়ন বিষয়ে ২০টি গবেষণা রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে, জনসংখ্যা উন্নয়ন ও মূল্যায়ন ইউনিট (পিডিইইউ) প্রকল্প/কর্মসূচির ফলপ্রভাব বিষয়ে ২৫টি গবেষণা রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে এবং বাংলাদেশ অত্যাবশ্যকীয় প্রজননশীল স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআইআরপিইআরটি)

১৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮।

প্রজননশীল স্বাস্থ্য এবং বায়োমেডিকেল বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে। এনআইপিওআরটি ১৯৮৯ সালে দ্বিতীয় বাংলাদেশ প্রজনন জরিপ (বিএফএস) পরিচালনা করেছে । আশির দশকের শুরু থেকে একটি স্থানীয় এনজিও, ইউএসএআইডি এর সহায়তায় প্রতি দু'বছর পর পর জন্মনিরোধ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে এবং এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করছে। এছাড়া, সেবা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে থাকে।

এনজিওসমূহের সম্পৃক্ততাঃ সরকারের উদার নীতির কারণে এনজিও-র সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনা মেয়াদে জনসংখ্যা কার্যক্রমে ২০০টিরও অধিক এনজিও অংশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই ছিল বড় এনজিওসমূহ যেমন- (১) পাথ ফাইন্ডার ফান্ড; (২) পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র(এফপিএসটিসি); (৩) স্বনির্ভর কর্মসূচি; (৪) পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন(এফপিএমডি); এবং (৫) বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা। বিভিন্ন গবেষণায় পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, যেখানে সরকার ও এনজিও যৌথভাবে কাজ করছে, সেখানে গর্ভনিরোধ ব্যবহারের হার বেশী এবং প্রজনন হার কম। অন্যদিকে, যেখানে সরকার শুধু একা কাজ করে, সেখানে গর্ভনিরোধ গ্রহণের হার কম এবং প্রজনন হার বেশী। এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, প্রজনন হার বর্তমানে ৩.৪ শতাংশ এবং গর্ভনিরোধ ব্যবহারের হার ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধিতে এনজিওসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

সোশাল মার্কেটিং কর্মসূচি(এসএমপি)ঃ সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে শুরু হয়ে এ কর্মসূচি সরকারের বাইরে পরিচালিত হচ্ছে এবং বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কনডম ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ির ৪০-৫০ শতাংশ বিক্রি করেছে। স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে বিক্রিত পণ্যের আয় হতে এ কর্মসূচির চলতি বাজেটের ৭৫ শতাংশের যোগান দিচ্ছে।

মহিলাদের কর্মসূচিসমূহঃ সত্তরের দশকের মাঝামাঝি জনসংখ্যা খাতে মহিলাদের জন্য তিনটি কর্মসূচির সূচনা করা হয়, যেমন- (১) জনসংখ্যা কার্যাবলীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহিলা সমবায় সমিতির ব্যবহার (২) জনসংখ্যা কার্যাবলীতে মহিলাদের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবহার এবং (৩) চতুর্থ পরিকল্পনা মেয়াদ পর্যন্ত জনসংখ্যা কার্যক্রমে মাতৃকেন্দ্রসমূহের ব্যবহার। এসব কর্মসূচিসমূহের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যথাঃ (১) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের প্রজননশীলতা হ্রাস; (২) দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে গৃহস্থালীর আয় বৃদ্ধি; এবং (৩) মহিলাদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এই কর্মসূচিসমূহে কোন দ্বৈততা নেই এবং দেশের ৬০ শতাংশ থানায় এসকল কর্মসূচির ফলে প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদের আয় কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রজননশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এ কর্মসূচিসমূহ

প্রজননশীলতা হ্রাস, মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে একটি ধারা সৃষ্টি করেছে।

অবকাঠামোগত সহায়তাঃ পূর্বে স্থাপিত ২৫০০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (এমওএইচএফডব্লিউ) মাত্র ২০০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গর্ভনিরোধ মজুদের লক্ষ্যে ২৫০টি স্টোর রুম নির্মাণ করতে পেরেছে। অন্যদিকে, সম্পদের লভ্যতা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঢাকায় জনসংখ্যা কমপ্লেক্স নির্মাণ করতে পারেনি। সম্পদের স্বল্পতা এবং দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে ১,০০০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং থানা পর্যায়ে ৪৬৪টি গুদামের নির্মাণ করতে পারেনি। উন্নত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানের লক্ষ্যে ন্যূনতম ২০-৩০টি ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে যেখানে মহিলাদের জন্য ১০টি শয্যা ও ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে সে সব কেন্দ্রে গবেষণা পরিচালনা করা উচিত। এসকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারী দ্বারা শিশু প্রসব করানো এবং প্রসব পরবর্তি সেবা প্রদান করা উচিত। ফলশ্রুতিতে মাতা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাবে[১৪]।

পঞ্চম পরিকল্পনা মেয়াদে জনসংখ্যা কার্যাবলীতে মন্ত্রণালয়সমূহের ভূমিকা

জনসংখ্যার উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং বর্ধিত জনসংখ্যা অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে যাতে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে জনসংখ্যা সমস্যা দূরীকরণে সকলের সমন্বিত দায়িত্ব পালন। পঞ্চম পরিকল্পনা মেয়াদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যে সকল ভূমিকা পালন করবে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যাবলী সম্পাদনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রধান সংস্থা যার দায়িত্ব হচ্ছে থানা কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ের পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ক্লিনিক ও মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাসহ পুনপ্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা। নীতি প্রণয়ন, জনসংখ্যা কার্যাবলীতে সমন্বয় সাধন এবং জরু রী ভিত্তিতে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের দায়িত্বও এই মন্ত্রণালয়ের। এটা জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ সচিবালয় স্থাপন করবে যা সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে এবং জনসংখ্যা কার্যাবলীর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনায় জেলা, থানা ও ইউনিয়ন

১৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮।

সমন্বয় কমিটিসমূহকে কার্যকরী করবে। এছাড়া, এটা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে জনসংখ্যা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং গবেষণা পরিচালনা করবে।

খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রমে চতুর্থ হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত জনসংখ্যা বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে জনসংখ্যা তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহিত করবে। মাধ্যমিক স্তরের পরেও যেন বালিকারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করে শিক্ষারত থাকে তার জন্য বৃত্তি কর্মসূচি চালু করবে।

গ) কৃষি মন্ত্রণালয় এর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও মহাবিদ্যালয়সমূহে জনসংখ্যা শিক্ষা চালু করবে। মন্ত্রণালয় তাদের সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষি খাতের জন্য জনসংখ্যা ছোট পরিবার আকারে রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে।

ঘ) তথ্য মন্ত্রণালয় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে তথ্য প্রদান করবে যেন পরিবারের আকার সীমিত করার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, এটা অন্যান্য পুনপ্রজনন স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন এসটিডি, এইচআইভি ইত্যাদি সম্বন্ধে জনগণকে সজাগ করবে।

ঙ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কার্যাবলীতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ও ইউনিয়ন পরিষদকে অন্তর্ভুক্তকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করবে। কার্যগত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং কর্মসূচিতে পরিবার পরিকল্পনা/মা ও শিশু স্বাস্থ্য অন্যতম উপাদান হবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের অধীনে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে যে ৫০,০০০ মহিলা নিয়োজিত রয়েছে তাদেরকে জনসংখ্যা কার্যাবলীতে ব্যবহার করা হবে। এছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদ পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের কাজ তত্ত্বাবধান করবে।

চ) জনসংখ্যা নীতি পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচিতে জনসংখ্যা চলকসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে সম্পদ বরাদ্দ সমন্বয়করণের দায়িত্ব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের। এছাড়া, মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে কার্যক্রমের প্রভাব পরিমাপ এবং পরিচালনা এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

ছ) সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দক্ষতা প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা, পরিবার পরিকল্পনা/মা ও শিশু স্বাস্থ্য শিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষা, পুনপ্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়সমুহ, নারী অধিকার ও দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট নারী ও যুব উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে। গ্রামীণ মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাতৃকেন্দ্রসমূহকে শক্তিশালী করা হবে যেন তারা উক্ত সুবিধাসমূহ গ্রহণে সক্ষম হতে পারে।

জ) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে একটি নীতি প্রণয়ন করবে এবং বৃক্ষ রোপণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে ও বায়ুদূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঝ) প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তাদের হাসপাতালসমূহে প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি ও অন্যান্য সেবা প্রদান জোরদার করবে।

ঞ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চা বাগানের ক্লিনিকসমূহে পুনপ্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি এবং অন্যান্য কর্মসূচি চালু করবে। এ সকল সেবা প্রদানে শিল্প এলাকার জনগণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয় বিদেশ হতে প্রত্যাগত শ্রমিকদের এইচআইভি/এইডস অনুসন্ধানে পরীক্ষা চালাবে।

সমন্বয় ঃ প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও পথনির্দেশনার জন্য জনসংখ্যা কার্যাবলী সকল পর্যায়ে সমন্বিত করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ(এনপিসি) নীতি নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রাখবে। বিভিন্ন নীতি নির্দেশনা বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে এনপিসি-এর একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে এবং এর সচিবালয় দীর্ঘ মেয়াদী একটি জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করবে। বিভিন্ন নীতিসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য এর একটি পরিবীক্ষণ ইউনিট থাকবে যা বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে। অনুরূপভাবে, জেলা ও থানা পর্যায়ের সমন্বয় কমিটিসমূহকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কেন্দ্রের কর্মসূচি পরিবীক্ষণ এবং উন্নত স্বাস্থ্য ও ছোট পরিবার ধারণাটি গতিশীল করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং গ্রাম পরিষদসমূহে অনুরূপ কমিটি গঠন করা হবে। এই পদ্ধতি স্বাস্থ্য জনসংখ্যা বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং স্থানীয় কর্মীদেরকে কমিউনিটির কাজে লাগাবে।

- উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সেক্টর যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা' জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে অনেকাংশে সংগতিপূর্ণ ছিল। অবশ্য একথা সত্য যে, পরিকল্পনা মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর এর ফলপ্রসূতা যাচাই-এর ব্যাপারে বাস্তব মন্তব্য করা সম্ভব হবে।

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এনজিওসমূহের ভূমিকা

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সূচনা করেছিল বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা নামে একটি এনজিও যা ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সরকারের উদার নীতির কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দাতা সমর্থিত এনজিও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে এগিয়ে এসেছিল। এসকল এনজিও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন

অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে। গর্ভনিরোধ সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার ও তাদের নীট অবদানের অনুপাত ২ঃ৮। প্রকৃতপক্ষে, চতুর্থ পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৯০-৯৫) গর্ভনিরোধ ব্যবহার বৃদ্ধি এবং প্রজননশীলতা হ্রাসে এসকল এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পঞ্চম পরিকলপনা মেয়াদে এনজিও সমূহের ভূমিকাকে আরো উৎসাহিত করা হবে এবং দেশের প্রায় সকল থানায় এনজিওর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

আগামী পাঁচ বছরে গর্ভনিরোধ ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে এনজিওসমূহের প্রক্ষেপিত অবদান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।

সারণী-৬

১৯৯৬-২০০২ সময়ে গর্ভনিরোধ ব্যবহার হারে সরকার ও এনজিওদের অবদানের প্রক্ষেপিত শতকরা অংশ

সন	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২
সরকার	৮০	৭৮	৭৫	৭২	৬৯	৬৬	৬৩
এনজিও	২০	২২	২৫	২৮	৩১	৩৪	৩৭
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎসঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পৃঃ ৪৫৭।

এনজিওসমূহের ভৌত লক্ষ্যমাত্রার তাৎপর্য হচ্ছে গর্ভনিরোধ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৯৯৭ সালে ২.৬০ মিলিয়নের বিপরীতে ২০০২ সালে ৬.৫০ মিলিয়নে উন্নীত করা। এনজিওসমূহ প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদেরকে লক্ষ্য করে এসকল কর্মসূচি বিস্তৃত করবে। জনসংখ্যার বৃহত্তম পরিসরে এনজিওসমূহের বিদ্যমান কর্মসূচি শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করা উচিত। পরিকল্পনা মেয়াদে নতুন এনজিও-এর উদ্ভব হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে তাদের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে।

ব্যক্তি খাতের ভূমিকাঃ জনসংখ্যা খাতের কার্যাবলীতে বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা উচিৎ। তারা পরিবার পরিকল্পনা/মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সামগ্রী উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে পারে এবং তারা এককভাবে কিংবা সরকারের সাথে যৌথভাবে আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। বিনিয়োগ বোর্ড এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাবে। সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী (এসএমসি) তাদের গর্ভনিরোধ বাণিজ্যিক বিক্রয় কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করবে। ব্যক্তি খাতের হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ পুনপ্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবে। এই নতুন ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে সরকার কয়েক বছর ব্যাপী তাদের উৎপাদিত সামগ্রী ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করার নিশ্চয়তা দিতে পারে যদি সেগুলো গ্রহণযোগ্য মানের হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা-উন্নয়ন সংযোগ

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যে সমাজে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- উন্নয়ন কার্যক্রমে মহিলাদের অংগ্রহণ, যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারী শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুবিধা, শিক্ষা কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ সমতার মাধ্যমে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততার সাথে হ্রাস পেয়েছে। এসকল বিষয় মনে রেখে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

ক. শিক্ষা কার্যক্রম ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টি করা যেন তারা আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে;

খ. মাতৃকেন্দ্র, উৎপাদনকারীদের সমবায়, কৃষক সংঘ প্রভৃতি সামাজিক গ্রুপ সৃষ্টির মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলা উভয়কে ক্ষুদ্র আয়তন উৎপাদনের জন্য জামানত ব্যতীত সমান ঋণ সহায়তা প্রদান;

গ. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে জনসংখা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অবিচ্ছেদ অংশ হিসেবে রাখতে হবে যাতে জনগণ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশ সরকারের সর্বোচ্চ স্তর থেকে প্রদান করা হবে;

ঘ. গর্ভনিরোধকের সামাজিক বিপণন, সম্প্রসারণ এবং মিডিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা; এবং

ঙ. সন্তানহীন পিতামাতাকে বার্ধক্যে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান, বিবাহের বহুকাল পরেও যে সকল দম্পতির সন্তান হয়নি তাদেরকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বিনামূল্যে প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

* পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে এবং আমরা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছি। কিন্ত এ সাফল্যে আমাদের আত্ম-তৃপ্তির কোন অবকাশ নেই। কারণ কার্যক্রমের ভবিষ্যত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য আমরা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। কেননা, আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বয়স কাঠামো। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগই হচ্ছে ১৫ বছর বয়সের নীচে। এই কম বয়সী জনসংখ্যা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রজননক্ষম জনসংখ্যায় পরিণত হবে।

* দেশে বর্তমানে সক্ষম দম্পতির সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। ২০০৫ সাল নাগাদ সক্ষম দম্পতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, এ

বিপুল সংখ্যক সক্ষম দম্পতির শতকরা ৭০ ভাগকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের আওতায় আনা।

* সরকারি পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে সকল সেবা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। তাই ৩ কোটি ৫২ লক্ষ সক্ষম দম্পতির ৭০ ভাগকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা আমাদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

* ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে পরিবার পরিকল্পনা সেবার পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। সুতরাং সেবার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেও ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে।

* দম্পতির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর সংখ্যা বাড়বে। আগামী দিনের সকল শিশুকে প্রতিষেধক টিকা প্রদান এবং তাদের অপুষ্টি দূর করার জন্যও কার্যক্রমে ব্যয়ভার বর্তমানের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

* বর্তমান কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে মাঠকর্মীরা বাড়ীতে গিয়ে সেবা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু আগামী দিনের বিপুল সংখ্যক দম্পতির পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বাড়ীতে প্রদান করার জন্য বর্তমানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক মাঠকর্মীর প্রয়োজন হবে। কিন্তু এত মাঠকর্মী নিয়োগ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমাদের নেই।

* বর্তমান পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যয়ভার- এর মাত্র ৩৫ ভাগ সরকার বহন করে। বাকী অংশ দাতা সংস্থা বহন করে। ভবিষ্যতে দাতা সংস্থার অংশগ্রহণ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বৈদেশিক সাহায্য বা নির্ভরতা আমাদের কমিয়ে আনতেই হবে। অর্থাৎ একদিকে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমাতে হবে এবং অন্যদিকে কার্যক্রমের ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় ভবিষ্যত কর্মসূচির ব্যয়ভার সংকুলানের বিষয়টি আমাদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

* অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৫০ ভাগ উন্নীত হওয়ার পর অগ্রগতিতে কিছুটা শিথিলতা আসে। আমাদের কার্যক্রমও বর্তমানে সেই বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপ

◆ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের এ কৌশল অর্থাৎ (Health and Population Sector Strategy) ইতোমধ্যেই সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। এ কৌশলের ভিত্তিতে এ বছর জুলাই মাস থেকে

গ্রন্থাগার সাধারণ শাখা তারিখ ... সাভার, ঢাকা

আগামী ৫ বছর মেয়াদী স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম-৫ (HAPP-5) বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

- এ কার্যক্রমের আওতায় সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। কাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনার পুর্নগঠনের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে সমন্বিতভাবে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা একটি কেন্দ্র বা একটি স্থান থেকে প্রদান করার ব্যবস্থা কার্যক্রমে গ্রহণ করা হচ্ছে। আমাদের সেবার প্রধান গ্রাহক হচ্ছেন মহিলা, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী। বাড়ীতে গিয়ে সেবা প্রদানের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে সেবা প্রদানে কিছুটা ব্যয় সংকোচন করা সম্ভব হবে।
- ভবিষ্যত কার্যক্রমে অপর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে- স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া; কেননা দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি একদিকে যেমন গ্রহীতার জন্য সুবিধাজনক, তেমনি কার্যক্রমের জন্য ব্যয় সাশ্রয় হবে। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে। কারণ সরকারি পর্যায়ে গ্রহীতাদেরকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সেবা বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মহিলাই ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে দু'টি সন্তানের মা হয়ে থাকেন। এরপর যদি তারা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেন তাহলে পরবর্তী দীর্ঘ ২০-২৫ বছর তাদেরকে অন্য কোন অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় না কিংবা সেবা প্রদানকারীকে অনুসরণ কার্যক্রম চালাতে হয় না। ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হওয়ার সুযোগ থাকে। তাই স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি গ্রহীতা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

- এছাড়া কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারের ব্যয়ভার হ্রাস করার লক্ষ্যে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- কার্যক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এবং অগ্রগতি অব্যাহত তথা ধারণ যোগ্যতা বজায় রাখার জন্য দাতা সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে কার্যক্রমে সরকারের অর্থ বরাদ্দ করার বিষয়টিও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।
- কার্যক্রমে দুর্ভেদ্য জনগোষ্ঠীকে মোকাবেলা করার জন্য ব্যাপক তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধিকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এ সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে তা

বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখছি যে, বিগত পাঁচ বছরেও আমরা আশানুরূপ ফল পাইনি। বিভিন্ন পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার যে পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল এখন পর্যন্তও সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে সকল সমাজ বিজ্ঞানী, রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদ একমত যে, যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনগণের সজাগ দৃষ্টিভংগীর গুরুত্ব অপরিসীম। জনগণ যখন বুঝতে পারবে যে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যে তাদের মংগল নিহিত রয়েছে, তখন তারা স্বেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে তা' বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। সে জন্য আজ আমাদের যা প্রয়োজন, তা হলো সামষ্টিক পরিকল্পনার পাশাপাশি ব্যাষ্টিক পরিকল্পনার বা স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে জনগণকে এ কাজের সংগে সম্পৃক্ত করা এবং এর স্বপক্ষে জনগণের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন সাধন করা। এ হিসেবে পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির সার্থক বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের প্রচেষ্টার সাথে সাথে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সমন্বিত হওয়া দরকার। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোক বলতে বুঝায় সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক নেতা, মসজিদের ইমাম এবং জনসাধারণের নিকট পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিবর্গ। যতদিন পর্যন্ত দেশের সকল লোক বিশেষ করে মহিলা ও যুব সমাজ এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এর সমাধানের জন্য মিলিতভাবে সচেষ্ট না হবেন, ততদিন পর্যন্ত পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম তথা পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না। কাজেই এ প্রচেষ্টাকে স্বার্থক করার দায়িত্ব কেবল মাত্র সরকারি কর্মচারী ও স্থানীয় নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের নয়। এ দায়িত্ব এ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের, আপনার, আমার সকলের।

তথ্য নির্দেশিকা

১। আলম, বিলকিস আরা ও আজম কে, কিউ (১৯৮৭), *(সম্পাদক), ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল,* ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ঢাকা।

২। পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (১৯৯৭-২০০২), *পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা*

৩। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (১৯৯৯), *বাংলাদেশ ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক, ঢাকা।*

৪। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (১৯৯৯), *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক,* ঢাকা।

৫। সালাহ উদ্দীন, এ,টি,এম (১৯৮৬), *আধুনিক জনবিজ্ঞান, বুক* হাউস, ১৩৬, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ তিনটি হাসপাতালের উপর একটি সমীক্ষা

সৈয়দা পাপিয়া নাহিদ পপি*
মহামায়া আচার্য্য**

Waste Management in Hospitals: A Study on three Hospitals

Abstract

The study on Disposal of Hospital waste especially disposable syringe on three selected Hospitals (Institute of Disease of the Chest and Hospital, Infectious Disease Hospital and Cancer Hospital) were conducted from April to July 2001 to assess the different aspects of the Hospital waste and the existing system of the disposable syringe. It has been found that among the admitted patients the waste generation rate was 0.75 kg per patient per day. These waste are carried to the dustbins of hospital compound and the workers of the Municipal Corporation are responsible for final disposal of these once or twice a week. This method is not followed in a scientific way. This unhygienic method of waste disposal system creates one major factor for the environmental pollution and impact on people health. The paper provides recommendations to improve the hospital's waste management.

ভূমিকা

বর্তমানে পরিবেশ দূষণ বিশ্বের একটি বড় সমস্যা। বিশেষ করে অনুন্নত বিশ্বে এই সমস্যা আরও প্রকট। ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে বায়ূ দূষণ শহর বলে খ্যাত (গ্রীন হাউজ রিপোর্ট -২০০০)। এ সকল দূষণ হয় প্রধানত শিল্প কারখানার বর্জ্য, গাড়ীর ধোঁয়া, হাসপাতাল ও ক্লিনিকের আর্বজনা থেকে। এদের মধ্যে হাসপাতালের আবর্জনা সবচেয়ে বেশি মারাত্নক। কারণ এসবের Micro-organisms দ্বারা জনসাধারণ খুব দ্রুত সংক্রামিত হতে পারে। কিছু দিন আগেও মানুষের মধ্যে হাসপাতালের বর্জ্য সম্পর্কে সচেতনতা কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংক্রামিত রোগ যেমন HIV, হেপাটাইটিস "ই" ভাইরাস, ডেঙ্গু, ডাইরিয়া, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদির প্রার্দুভাব দেখা দেয়ায় জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের বর্জ্যের উপর দৃষ্টিপাত করছেন। সাধারণত হাসপাতালে উৎপন্ন বর্জ্যের বেশির ভাগ অংশ অক্ষতিকারক বর্জ্য এবং খুব অল্প পরিমাণ বর্জ্যই ক্ষতিকারক । কিন্তু যখন এই অল্প পরিমাণ ক্ষতিকারক বর্জ্য বিশাল পরিমাণ সাধারণ বা অক্ষতিকারক বর্জ্যের সাথে মিলিত হয় তখন পুরো বর্জ্যই ক্ষতিকারক বর্জ্যে পরিণত হয়। উৎপন্ন বর্জ্যের ৮০%- ৯০% ভাগই সাধারণ বা অক্ষতিকর বর্জ্য, ১০-১৫ ভাগ বর্জ্য ক্ষতিকারক বা ঝুকিপূর্ণ বর্জ্য। সুতরাং কার্যকরভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পূর্বশত হল সঠিকভাবে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ

* প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ, সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সাভার;
** শিক্ষার্থী, স্নাতকোত্তর শ্রেণী, ভূগোল বিভাগ, সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সাভার ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা (ডঃ এ. কে. সাইদুর রহমান)। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম অংশ যেমন লোকবল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ক্যামিকেলস, সরকারি রাজস্ব ব্যয় ইত্যাদি বাহুলাংশে নির্ভর করে ক্ষতিকারক বর্জ্যের পরিমাণ ও প্রকারভেদের উপর।

১৯৯৫ সালের পরিবেশ রক্ষা এ্যাক্টের সেকশন ২(১) এ চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, "Any liquid, solid and radioactive substance that is discharged, disposed or dumped which may cause adverse / negative change to the enviroment" (ভূগোল পত্রিকা ১৯৯৯ইং) সাধারণত বর্জ্যকে নিম্ন লিখিত ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় "স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে (হাসপাতাল) রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা প্রদান, প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ল্যাবরেটরী পরীক্ষা, অন্যান্য সেবা প্রদান ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপন্ন অবাঞ্ছিত বস্তুসমূহকে হাসপাতাল বর্জ্য বলে।

সারণী-১

গবেষণাকৃত হাসপাতালের বেড সংখ্যা ও বর্জ্যের উৎপাদনের দৈনিক গড় হিসাব

হাসপাতালের নাম	ওয়ার্ড সংখ্যা	বেড সংখ্যা	বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ (দৈনিক)
বক্ষব্যাধি হাসপাতাল	২৫	৬০০	৪৫০ কেজি
সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল	১০	১০০	৭৫ কেজি
ক্যান্সার হাসপাতাল	৫	৫০	৩৭.৫ কেজি
মোট	**৪০**	**৭৫০**	**৫৬২.৫ কেজি**

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায় তিনটি হাসপাতালে প্রতিদিন জনপ্রতি ০.৭৫ কেজি বর্জ্য উৎপাদন করে। এই হিসেবে গবেষণাকৃত তিনটি হাসপাতাল মোট ৫৬২.৫ কেজি বর্জ্য উৎপাদন করে।

বর্জ্যসমূহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের এলাকার ডাস্টবিনে ফেলে এবং ১/২ সপ্তাহ পরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সেগুলো নিয়ে যায়। কিছু পরিমাণ বর্জ্য, যেগুলি একাধিকবার ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে যেমন সিরিঞ্জ, স্যালাইন প্যাকেট, সুঁচ ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলা হয় কিংবা ভেঙ্গে ফেলা হয়। কিন্তু এই সকল পদ্ধতির কোনটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি/ স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত নয়। এ প্রকার ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

প্রকাশনা/ গ্রন্থ পর্যালোচনা

ডঃ এইচ রালবুরিস (১৯৯৪) 'স্বাস্থ্য রক্ষায় ক্ষতিকারক বর্জ্য ও ব্যবস্থ্যাপনা' সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, অনুন্নত বিশ্বে ক্ষতিকারক বর্জ্যের ব্যবস্থ্যাপনা খুবই দুর্বল । তিনি লক্ষ্য করেন যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বর্জ্য পুড়িয়ে

ফেলা হয় (Incineration), যদিও পদ্ধতিটি সঠিক তথাপি আমাদের মত অনুন্নত দেশে অজ্ঞতার কারণে বর্জ্যগুলি সঠিকভাবে পোড়ানো হয় না। পোড়ানোর পরেও বর্জ্যের অবশিষ্টাংশ থেকে যায় । এর ফলে বৃষ্টির পানি, ইঁদুর ও অন্যান্য পতঙ্গের সাহায্যে রোগ জীবানু বিস্তার লাভ করে।

প্রফেসর নবী (১৯৯৫) 'হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' সমীক্ষায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ৫ টি বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন । এগুলো হল Segration, Storage, Handling, Treatment, Disposal: এই রিপোর্টে আরও বলা হয় প্রতিদিন একটি বেডে ৮৫% অক্ষতিকারক বর্জ্য, ১০% ক্ষতিকারক বর্জ্য এবং ৫% ধারালো বর্জ্য উৎপাদিত হয়।

ডঃ ইউলিকোভা (Dr.Eulikova,1995), তাঁর 'হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধারা' গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, হাসপাতালের বর্জ্য জীবাণু (Micro-organism) সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে, যা জনগণের স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি করে। তবে তাঁর মতে যদি সঠিক পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক বর্জ্য পোড়ানো হয়, তবে প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হওয়া যায়। তাতে রোগ সৃষ্টি কারী জীবাণু ধ্বংসের সাথে সাথে পরিবেশও ভাল থাকে।

খান এ, এম (১৯৯৭), ডিসপোজেবল ইনজেকশন সিরিঞ্জের পুনঃব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে হাসপাতালসমূহের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ধ্বংস না করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি পুনরায় প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করছে। ঢাকার বাবু বাজার মিটফোর্ড হাসপাতালে কিছু অসাধু বিক্রেতা এসব দূষিত সিরিঞ্জ বাজারে বিক্রি করে। এ ব্যাপারে শীঘ্রই কঠোর নীতি গ্রহণের প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। (ভূগোল পত্রিকা ১৮ সংখ্যা ১৯৯৯)।

হোসেন (১৯৯৮), হাসপাতাল বর্জ্য যেসকল বিভিন্ন বিপদজনক রোগ ছড়াচ্ছে তা উল্লেখ করেছেন। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে হেপাটাইটিস, টাইফয়েড, মেনিন-জাইটিস, হারপিস বিভিন্ন প্রকারের মারাত্নক রোগের বিস্তার ঘটছে বলে তিনি তাঁর সমীক্ষায় উল্লেখ করেছেন। (ভূগোল পত্রিকা সংখ্যা, ১৮, ১৯৯৯)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অজ্ঞতা, অসচেতনতা প্রযুক্তিগত ত্রুটি ও সঠিক পদ্ধতি না জানার ফলে জনগণের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন। সুতরাং অতি দ্রুত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম নীতি প্রণয়ন করে পরিবেশ ও জাতীয় স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা আবশ্যক।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে হাসপাতালসমূহ কিভাবে বা, কি পদ্ধতিতে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে থাকে তা বিশ্লেষণ করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা হয়েছেঃ

১। হাসপাতালসমূহ কি কি ধরনের বর্জ্য উৎপাদন করে তা পর্যবেক্ষণ করা।
২। বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা সমীক্ষা করা।
৩। একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপনার মাধ্যমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন কৌশল প্রণয়ন করতে সাহায্য করা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা জরীপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দু'ভাবে প্রশ্ন করে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এক, প্রশ্নমালা তৈরী করে উত্তরদানকারীকে দেওয়া হয়েছে। দুই, সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তথ্যদানকারীর মধ্যে ছিল হাসপাতালের ডাক্তার ২৮ জন, নার্স ৪৫ জন, কর্মকর্তা ১৫ জন, কর্মচারী ৬০ জন। এছাড়াও বিশেষভাবে যারা ওটি, ইমার্জেন্সী, প্যাথলজী, ল্যাবরেটরী, ব্লাডব্যাংক, রান্নাঘর ও ওর্য়াড-এ সরাসরি বর্জ্য উৎপাদন ও অপসারণের সাথে জড়িত তারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে পরিমাণগত ও গুনগত উভয় উপাত্তই গবেষণায় সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণায় কিছু দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে যেমন, হাসপাতালগুলিতে প্রতিদিন কি পরিমাণ কোন কোন বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় তা একটি চার্টে লেখা হয়, সেখান থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি সপ্তাহের বা মাসের বর্জ্য সংগ্রহের হিসাব বের করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় তিনটি হাসপতালকে (বক্ষব্যাধি, ক্যান্সার, সংক্রামক) সমীক্ষা এলাকা হিসাবে নির্দিষ্ট করার কারণ হচেছ, এখানে নির্দিষ্ট রোগ নিয়ে রোগীরা ভর্তি হয়। বক্ষ্যব্যাধি হাসপাতালে বক্ষজনিত যেমন - এ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, যে কোন ধরনের এ্যাকসিডেন্ট ইত্যাদি, ক্যান্সার হাসপাতালে শরীরে যে কোন স্থানে ক্যান্সার এবং সংক্রামক হাসপাতালে বিভিন্ন সংক্রামক রোগসহ শরীরের অন্যান্য ক্ষতজনিত রোগ নিয়ে সুচিকিৎসার জন্য রোগীরা ভর্তি হয়। এসব হাসপাতালে প্রতিটি রোগেরই উপযুক্ত চিকিৎসার পূর্বে অর্থাৎ এন্টিবায়োটিক শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ মানুষের শরীরে জীবাণু প্রবেশের মাধ্যমে রোগ সংক্রামিত হতে পারে যা জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক কুসংস্কারের কারণে এসব রোগে আক্রান্ত রোগীরা সমাজে অবহেলিত হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ এদের থেকে দূরে অবস্থান করে। কিন্তু সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে এসব রোগ নিরাময় সম্ভব। যদিও এন্টিবায়োটিক শুরু করার পর রোগ ছোঁয়াচে থাকে না কিন্তু কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে Microorganism এত বেশি শক্তিশালী থাকে যে, তাদের সংস্পর্শে যে সব মানুষ আসে রোগ জীবাণূ তাদের দেহে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে এবং এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। এ কারণে এসব রোগীর ব্যবহার্য সব জিনিস পত্র যেমন - ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ব্যাগ, স্যালাইন সেট, গ্লোবস

ইত্যাদি আলাদা করে রাখা হয়। পরবর্তীতে এগুলো অপসারণ করা হয়। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচেছ হাসপাতালসমূহ কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে থাকে তা বিশ্লেশণ করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে গবেষণার আওতাধীন করা হয়েছে।

- বর্জ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ;
- বর্জ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ;
- বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ এবং
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা।

সামগ্রিকভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিবন্ধকতাসমূহ এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

১। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণাধর্মী বিশেষ কোন প্রকাশনা নেই। যা প্রবিতেদন তৈরীর ক্ষেত্রে অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

২। সময় স্বল্পতা ও বিভিন্নমুখী অসুবিধার কারণে গবেষণার জরীপ কাজে উপাত্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মাত্র তিনটি হাসপাতালকে নির্বাচন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সত্যিকার পরিসংখ্যান পেতে অসুবিধা হয়।

৩। জরীপকৃত হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অনীহা ও ভুল তথ্য প্রদান যা সঠিক গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয়।

৪। জরীপকৃত হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সংগ্রহ করতে কোন কোন ক্ষেত্রে ৭/৮ বারও যেতে হয়েছে এতে জরীপে অধিক সময় লেগেছে যা গবেষণাকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ফলাফল

বক্ষব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল উক্ত তিনটি হাসপাতালের অবস্থান গুলশান থানার মহাখালী এলাকায়। পূর্বে এই হাসপাতালগুলির চিকিৎসা পদ্ধতি তেমন সুবিধার ছিল না সেই সাথে ঔষধের ঘাটতি, অনুন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি, কুসংস্কার, অবহেলা, ডাক্তার নার্সের স্বল্পতা, যক্ষা রোগীদের মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৮০% (প্রায়)। সত্তর-এর দশকের পর থেকে বাংলাদেশে যক্ষা রোগীর মৃত্যু সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে এবং বাংলাদেশের একমাত্র যক্ষা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১০০ থেকে ৬০০ তে উন্নীত করা হয়েছে। ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফুসফুসের গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন চালু হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে ক্যান্সার হাসপাতাল ও সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালের অতীত অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। যেমন ছিল না কেমোথেরাপির উন্নত পদ্ধতি তেমনি সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালেও ছিল না উন্নত

ভ্যাকসিনেশন পদ্ধতি। বর্তমানে বিশেষ করে আশির দশকে ক্যান্সার হাসপাতালে উন্নত যন্ত্রপাতি ক্যামোথেরাপির মূল্যবান ঔষধ, আলট্রা ভায়োলেট, রেডিয়েশন পদ্ধতি বিশেষ করে বিটা রেডিয়েশন, গামা রেডিয়েশন পদ্ধতি চালু হয়েছে। তবে বাংলদেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত অসংখ্য রোগীর তুলনায় তা খুবই কম। বাংলাদেশে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল, যার শয্যা সংখ্যা আশির দশকে ছিল ৫০টি। বর্তমানে তা ১০০টি শয্যায় পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০০২ সালের ২৮শে জানুয়ারী জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতালের ৩০০ শয্যার একটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তদ্রুপ সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে ও পূর্বের তুলনায় অনেক জটিল জটিল সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা চালু হয়েছে। হেপাটাইটিস, এইডস, হারপিস সিমপ্লেক্স সহ অত্যন্ত জটিল রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে। গবেষণাকৃত তিনটি হাসপাতালের রোগীর বন্টন সারণী-২ এ দেখানো হলোঃ

সারণী-২

গবেষণাকৃত তিনটি হাসপাতালের রোগীর বন্টন

বক্ষব্যাধি হাসপাতাল	ধরন	ওয়ার্ড সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা	শতকরা হার
	পুরুষ	০৩	২১০	৩৫.০০
	মহিলা	০২	১৩৯	২৩.১৭
	পুরুষ (সার্জারী)	০২	১১২	১৮.৬৭
	পুরুষ (মুক্তিযোদ্ধা) মেডিক্যাল + সার্জারী	০২	৯৯	১৬.৪৯
	মহিলা (মুক্তিযোদ্ধা) মেডিক্যাল + সার্জারী	০১	৪০	৬.৬৭
	মোট	১০	৬০০	১০০

সংক্রামকব্যাধি হাসপাতাল	ধরন	ওয়ার্ড সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা	শতকরা হার
	শিশু ও মহিলা টিটেনাস	০১	২৫	২৫
	পুরুষ (বয়স্ক) টিটেননাস	০১	২৫	২৫
	(মহিলা) ডিপথেরিয়া, হাম, জন্ডিস	০১	২৫	২৫
	(পুরুষ) জন্ডিস, র‍্যাবিস, হারপিস, এইডস	০১	২৫	২৫
	মোট	০৪	১০০	১০০

ক্যান্সার হাসপাতাল	ধরন	ওয়ার্ড সংখ্যা	রোগীর সংখ্যা	শতকরা হার
	পুরুষ ওয়ার্ড (সার্জারী মেডিসিন, গাইনী)	০১	২৭	৫৪
	মহিলা ওয়ার্ড (মেডিসিন, সাজার্রী গাইনী)	০১	২৩	৪৬
	মোট	০২	৫০	১০০

এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বক্ষব্যাধি হাসপাতালের ৬০০টি বরাদ্ধকৃত শয্যার জন্য বক্ষসংক্রান্ত বিভিন্ন রকমের রোগী বর্হিবিভাগে ভীড় জমায়। তন্মধ্যে এ্যজমা সেন্টারে বহির্বিভাগে প্রতিদিন ১০০/১৫০ জন পর্যন্ত রোগী আসে। তাদের শতকরা ৭০% ধূলাবালি বদ্ধ ঘর, ধূয়া, স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়া থেকে আক্রান্ত, ১০% ধূমপান, ৫% উচ্চরক্তচাপ এবং ১৫% এর কেউ কেউ বংশগত এবং অত্যাধিক স্টেরয়েড গ্রহণের ফলে আক্রান্ত। সাধারণ বর্হিবিভাগে প্রতিদিন ৭০০-৮০০ রোগী আসে। এদের মধ্যে শতকরা ৭০% যক্ষা ২০% ফুসফুসের একসেস, ফুসফুসে পানিজমা, ফুসফুসে পুজঁ হওয়া এবং ফুসফুসে বাতাস জমা হওয়া। ৫% বুলেট ইন্জুরী, দূর্ঘটনার শিকার, ৫% জন্ডিস, HBsAg+vc, হেপাটাইটিস বি পজিটিভ ইত্যাদি।

সংক্রামকব্যাধি হাসপাতালের বর্হিবিভাগে প্রতিদিন অসংখ্য জটিল রোগী ভিড় জমায়। তন্মধ্যে জন্ডিস, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ৫০%, হাম, জলবসন্ত ৩০%, এইডস ৫% হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ৩%, হারপিস সিমপ্লেক্স এবং হারপিস জোষ্টার ৫%, কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত এবং অন্যান্য ৭% রোগী।

ক্যান্সার বহির্বিভাগেও প্রতিদিন শত শত রোগী আসে। তন্মধ্যে শতকরা ৬০% ফুসফুসের একসেস এর ফলে ক্যান্সার,মহিলাদের স্তন ক্যান্সার ,২০% অগ্ন্যাশয়ে ক্যান্সার, ১০% ইসুপ্যাগাস (খাদ্যনালী) ক্যান্সার, ৫% থ্রোটক্যান্সার, অবশিষ্ট ৫% অধিকাংশ স্ত্রীলোকের জরায়ুর ক্যান্সার।

বর্জ্যের শ্রেণী

আকারের উপর ভিত্তি করে হাসপাতাল বর্জ্যকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। কঠিন বর্জ্য (Solid waste)

২। তরল বর্জ্য (Liquid waste)

৩। ধারালো বর্জ্য (Sharp waste)

৪। সাধারণ বর্জ্য (General waste)

উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে হাসপাতাল বর্জ্যকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। সাধারণ কঠিন বর্জ্য (General solid waste)

২। মেডিক্যাল বর্জ্য (Medical waste)

৩। অন্যান্য বর্জ্য (Other waste)

'WHO' হাসপাতাল বর্জ্যকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করেছে।

১। সাধারণ বর্জ্য (General waste)

২। ধারালো বর্জ্য (Sharp waste)

৩। ইনফেক্শন বর্জ্য (Infection waste)

৪। রাসায়নিক বর্জ্য (Chemical waste)

৫। অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য (Other Hazardous waste)

- গবেষণাকৃত হাসপাতাল গুলিতে যে বর্জ্যসমূহ তৈরী হয়ে থাকে তার বিভাজন সারণী-৩ এ দেখা যেতে পারে।

সারণী-৩

গবেষণাকৃত হাসপাতালসমূহে উৎপাদিত বর্জ্যের বিভাজন

বর্জ্যের শ্রেণী	বর্জ্যের বিবরণ	উৎপাদনকারী
সাধারণ বর্জ্য	পেপার ক্লথ, বাক্স, প্যাকিং, ঔষধ কনটেইনার, পলিথিন এবং রান্না ঘরের আবর্জনা।	প্রশাসন ল্যাবরেটরী
প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য	টিস্যু, বিভিন্ন অঙ্গপতঙ্গ, রক্ত।	রোগী ল্যাবরেটরী
ইনফেকশন বর্জ্য	সার্জারীর বিভিন্ন উপাদান, ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ইত্যাদি।	রোগী ল্যাবরেটরী
সাইটোটক্সিক	তারিখ অতিক্রম হয়ে গেছে এমন ঔষধসমূহ	রোগী ল্যাবরেটরী
ফার্মা ইলেকট্রিক্যাল	বিভিন্ন নিউক্লিয়ার মেডিসিন বর্জ্য, এক্সরে বর্জ্য, কঠিন, তরল, গ্যাসীয় বর্জ্য ইত্যাদি।	প্রশাসন ল্যাবরেটরী
ধারালো বর্জ্য	সুঁচ, সিরিঞ্জ, কঙ্কাল, ব্লেড, ভাঙ্গা গ্লাস, নখ ইত্যাদি	রোগী এবং ল্যাবরেটরী
তরল বর্জ্য	রক্ত, পূঁজ, বমি, জীব শরীরের জলীয় তরল পদার্থ ইত্যাদি	রোগী, ল্যাবরেটরী, সেবা প্রদানকারী কর্মচারী

বর্জ্য উৎপাদন

গবেষণায় দেখা যায় যে, বক্ষব্যাধি হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭৫০ কেজি সাধারণ বর্জ্য উৎপাদিত হয়, তন্মধ্যে ক্ষতিকারক বর্জ্য ৭০ কেজি, ধারালো বর্জ্য ২৫ কেজি। ৪ নং সারণীতে বক্ষ্যব্যাধি হাসপাতালের একদিনের বর্জ্য উৎপাদন দেখানো হলঃ-

সারণী-৪

বক্ষব্যাধি হাসপাতালে একদিনের বর্জ্য উৎপাদনের ধরন

বিভাগ	সাধারণ বর্জ্য	ক্ষতিকর বর্জ্য	ধারালো বর্জ্য	মোট
মেডিসিন ওয়ার্ড	৩৭৭.৫৫	৩৩.৮	১০.৫	৪২১.৮৫
সার্জারি ওয়ার্ড	১৭৮.৩	২০.৫	৬.৯৫	২০৫.৭৫
ও.টি	৩৩.৬৫	৬.৫	১.৬	৪১.৭৫
ইমার্জেন্সি	১৩.৭০০	২.০০	০.৬৫০	১৬.৩৫
প্যাথলজি	১৭.৯৫	০৯.০০	১.৯৫০	২৮.০৯
ব্লাড ব্যাংক	১৭.৭০০	৩.৮০০	.৯৫০	১৯.৪৫
এক্সরে বিভাগ	১৫.২৫	.৩০০		১৫.৩২৫
আউট ডোর	১২.৫০০	১.৯০০	.৮০০	১৫.২
রান্নাঘর	৯৪.৫			৯৪.৫
প্রশাসন	৭.০০			৭.০০
মোট	৭৬৮.১	৭৭.৮	২৩.৪	৮৬৯.৩

অন্য দুটি হাসপাতালের মধ্যে সংক্রামকব্যাধি হাসপাতাল ও ক্যান্সার হাসপাতালে একদিনে যথাক্রমে ২৫ কেজি ও ১৮ কেজি সাধারণ বর্জ্য, ৯কেজি ও ৮কেজি ক্ষতিকর বর্জ্য, এবং ৬ কেজি ও ৪কেজি ধারালো বর্জ্য সর্বমোট ৪০কেজি ও ৩০কেজি বর্জ্য উৎপাতি হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে সাধারণত বর্জ্যের Generation, Handling, Separation, Carryout, Storage and Disposal সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৯২ সালে 'পরিবেশ ও উন্নয়ন শীর্ষক' জাতিসংঘের এক সম্মেলনে বলা হয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে।

- বর্জ্য উৎপাদন সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণে করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় বর্জ্য পূন:ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে।
- বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও দূষণমুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে।
- যে স্থান বর্জ্য অপসারণের জন্য নির্বাচন করা হবে, সেই স্থান নির্বাচনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশের কথা বিবেচনা করতে হবে।

অর্থাৎ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল কথা হল অভ্যন্তরীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্যের পরিশোধন ও চূড়ান্ত অপসারণ। প্রশাসন সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে সর্বোচ্চ লাভ সম্মৃদ্ধ নিয়মনীতি চালু করে, সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিন প্রকার জনগোষ্ঠীর মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন যেমনঃ-

সুপারভাইজার- হাসপাতালের সুযোগ সুবিধা, হাসপাতালের নীতিমালা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ ও পর্যবেক্ষণ

বর্জ্য উৎপাদনকারী- বর্জ্য কম উৎপাদন করার ক্ষমতা, পরিবেশ সচেতনতা
বর্জ্য অপসারণকারী- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ। যেমন বর্জ্যের ধরন, বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতি এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে DGH (Director of General Health) কর্তৃক ২০০০ইং এ একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো (নিম্নে উপস্থাপিত) প্রকাশিত হয়। গবেষণায় দেখা যায় বক্ষব্যাধি হাসপাতাল এর ৮০%, সংক্রামকব্যাধি হাসপাতাল ও ক্যান্সার হাসপাতাল এর ৭৫% মেনে চলে।

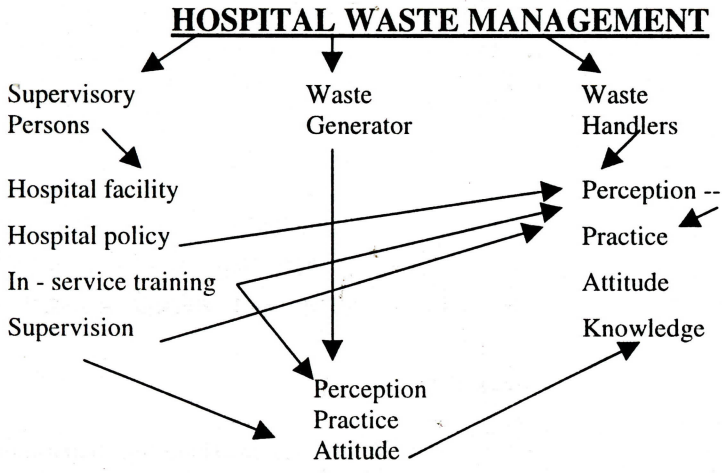

ANALYSIS OF CHECKLIST AND RECORD, OBSERVATION, DISCUSSION WITH KEY INFORMANTS, TABLE WORK AND WORKSHOP.

উৎসঃ বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালি, ঢাকা, বাংলাদেশ ২০০০ইং

বর্জ্যের অপসারণ

নির্দিষ্ট সময়ে বর্জ্যের অপসারণ করা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে তিনটি হাসপাতাল গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে তাদের বর্জ্য অত্যন্ত বিপদজনক; কারণ মানুষ সহজেই এগুলো দ্বারা জন্ডিস, টিটেনাস, পক্স, হাম, ডিপথেরিয়া এমনকি মরণ ব্যাধি এইডসেও আক্রান্ত হতে পারে। সুতরাং সঠিক পদ্ধতিতে বর্জ্যের অপসারণ করা একান্ত প্রয়োজন।

হাসপাতালের আবর্জনা অপসারণ বলতে রোগীর ব্যবহার্য সরঞ্জমাদি বিশেষ করে প্লাষ্টিক সিরিঞ্জ, রক্তের ব্যাগ, গ্লাস , স্যালাইন সেট, স্যালাইন ব্যাগ, ইনজেক্শনের সূঁচ ইত্যাদি সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বিনাশ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুকি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা করাকে বুঝায়।

সাধারণত বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে ছয়টি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, হাসপাতালে বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে Incineration পদ্ধতিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যেমন-

1. Dumping
2. Controlled fippim on Sanitary land fill
3. Incineration
4. Composting
5. Manure pits
6. Burial

১. **Dumping** ঃ Dumping হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে আবর্জনা সমূহ একটি এলাকাতে ফেলা হয় যেমন জলাশয় বা নীচু এলাকায়, যেখানে মানুষ বসবাস করে না। এটা খুবই সহজ পদ্ধতি ও অল্প ব্যয়ে করা যায়। কিন্তু এ পদ্ধতিতে যে ধরনের অসুবিধা দেখা যায় তা হলোঃ-

ক) এই পদ্ধতি মশা ও মাছির জন্ম দেয়, ফলে রোগজীবাণু সহজেই জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

খ) এতে প্রচন্ড রকমের দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় যা থেকে বায়ু দূষণ হয়ে থাকে।

গ) এই পদ্ধতি পানি নিষ্কাশন প্রণালীকে ব্যাহত করে এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে।

২। **Controlled fippim on Sanitary land fill** ঃ এ পদ্ধতিটি প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত এবং ব্যয়বহুল। কোন হাসপাতালের একার পক্ষে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি হাসপাতাল মিলে একসাথে Apply করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে একটি অঞ্চল ঠিক করা হয় তারপর সেখানে বিরাট গর্ত করে আবর্জনা ফেলা হয়। এ গর্তের চারদিকে উচুঁ করে দেওয়াল থাকে যাতে পার্শ্ববর্তী পরিবেশ দূষিত হতে না পারে। এ অঞ্চলে কোন ষ্টোর, গ্যারেজ, পানি সাপ্লাই বা কোন ষ্টাফ কোয়ার্টার থাকবেনা। তবে এখানে Bio Gas plant গড়ে উঠতে পারে।

৩. **Incineration** ঃ এ পদ্ধতি বিশ্বব্যপী অনুসরণ করা হয়। এতে অতিরিক্ত তাপমাত্রা ব্যবহার করে যে কোন ধরনের বর্জ্য যেমন কঠিন, তরল ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফলে ক্ষতিকারক জীবাণু দ্বারা পরিবেশ দূষিত হতে পারে না। গবেষণায় দেখা গেছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু অজ্ঞতার দরুন সঠিক ভাবে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারছে না, ফলে -

(ক) আবর্জনা পরিপূর্ণভাবে পোড়ানো হয় না, ফলে অবশিষ্টাংশ ইঁদূর ও অন্যান্য জীব জন্তুর সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

(খ) বৃষ্টির পর পুনরায় রোগজীবাণু বিস্তার লাভ করে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।

(গ) বর্ষা মৌসূমে বর্জ্য পানিতে মিশে পানি দূষিত করে এবং পানি বাহিত রোগ ছড়ায়।

(ঘ) প্লাস্টিক সিরিঞ্জ, স্যালাইনসেট, ব্লাড ট্রান্সফিউশনসেট ইত্যাদি আগুনে পোড়ালেও সুঁচ গুলো অক্ষত অবস্থায় থেকে যায়, ফলে দূর্ঘটনাবশতঃ মানুষের শরীরে ফুটে মারাত্মক রোগ যেমন জন্ডিস, এইডস, হেপাটাইটিস বি' ইত্যাদি রোগের সংক্রামন ঘটায়।

(ঙ) পদ্ধতিগত ত্রুটির কারনে Incineration-এর পর অবশিষ্ট ছাই থেকে বাতাসের সাহায্যে বায়ু দুষণ ঘটায় এবং বায়ু বাহিত রোগ ছড়ায়।

(চ) **Incineration** - এর পর অবশিষ্টাংশ পুনরায় Disposal-এর প্রয়োজন হয়।

(ছ) এ পদ্ধতিতে যে ধোঁয়া নির্গত হয় বাতাসের সাহায্যে তা চতুর্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ে ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। তাছাড়া নির্গত বাতাসে সিসার (lead) পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়।

৪। **Burial :** এটি অত্যন্ত সহজ ও ব্যবহার উপযোগী একটি পদ্ধতি। ইহাতে ১.৫ মিটার প্রস্থের একটি গর্ত করতে হয় এবং গভীরতা এমন হবে যেন কিছুদিনের মধ্যে গর্ত ভর্তি হয়ে যায়। বর্জ্য দ্বারা গর্ত ভর্তি হয়ে গেলে মাটি দিয়ে উহা ভরাট করে দিতে হয়। অতঃপর আবার পুনরায় নতুন গর্ত খুড়তে হয়। ভর্তি হয়ে যাওয়া গর্ত আবার ৪/৬ মাস পরে ব্যাবহার করা যায়। তবে এই পদ্ধতিতে সুবিধা অসুবিধা উভয়ই আছে, যেমনঃ-

সুবিধা

(ক) এতে ব্যয় কম।

(খ) Maintain করা সহজ।

(গ) কোন শিক্ষিত জনবল লাগে না।

অসুবিধা

(ক) টোকাইরা এসকল গর্ত থেকে সিরিঞ্জ, সুঁচ, স্যালাইন ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে যায় এবং বিক্রি করে।

(খ) অতি দ্রুত পানি দূষিত হয়ে পরে।

(গ) মশা মাছি দ্বারা দ্রুতই রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রতিদিন বর্জ্য অপসারণ করা হয়। এক্ষেত্রে বর্জ্য সমূহ প্রথমে হাসপাতালের নির্দিষ্ট স্থানে/মেঝেয় জমা করা হয় এবং পরবর্তীতে নিকটবর্তী ডাস্টবিনে ফেলা হয়। ৩/৪ দিন পর সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা বর্জ্য অপসারণ করে। তবে সকল বর্জ্য ডাস্টবিনে ফেলা হয় না । কিছু কিছু ইনজেক্শন সিরিঞ্জ Incineration পদ্ধতিতে ধ্বংস করা হয়। তাছাড়া মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

(গ) বর্ষা মৌসূমে বর্জ্য পানিতে মিশে পানি দূষিত করে এবং পানি বাহিত রোগ ছড়ায়।

(ঘ) প্লাস্টিক সিরিঞ্জ, স্যালাইনসেট, ব্লাড ট্রান্সফিউশনসেট ইত্যাদি আগুনে পোড়ালেও সুঁচ গুলো অক্ষত অবস্থায় থেকে যায়, ফলে দূর্ঘটনাবশতঃ মানুষের শরীরে ফুটে মারাত্মক রোগ যেমন জন্ডিস, এইডস, হেপাটাইটিস বি' ইত্যাদি রোগের সংক্রামন ঘটায়।

(ঙ) পদ্ধতিগত ত্রুটির কারনে Incineration-এর পর অবশিষ্ট ছাই থেকে বাতাসের সাহায্যে বায়ু দুষণ ঘটায় এবং বায়ু বাহিত রোগ ছড়ায়।

(চ) **Incineration** - এর পর অবশিষ্টাংশ পুনরায় Disposal-এর প্রয়োজন হয়।

(ছ) এ পদ্ধতিতে যে ধোঁয়া নির্গত হয় বাতাসের সাহায্যে তা চতুর্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ে ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। তাছাড়া নির্গত বাতাসে সিসার (lead) পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়।

৪। **Burial :** এটি অত্যন্ত সহজ ও ব্যবহার উপযোগী একটি পদ্ধতি। ইহাতে ১.৫ মিটার প্রস্থের একটি গর্ত করতে হয় এবং গভীরতা এমন হবে যেন কিছুদিনের মধ্যে গর্ত ভর্তি হয়ে যায়। বর্জ্য দ্বারা গর্ত ভর্তি হয়ে গেলে মাটি দিয়ে উহা ভরাট করে দিতে হয়। অতঃপর আবার পুনরায় নতুন গর্ত খুড়তে হয়। ভর্তি হয়ে যাওয়া গর্ত আবার ৪/৬ মাস পরে ব্যাবহার করা যায়। তবে এই পদ্ধতিতে সুবিধা অসুবিধা উভয়ই আছে, যেমনঃ-

সুবিধা

(ক) এতে ব্যয় কম।

(খ) Maintain করা সহজ।

(গ) কোন শিক্ষিত জনবল লাগে না।

অসুবিধা

(ক) টোকাইরা এসকল গর্ত থেকে সিরিঞ্জ, সুঁচ, স্যালাইন ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে যায় এবং বিক্রি করে।

(খ) অতি দ্রুত পানি দূষিত হয়ে পরে।

(গ) মশা মাছি দ্বারা দ্রুতই রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রতিদিন বর্জ্য অপসারণ করা হয়। এক্ষেত্রে বর্জ্য সমূহ প্রথমে হাসপাতালের নির্দিষ্ট স্থানে/মেঝেয় জমা করা হয় এবং পরবর্তীতে নিকটবর্তী ডাস্টবিনে ফেলা হয়। ৩/৪ দিন পর সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা বর্জ্য অপসারণ করে। তবে সকল বর্জ্য ডাস্টবিনে ফেলা হয় না । কিছু কিছু ইনজেক্শন সিরিঞ্জ Incineration পদ্ধতিতে ধ্বংস করা হয়। তাছাড়া মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

হাসপাতাল প্রাঙ্গনের মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। গবেষণায় বর্জ্য অপসারণে যে সকল ক্ষতিকারক দিক দেখা যায় তা হলোঃ-

হাসপাতালের ভিতরে

(ক) দর্শনার্থী ও রোগীরা হাসপাতালের ভিতরে বর্জ্যের কাছ দিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

(খ) হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও মেডিক্যাল ছাত্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে।

(গ) অতিশয় দুর্গন্ধ ও এলোমেলো অবস্থা।

হাসপাতালের বাহিরে ঃ

(ক) ডাস্টবিনের নিকট উপচে পড়া আবর্জনা ।

(খ) নদর্মা ও ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়া।

(গ) আবহাওয়া দূষিত হওয়া।

(ঘ) ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত হওয়া।

(ঙ) টোকাই দ্বারা সিরিঞ্জ, স্যালাইন ব্যাগ, সুঁচ ইত্যাদি কুড়িয়ে বিক্রি হয়। যা পরবর্তীতে অসাধু ব্যবসায়ীরা পুনরায় বাজারজাত করে বিক্রি করে জন স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে।

প্রস্তাবনা

১। হাসপাতালগুলি জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইড-লাইন মেনে চলতে পারে।

২। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক পর্যায়ে কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৩। যারা বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের সাথে জড়িত তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

৪। বর্জ্য সংগ্রহের বালতিগুলিতে যথাযথভাবে কালার কোড ব্যবহার করতে হবে এবং একটি নির্দেশনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বালতিতে নির্দিষ্ট বর্জ্য রাখার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে ক্লিনার, ওয়ার্ডবয় ও নার্সদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বর্জ্য রাখার কন্টেইনারগুলি এক জায়গায় না রেখে আলাদাভাবে রাখা যেতে পারে এবং কন্টেইনারগুলিতে কঠিন বর্জ্য আমাকে দিন কিংবা তরল বর্জ্য আমাকে দিন এভাবে লিখে রাখা যায়।

৬। কন্টেইনারগুলি বেশ মজবুত ও water proof হওয়া আবশ্যক।

৭। তরল বর্জ্য ফেলার জন্য পরিকল্পিত ড্রেনেজ সিষ্টেম তেরী করতে হবে।

৮। বর্জ্য পোড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করতে হবে। এছাড়াও সকল বর্জ্য নির্দিষ্ট তাপে পোড়ে না কোন কোন বর্জ্য পুড়তে বেশী তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বর্জ্যসমূহ পোড়াতে হবে।

৯। হাসপাতালের অসাধু কর্মচারীরা যাতে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, শিশি, বোতল স্যালাইন ব্যাগ ইত্যাদি বিক্রী করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১০। শুধু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই নয় এর সাথে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং পৌরসভাকে একত্রিত করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাসপাতাল গুলিতে বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বেশ দুর্বল অবস্থায় আছে। যারা এসকল ব্যবস্থার সাথে জড়িত তাদের অভিজ্ঞতার যথেষ্ঠ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ কারনে বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতিটি সঠিক হলেও অজ্ঞতার কারনে অনেক ত্রুটি থেকে যায়। গবেষণায় দেখা যায় ক্ষতিকারক বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে Incineration পদ্ধতিটি বেশী লক্ষ্য করা যায় কিন্তু Incineration এর ক্ষেত্রে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ তাহা হাসপাতাল গুলিতে নেওয়া হয় না। এছাড়া এই পদ্ধতিতে কয়েকটি ধাপে বর্জ্য পোড়াতে হয় যা হাসপাতাল গুলিতে দেখা যায় না। এসকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা স্থান তৈরী করতে হবে, এতে পরিবেশ দুষণ থেকে অনেকখানি রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। হাসপাতাল গুলিতে বর্জ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে অনেক অসচেতনতা ও অজ্ঞতা লক্ষ্য করা যায়। কঠিন, ধারালো এবং তরল বর্জ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে হাসপাতাল সমূহে বিভিন্ন রং এর বালতি ব্যবহার করা হয় কিন্তু অলসতা ও অজ্ঞতার কারণে কঠিন ও ধারালো বর্জ্য প্রায় একই রংয়ের বালতিতে ফেলা হয়, ফলে বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতি সঠিকভাবে পালিত হয় না। হাসপাতালের কঠিন বর্জ্যসমূহ খোলা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হয়। এক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি মানা হয় না, এমনকি সিটি কর্পোরেশনের ট্রাকও এগুলি সাধারণ বর্জ্য হিসাবে সংগ্রহ করে। কর্মীরা এগুলি খোলামেলাভাবে নাড়াচাড়া করে জীবানু ছড়ায়।কোন কোন সময় শিশু ও টোকাইরা উক্ত বর্জ্য নাড়াচাড়া করে সংক্রমক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্য অথচ তা পুনব্যবহারের ফলে অনেকেই HIV, Hepatitis, Sifilish প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ৩০-৪০% সিরিঞ্জ পুনব্যবহৃত হয়। এতে অতি সহজেই বোঝা যায়, অন্যান্য সাধারণ বর্জ্যের মতই যেখানে সেখানে বর্জ্য নিক্ষেপের ফলে টোকাই ও দুস্কৃতিকারী দ্বারা তা পুনরায় repack হয়ে বাজারে আসছে। এছাড়াও যারা বর্জ্য অপসরণের সাথে জড়িত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষার মান অনেক কম এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব খারাপ। এ সকল কর্মচারী ফেলে দেওয়া প্লাষ্টিক বোতল, ব্যাগ কিংবা ব্যবহারকৃত

বিভিন্ন ধরনের প্যাথলজিক্যাল টেষ্ট টিউব বাজারে বিক্রী করে। এসব ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, বোতল ও শিশিতে বিভিন্ন রোগের জীবাণুভরপুর থাকে বলে মনে করা হয়। একটি ডিসপোজিবল সিরিঞ্জ, বোতল বা শিশি এইডস, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, জন্ডিস ইত্যাদি রোগের অন্যতম বাহক। তরল বর্জ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, হাসপাতালসমূহে তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন ড্রেনেজ সিস্টেম নাই। বর্জ্য গুলি সরাসরি পার্শ্ববর্তী ড্রেনে ফেলা হয় এতে ভূ-গর্ভস্থ পানি যেমন দূষিত হয় তেমনি উহাতে মশা, মাছি ও অন্যান্য পোকা-মাকর বসে রোগ-জীবাণু বিভিন্নভাবে ছড়ায়ে থাকে। অন্য এক সমীক্ষায় দেখা যায়, দূষিত রক্ত, স্যালাইন, urine, stool, কাশি, থুথু প্রভৃতির মাধ্যমে শতকরা ৬০% রোগী সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কঠোর নিয়মনীতি তৈরী এবং অনুসরণ করতে পারে।

REFERENCES

- Disposal of needles, Syringes and Gloves, 1992. The hospital infection control group of Thailand, Journal of Medical Association, March 1992, Thailand.
- Hossain, 1998. Spreading of dangerous diseases from Hospital waste, Manabjamin, 25th November, 1998, Dhaka.
- Kamal A.K M.M. 1997. A study on disposal of Hospital waste of a selected District Hospital, Nipsom library Dhaka.
- Khan A. M. 1997, Disposable Syringe often see yeled defying Govt Ban Daily star, 8th July, 1997, Dhaka.
- Managing Medical waste in Development countries 1994, world Health organization, Geneva.
- Observer Magazine, 2000. February 25th Medical waste disposal dangerous indifference Bangladesh.
- Park K; 2001, preventive and social Medicine M/S Banarsidas Bhanot Publishers, India.
- Rashid, Khabiruddin and Hyders, 1992. Community Medicine and Public Health RKH Publishers, Dhaka.
- Reza S; 2000. The Essentials of Community Medicine, Shole Reza Dhaka.
- Situation Assessment and Analysis of Hospital waste Management, Direcorate general of Health services,June 2000,Dhaha.
- Solid waste disposal in district health facilities 1994. World Health form.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় মানবসৃষ্ট সমস্যা ও কয়েকটি সুপারিশ

মোঃ মাহমুদ হাসান*

The Man-Made Crisis in The Drainage System of The South-Western Region and Some Suggestions

Abstract

In this article it has been focused on numerous man-made interventions on natural flow of water of the South-Western rivers. Encroachers and land mongers have changed the nature and characteristics of these rivers by taking illegal possession over the rivers. Illegal human settlements have expanded towards the dried-up river beds at many places. Roads are being constructed on what once used to be rivers . Tanks are being dug and paddy is cultivated on the river beds here and there. All these things have made these rivers blocked, stagnant and turned them into narrow canals. This article attempts to explore the man-made problems, and provide suggestions to mitigate the problems.

ভূমিকা

পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল প্রকৃতি প্রদত্ত নদী এবং অপর মাধ্যম হল কৃত্রিমভাবে খননকৃত খাল। আমাদের নদীবেষ্টিত বাংলাদেশের বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এবং উজান থেকে নেমে আসা পানি জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদী দ্বারা প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। কিন্তু নদীসমূহ পানি নিষ্কাশনে অপারগ হলে দেখা দেয় দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা ও বন্যা যার করুণ পরিণতি প্রাণহানি, ফসলহানি, দুর্ভিক্ষ, রোগবালাই, মহামারি, হাহাকার ইত্যাদি। বাংলাদেশের ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার কথা আমাদের স্মৃতিতে এখনো জাগরুক রয়েছে যা এক ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের জন্ম দিয়েছিল। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরায় এক ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয় যা ছিল ঐ অঞ্চলের জন্য শতাব্দীকালের এক নজিরবিহীন ঘটনা। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্রকায় নদীসমূহ প্রধানত মানবসৃষ্ট কারণে ঐ সময়ে পানি নিষ্কাশনে ব্যর্থ হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার এক মর্মান্তিক অভিশাপ বয়ে আনে। আলোচ্য নিবন্ধে ঐ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের ওপর মানবসৃষ্ট সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেইসাথে সমস্যাসমূহ সমাধানে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

প্রবন্ধ প্রণয়নের যৌক্তিকতা ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ ঐ অঞ্চলের নদীসমূহ প্রধানত মানবসৃষ্ট নানা কারণে পানি নিষ্কাশন করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্হা মুখ থুবড়ে পড়ার কারণে ঐ অথঞ্চলে ভবিষ্যতে বন্যা, দীর্ঘস্হায়ী জলাবদ্ধতা এবং সেইসাথে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে বলে ঐ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত হওয়া দরকার। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে কৃত্রিমভাবে মানবসৃষ্ট ঘটনাগুলোর সমীক্ষা করা শুধু জরুরীই নয়, বরং অপরিহার্য। উপর্যুক্ত যৌক্তিকতার আলোকে আলোচ্য নিবন্ধ বিন্যস্ত করা হয়েছে।

পদ্ধতি ঃ এ নিবন্ধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যার তালিকা নিবন্ধের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। নিবন্ধকার ঐ অঞ্চলের কয়েকটি নদীর গতিপথ স্বচক্ষে অবলোকন করে তাদের বর্তমান বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছেন যা প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

পরিধি ঃ নিবন্ধে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বলতে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং ভূমন্ডলীয় ব্যবস্থার অংশবিশেষ ঐ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার মূল মাধ্যম মাথাভাংগা, ভৈরব, কপোতাক্ষ, বেতনা, ভদ্রা, বেগবতী, নবগংগা, চিত্রা প্রভৃতি নদীকে অন্তর্ভুক্ত করে এদের বর্তমান বাস্তব অবস্থা ও গতিপথের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ঐ অঞ্চলে ২০০০ সালের বন্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধে ঐ অথঞ্চলের মুখ থুবড়ে পড়া পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার ওপর মানবসৃষ্ট কারণসমূহ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেই সাথে সমস্যাসমূহের সমাধানে কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতাঃ প্রবন্ধে সেকেন্ডারি তথ্য তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সকল নদীর ভৌগলিক গতিপথ সচক্ষে নিরীক্ষণ করা নিবন্ধকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট কারণসমূহ নির্ধারণে জনমত জরিপের কোন প্রক্রিয়া এখানে অবলম্বন করা হয়নি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহের পানি নিষ্কাশনের অসামর্থ্যতার ভৌগলিক কারণের বিশ্লেষণ প্রবন্ধে অনালোচিত রয়ে গেছে।

২০০০ সালের অচিন্তনীয় ও নজিরবিহীন এক বন্যাঃ সকলেই ছিলেন অপ্রস্তুত

অপেক্ষাকৃত উঁচু ও বন্যামুক্ত এলাকা বলে পরিচিত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আকস্মিকভাবে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। অর্ধশতাব্দীর আগে এ অথঞ্চলে একবার বন্যা দেখা গেলেও তার তান্ডব, ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতি

এ মহাপ্লাবনের তুলনায় ছিল যৎসামান্যই। ১৯৮৮ সালের মহাপ্লাবনে যেখানে বাংলাদেশ জলের উপর ভেসেছিল, ১৯৯৮ সালের বন্যায় দেশ রাহুগ্রস্ত হয়েছিল, চরম সংকটকালীন সে সময়ও উক্ত অঞ্চল বন্যামুক্ত ছিল। সংগত কারণেই বন্যার সাথে এ অঞ্চলের মানুষের কোন পরিচয় নেই। প্রাকৃতিক নিরীক্ষণেও দেখা যায় এ অঞ্চলে নেই কোন উল্লেখযোগ্য বন্যাপ্রবণ নদী। এ অঞ্চলের ছোট ছোট নদী ভরাট হয়ে হাজামজা ও অনাব্য হয়ে গেছে এবং এরই মধ্যে ২৫টিরও বেশী ক্ষুদ্র নদী ভরাট হয়ে গেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এ সব ক্ষুদ্র নদীর উৎসধারার মুখে পশ্চিমবঙ্গে বাঁধ, ক্রসবাঁধ ও রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এক রকম নিরাপদ ও বন্যামুক্ত অঞ্চল বলে প্রতীয়মান হত। কিন্তু সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধেয়ে আসা অসময়ের প্রলংকরী বন্যা (সাধারণত বন্যার মওসুম হল জুন-সেপ্টেম্বর) একথা প্রমাণ করল যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বন্যামুক্ত বা নিরাপদ নয়, বরং ঘোরতর বন্যাপ্রবণ হতে পারে। মহাসাগরের প্লাবনের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বন্যার পানি হুহু করে মেহেরপুরে ঢুকল, তারপর একে একে চুয়াডাংগা, জীবননগর, দামুড়হুদা, আলমডাংগা, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, শার্শা, ঝিকরগাছা, কেশবপুর, মনিরামপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা, আশাশুনি, তালা, দেবহাটা, কালিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। অভিশপ্ত বানের পানিতে ডুবে গেল মাঠঘাট, শস্যক্ষেত, ঘরবাড়ি, মসজিদ, মন্দির, রাস্তাঘাট সবকিছু। হতবিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আশ্রয় নিল ঘরের ছাদে, গাছের ডালে, মসজিদের ছাদে, কলার ভেলায়, বাঁধের উপর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, উঁচু জায়গায়। প্রাণহানি হল অসংখ্য মানুষের, গবাদিপশুর; গৃহহারা হল লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান। নষ্ট হয়ে গেল মাঠের ফসল, বিধ্বস্ত হল রাস্তাঘাট, ভেড়িবাঁধ, ঘরবাড়ি। বন্যার পানি অপেক্ষাকৃত দ্রুত না সরার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও ঐ সময় বিভিন্ন মহল থেকে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক পরিচিতি ঃ ভূ-ভাগের শিলা গঠন ও পলল সঞ্চয়নের সময় অনুসারে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ব-দ্বীপীয় তলানী অঞ্চলের অন্তর্গত। গঙ্গা ও পদ্মা নদীর পলি দ্বারা এ অঞ্চল গঠিত বলে ধারণা করা হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার (নদীসমূহের) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা হওয়ার কারণে ঐ অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার দুর্বলতার বিষয়টি এই সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। যেহেতু এ অঞ্চলের নিষ্কাশন ব্যবস্থাও নদীভিত্তিক তাই দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জনে ঐ অঞ্চলের নদ-নদীর গতিপথ বর্ণনা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহায়ক বিবেচনায় এদের সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

মাথাভাংগা ঃ পদ্মার শাখা নদী। মুর্শিদাবাদ জেলার জলংগীরের কাছে উৎপন্ন হয়ে কুষ্টিয়ার ইনসাফনগরের কাছে বাংলাদেশে প্রবেশ করে দৌলতপুর, ভেড়ামারা, আলমডাংগা, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর হয়ে পুনরায় চুয়াডাংগার নিকটে ভারতে গিয়ে চুর্ণনদীর সাথে মিশে ভাগিরথী নদীতে পড়েছে। বাংলাদেশ অংশের মাথাভাংগার সংস্কার প্রয়োজন, কারণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের বন্যার পানি মাথাভাংগা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ অংশের উৎসমুখে মাথাভাংগা নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০ কিলোমিটার।

ভৈরব ঃ এককালের জীবন্ত ও তীর্থনদী বলে খ্যাত প্রায় ২৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরব নদী পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার শ্রুতকীর্তির অপরপাড়ে জন্মলাভ করে প্রথমে জলঙ্গী নদীর সাথে মিশে পরে মেহেরপুরে বাংলাদেশে এসে মাথাভাংগার সাথে মিশেছে। পরে মাথাভাংগা হতে মুক্ত হয়ে চুয়াডাংগা, কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, যশোর, ফুলতলা, দৌলতপুর হয়ে খুলনায় এসে রূপসা নদীতে পড়েছে। পরে রূপসা-পশুর হয়ে বঙ্গোপসাগরে নেমেছে। ভৈরবের দু'টো অংশ; উচ্চ ভৈরব ও নিম্ন ভৈরব। মেহেরপুর থেকে যশোরের বসুন্দিয়া পর্যন্ত নদীটি ভরাট ও অনাব্য হয়ে গেছে। এরপর থেকে নদীটি নাব্য। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের বন্যার পানি উচ্চ ভৈরব থেকে নিম্ন ভৈরবে নামতে পারেনি বলে ভৈরব অববাহিকায় বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। ভৈরব নদী নাব্য থাকলে এ অঞ্চলের বন্যার পানি সহজে নিস্কাশিত হত।

কপোতাক্ষ ঃ প্রায় ২৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ সুবিখ্যাত কপোতাক্ষ নদী ভৈরব নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করে ক্ষুদ্রাকারে চৌগাছা, ঝিকরগাছা, কেশবপুর, তালা হয়ে খোলপেটুয়া নদীর সাথে মিশেছে। নদীটি সংস্কারের অভাবে যশোর অংশে অনাব্য হয়ে গেছে। ২০০০ সালের বন্যার পানি কপোতাক্ষ দিয়ে ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত হয়েছে। ভরাট ও অনাব্য হওয়ার কারণে এর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। একে সংস্কার করলে বন্যার বিপদ থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে।

বেতনা ঃ যশোরের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে নাভারন, শার্শা ও কলারোয়া হয়ে চাপরার নিকটে মরিচচাপ নদীতে পড়েছে। শার্শা ও কলারোয়ার বন্যার পানি এ নদী দ্বারা আস্তে আস্তে নিষ্কাশিত হয়েছে। ইতোপূর্বে কোনরূপ সংস্কার না করায় নদীটি হাজামজা, ভরাট ও অনাব্য হয়ে গেছে। ফলে বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারেনি। এ নদীকে খননসহ সার্বিক সংস্কার করলে বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হবে। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯২ কিলোমিটার।

ভদ্রা ঃ ঝিকরগাছার নিকটে কপোতাক্ষ নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে কেশবপুর অতিক্রম করে হরিপুর নদীর সাথে মিশে ভদ্রা নামে ডুমুরিয়া, দাকোপ হয়ে শিবশা নদীতে

পড়েছে। বর্তমানে ভদ্রা কপোতাক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন। কপোতাক্ষের সাথে পুনরায় ভদ্রার সংযোগ স্থাপন করা গেলে কপোতাক্ষের অর্ধেক পানি ভদ্রা দিয়ে নিষ্কাশিত হবে। ভদ্রা নদী সংস্কার করা তাই অপরিহার্য হয়ে পবেছে। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯০ কি.মি.।

চিত্রা ঃ চুয়াডাংগা ও দর্শনার মধ্যবর্তী নিম্নাঞ্চল হতে উৎপন্ন হয়ে কালিগঞ্জ, শালিখা, কালিয়ার ভিতর দিয়ে প্রায় ১৩০ কি. মি. প্রবাহিত হয়ে গাজীরহাটের নিকটে নবগংগার সাথে মিশেছে। পরে এটি দৌলতপুরে এসে ভৈরবে পড়েছে। নদীটি উৎপত্তির স্থান হতে শালিখা পর্যন্ত ভরাট ও অনাব্য হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যার পানি চিত্রা নদী দ্বারা নিষ্কাশিত হতে না পারায় মেহেরপুর ও চুয়াডাংগার বন্যা স্থায়িত্ব পেয়েছে। সুতরাং চিত্রা নদী সংস্কার করা গেলে পশ্চিমাঞ্চলের পানি চিত্রা দিয়ে নিষ্কাশন করা সম্ভব হবে।

নবগংগা ঃ চুয়াডাংগা শহরের নিকটে মাথাভাংগা থেকে উৎপন্ন হয়ে ঝিনাইদহ জেলা অতিক্রম করে মাগুরা শহরের কাছে কুমারের সাথে মিশে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হয়ে লোহাগড়া ও কালিয়া অতিক্রম করে গাজীরহাটের কাছে চিত্রার সাথে মিশেছে। মিলিত স্রোতধারা দৌলতপুরে ভৈরব নদীতে পড়েছে। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩০ কি.মি.। লক্ষ্যণীয়, চুয়াডাংগার পূর্ব দিকে এসে নবগংগার পথ রূদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে মাথাভাংগার বন্যার পানি নবগংগায় নামতে পারেনি বলে বন্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে।

কুমার ঃ চুয়াডাংগা জেলার হাটবোয়ালিয়ায় মাথাভাংগা হতে উৎপন্ন হয়ে নবগংগার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে মাগুরায় এসে নবগংগায় পড়েছে। বর্তমানে কুমারের উৎসমুখ বন্ধ থাকার কারণে নদীটি অনাব্য হয়ে গেছে। কুমার নদীকে মাথাভাংগা নদীর সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হলে চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা অঞ্চলের পানি নিষ্কাশিত হতে পারবে। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৪ কি.মি.।

বেগবতী ঃ চুয়াডাংগা জেলা শহরের কাছে মাথাভাংগা থেকে উৎপন্ন হয়ে বিষয়খালী আড়পাড়া হয়ে শালিখায় এসে চিত্রা নদীতে পড়েছে। উৎসমুখ হতে ঝিনাইদহ পর্যন্ত নদীটি ভরাট হয়ে গেছে। ফলে বেগবতী দ্বারা পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে না। এর নাব্যতা বজায় থাকলে উক্ত অঞ্চলের পানি নিষ্কাশিত হতে পারত। বেগবতীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭২ কিলোমিটার।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহের বাস্তব অবস্থা

কোন কালেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মাথাভাংগা, ভৈরব, কপোতাক্ষ, ইছামতি, বেতনা, কোদলা, নবগংগা, চিত্রা, বেগবতী, ভদ্রা, কুমার, ফাটকী প্রভৃতি নদী খনন ও সংস্কার করা হয়নি। এ অঞ্চলে বন্যা না হওয়ার কারণে এসব নদীর সংস্কারের দাবীও জোরেশোরে ওঠেনি। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের বন্যা যখন প্রাণঘাতি, প্রলয়ংকরী ও ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল তখন বিভিন্ন মহল থেকে

এদের খননসহ সার্বিক সংস্কার করার দাবী উঠল। এসব নদীর অনেকাংশই অবৈধ দখলদাররা দখল করে নিয়ে তাদের কেউ চাষাবাদ করছে, কেউ দালানকোঠা নির্মাণ করেছে, কেউ পুকুর খনন করে মাছ চাষ করছে। আবার কোথাও দেখা যাবে নদীবক্ষ বা নদীতীর অবৈধভাবে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, কোথাও নদীবক্ষে আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিয়ে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে, অথচ সেখানে প্রয়োজন ছিল ব্রীজ। ফলে এসব নদী তাদের স্বাভাবিক প্রবাহ হারিয়ে ফেলেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যার দীর্ঘস্থায়িত্বের মানবসৃষ্ট কারণ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা ও বন্যার দীর্ঘস্থায়িত্বের সাক্ষাৎ কারণ মানবসৃষ্ট । যখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যার কোন আলামতই নেই তখন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের সকল নদীর বাঁধ ওরা রাতারাতি খুলে দিলে উক্ত অঞ্চলে বন্যার পানি অতিদ্রুত চলে আসে এবং গ্রামের পর গ্রাম জলমগ্ন হয়ে যায়। ভারত বাংলাদেশের সাথে এ ব্যাপারে কোন পূর্ব আলোচনা করেনি বলে বাংলাদেশের ঐ অঞ্চলের মানুষ বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি এবং দ্রুত আশ্রয়স্থানে যেতে পারেনি। যখন বন্যার পানি এল তখন আর তা নদী দ্বারা সমগতিতে নিষ্কাশিত হতে পারল না। কারণ ঐ অঞ্চলের নদীগুলোর পানি নিষ্কাশনযোগ্যতা ছিল না। পানি নিষ্কাশনযোগ্যতা না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহের ওপর মানুষের বিরূপ আচরণ ও অত্যাচার। যে অঞ্চলে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে কোন ভয়ংকর বন্যা দেখা দেয়নি সে অঞ্চলে ভয়ঙ্কর বন্যা এল এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বন্যা এসেছে যা পূর্বেই বলা হয়েছে, কিন্তু বন্যার পানি কেন নিষ্কাশিত হয়নি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করলেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বন্যার দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের বিবেচনায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যার দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ নিম্নরূপ যার অধিকাংশই মানবসৃষ্ট।

এক) নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ হওয়া

প্রাকৃতিক কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহ ভরাট ও অনাব্য হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও নদীতে বাঁধ দিয়ে এর গতিপথ বন্ধ করা হয়েছে। অবৈধ দখলদাররা তাদের ইচ্ছেমতো নদী দখল করে নদীর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বদলে দিয়েছে। ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ রুদ্ধ হওয়ার কারণে বন্যার পানি সাগরাভিমুখে নিষ্কাশিত না হতে পেরে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় রূপ নেয়।

দুই) বিল-বাঁওড় ও নীচু এলাকার সাথে নদী বা খালের সংযোগহীনতা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ বিল-বাঁওড় ও নীচু এলাকার বদ্ধপানি খাল বা নদীর দ্বারা নিষ্কাশিত না হবার কারণে পানি জমে স্থায়ী পানিবদ্ধতার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া বিদ্যমান খালসমূহ সংস্কারের অভাবে বন্যার পানি বহনে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

তিন) অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা না করে ঐ অঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট তৈরী, নদী বা খালের উপরে বাঁধ নির্মাণ, ক্রসবাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির কারণে পানির স্বাভাবিক নিম্নগামী প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়ে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং বন্যা দীর্ঘস্থায়ীত্ব লাভ করে।

চার) চিংড়ি ঘের তৈরী

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে সাতক্ষীরা জেলায় অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র চিংড়ি ঘের তৈরী করার কারণে কোথাও কোথাও খাল ও নদীর গতিপথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে এবং কোথাও কোথাও খাল ও নদী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফলে বেতনা ও কপোতাক্ষসহ অন্যান্য নদী দ্বারা বন্যার পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

পাঁচ) নদীতে মৎস্য পুকুর তৈরী

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত ভৈরব নদী দ্বারা (উচ্চ ভৈরব) মেহেরপুর ও চুয়াডাংগা অঞ্চলের বন্যার পানি কপোতাক্ষ নদীতে পড়েছে কিন্তু এর মূলধারার যে অংশ যশোর, অভয়নগর, ফুলতলা, দৌলতপুর, হয়ে খুলনায় পড়েছে সে অঞ্চলের ভৈরবে (নিম্ন ভৈরব) বন্যার পানি এক ফোঁটাও আসেনি। কারণ, যশোর অঞ্চলের ভৈরব নদীর অধিকাংশ স্থানে পুকুর তৈরী করে মৎস্য চাষ করা হয়েছে। ফলে ভৈরব নদী আর নদী নেই, পুকুরে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও ভৈরব নদীর উপর রাস্তা তৈরী করে এর গতিপথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, অবৈধ দখলদাররা একে গ্রাস করার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে ভৈরব মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে ২০০০ সালের বন্যার পানি যদি যশোরের মূল ভৈরবে (নিম্ন ভৈরব) নামতে পারত তাহলে বন্যা এত ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী হত না।

ছয়) চিত্রা নদীর সংযোগহীনতা

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অপর বিখ্যাত নদী চিত্রার সাথে উচ্চ ভৈরবের সংযোগ না থাকার কারণে মেহেরপুর ও চুয়াডাংগা অঞ্চলের পানি চিত্রা নদীতে আসতে পারেনি। ফলে ঐ অঞ্চলে বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশিত না হয়ে দীর্ঘস্থায়ীত্ব লাভ করে।

বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ও পানি নিষ্কাশনে মানবসৃষ্ট সমস্যা সমাধানে কতিপয় সুপারিশঃ

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদনদীর ওপর মানুষের অবিমৃষ্য ও বিধ্বংসী কার্যকলাপের কারণে ঐ অঞ্চলের নদীসমূহ নাব্যতা হারিয়ে পানি নিষ্কাশনের অযোগ্য হয়ে পড়েছে যার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে দেখা দিল ২০০০ সালের বন্যার প্রাদুর্ভাব, সাথে সাথে পানি নিষ্কাশনহীনতা ও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা। এমতাবস্থায় দক্ষিণবাহী নদীসমূহের বর্তমান করুণ অবস্থাকে সামনে রেখে মানবসৃষ্ট পানি নিষ্কাশনহীনতা দূরীকরণার্থে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ

করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একথা ঠিক যে, বাংলাদেশ ভাটির দেশ বিধায় বন্যার সম্ভাবনা থেকেই যাবে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি নিষ্কাশন সমস্যার প্রেক্ষাপটে বন্যা প্রতিরোধসহ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচ্য হতে পারে।

প্রথমতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীসমূহ খনন ও সংস্কার করাঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহ খননসহ সার্বিক সংস্কার করে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, নদী প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে নদীর কোন বিকল্পই নেই। নদী দ্বারা পানি নিস্কাশিত হলে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দক্ষিণবাহী নদীসমূহ পানি নিষ্কাশনের অযোগ্য হওয়ার কারণেই সেখানে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত ঃ নদী ও খালের উপর থেকে অবৈধ ও জবরদখলদারিত্বের অবসান ঘটানঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যার পানি নদী দিয়ে ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত হয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, নদী আমাদের অকৃত্রিম ও পরম বন্ধু। সুতরাং নদীর প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তার উপর কোন জবরদখল বা অন্য কোনরূপ অত্যাচার করা চলবে না।

তৃতীয়ত ঃ নদীর চলার স্বাধীনতা দান করাঃ নদীর চলার অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার চলার পথে কোন বাধা আরোপ করা যাবে না। বিশেষ করে নদীর উপর আড়াআড়ি রাস্তা তৈরি করে তাকে রুদ্ধ করা যাবে না। ২০০০ সালের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যার ক্ষেত্রে দেখা গেল বন্যার পানি নদী দ্বারা দ্রুত সরে না যাওয়ার কারণে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হল। বন্যার পানি ভৈরব, মাথাভাংগা, কপোতাক্ষ, ইছামতি, বেতনা, প্রভৃতি নদী দ্বারা নিষ্কাশিত হয়েছে। কিন্তু এ সব নদী ভরাট হাজামজা, অপ্রশস্ত, অনাব্য ও মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়ার কারণে পানি বহন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। ফলে বন্যার পানি নীচে নামতে না পেরে দু'কূল ছাপিয়ে সমতল ভূমি গ্রাস করে ও বন্যা স্থায়ী বিপদ হিসেবে দেখা দেয়। কৃত্রিমভাবে খাল কেটে পানি নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুবই কঠিন ও ব্যয়বহুল, সেহেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যমান মৃতপ্রায় নদীগুলো খননসহ সার্বিক সংস্কার করে পানিবহনযোগ্য ও নাব্য করে তোলা দরকার।

চতুর্থত ঃ খাল খনন ও সংস্কার করে নদীর সাথে সংযোগ দেয়া ঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যে সব নীচু এলাকা ও বিল- বাওড়ে বন্যার পানি জমা হয়ে বন্যা স্থায়ীত্ব লাভ করল সে সব বিল- বাওড় ও নীচু এলাকা থেকে কৃত্রিম খাল কেটে পার্শ্ববর্তী নদীর সাথে সংযোগ করে দিলে পানি সহজেই নিষ্কাশিত হয়ে যাবে এবং পানিবদ্ধতা দেখা দেবে না। প্রয়োজনে বিদ্যমান খালসমূহের সংস্কার করে পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

পঞ্চমত ঃ পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, ভেড়িবাঁধ ও ক্রসবাঁধ নির্মাণ

পানি যাতে জমে না থাকে সেজন্য সুপরিকল্পিতভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রেখে রাস্তাঘাট, ভেড়িবাঁধ ও ক্রসবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। এর ফলে অতিবৃষ্টি বা বন্যার পানি আটকে থাকবে না, জলাবদ্ধতাও দেখা দেবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিল ডাকাতিয়ায় যে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে অপরিকল্পিতভাবে ভেড়িবাঁধ ও নদীতে স্লুইচ গেট নির্মাণ। ভেড়িবাঁধ ও স্লুইচ গেট নির্মাণের ফলে নদীর পানি বিল ডাকাতিয়ায় প্রবেশ না করার কারণে বিলের তলদেশ পূর্ববৎ গভীর থেকে যায়, অপরদিকে নদীতে পানি জমে থেকে এর তলদেশ ভরাট হয়ে যেতে থাকে। ফলে বৃষ্টির পানি বিলে জমা হয়ে থাকে, নদী তা আর ধারণ করতে পারে না। এভাবে ভেড়িবাঁধ তৈরী ও নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণের কারণে "বিল ডাকাতিয়া" লাখ লাখ মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সুতরাং নদীতে ক্রসবাঁধ, স্লুইচ গেট, বাঁধ বা ভেড়িবাঁধ তৈরীর ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখেই তা করতে হবে।

ষষ্ঠত ঃ নদীতে পুকুর তৈরী বন্ধ করা

নদীতো নদীই। তার গতিপথ বন্ধ করে তাতে পুকুর তৈরী করা যাবে না। বিশেষতঃ ভৈরব, কপোতাক্ষ, বেতনা প্রভৃতি নদীর ওপর কৃত্রিমভাবে মৎস্য পুকুর তৈরী করা যাবে না। পুকুর তৈরী করে এদের গতিপথ বন্ধ করা হয়েছে বলে বন্যার পানি নীচে নামতে পারেনি। সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থে নদীর ওপর মৎস্য পুকুর তৈরী ও ইজারা দেয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

সপ্তমত ঃ চিংড়িচাষ নিয়ন্ত্রণ করা

যেহেতু বিশেষ করে সাতক্ষীরা অঞ্চলে যত্রতত্র নদী ও খালের ভিতরে চিংড়ি ঘের করে খাল ও নদীপথ বন্ধ করা হয়েছে, তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ঐ সকল নদী বা খালকে যথার্থ অর্থেই উন্মুক্ত করতে হবে; সেখানে চিংড়ি চাষ করা যাবে না। প্রয়োজনে নতুন খাল খনন করা যেতে পারে।

অষ্টমত ঃ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সকল খাল ও নদী থেকে সকল ধরনের অবৈধ স্থাপনা ও দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে হবে। আর এজন্য উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা দরকার। নদী থেকে দখলদারদের উচ্ছেদ করতে ব্যর্থ হলে নদীর বিদ্যমান অবস্থাও থাকবেনা, অচিরেই সম্পূর্ণ নদীগ্রাস সম্পন্ন হয়ে যাবে।

নবমত ঃ দেশপ্রেম জাগ্রত করা ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলা

শুধু কলকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া, গ্যাস, ময়লা, আবর্জনা ও বর্জ্যই যে পরিবেশ দূষিত করে তাই নয়; খাল ও নদী দখল, তাতে অবৈধ স্থাপনা তৈরী, তাদের গতিপথ বন্ধ করা, অপরিকল্পিত চিংড়িঘের তৈরী, নদীতে মৎস্যপুকুর তৈরী করা

ইত্যাদি কারণে যে নদীর গতিপথ বন্ধ হয়ে যায় এবং পরিণতিতে বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয় সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা যত না প্রাকৃতিক, তার চেয়ে মানব সৃষ্ট নানা কারণে বিপর্যস্ত অবস্থায় নিপতিত হয়েছে। একদিকে, গংগা বা পদ্মা নদীর শাখা-প্রশাখা হিসেবে দক্ষিণাভিমুখী প্রবাহিত ঐ অঞ্চলের নদীসমূহ পশ্চিমবঙ্গে বাঁধ নির্মাণের কারণে পানিশূন্যতায় ও পানি ছিনতাইয়ের কবলে পড়েছে। ফলে স্রোতহীন এসব নদী হাজামজা ও অনাব্য হয়েছে। অপরদিকে মানবসৃষ্ট কারণে এগুলো আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এগুলোর বাস্তব অবস্থা এই যে, আইনের তোয়াক্কা না করেই অবৈধ দখলদাররা এসব নদী দখল ও গ্রাস করার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নদীর বুকে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ করে এর অস্তিত্বনাশ করার সকল আয়োজন করা হচ্ছে। নদীবক্ষ ও নদীতীর দখল করে ধান চাষ বা মৎস্য চাষ করা হয়েছে, চিংড়ি ঘের তৈরি করা হয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে প্রতিরোধহীনভাবে। ফলে নদ-নদীর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় নদীর প্রতি অন্যায় ও অবিবেচনাপ্রসূত মানব আচরণের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রায়। মানবসৃষ্ট এসব সমস্যা মোকাবেলার জন্য মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে, সচেতন হতে হবে এবং বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।। **এদের প্রবাহমান করার স্বার্থে এদের বুকের ওপর থেকে সকল বাধা অপসারণ করতে হবে, সকল বাঁধ কেটে দিতে হবে; যেখানে ব্রীজ প্রয়োজন সেখানে ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে। মোট কথা নদীকে জীবন্ত ও উন্মুক্ত করতে যা যা করা দরকার তা করতে হবে। আর এগুলো আমাদের বাঁচার তাগিদেই শুধু নয়, আমাদের অনাগত প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্যও এটা করতে হবে।** সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশন করার স্বার্থে ঐ অঞ্চলের সকল নদীকে উন্মুক্ত করার দরকার বিধায় নদীকে অবৈধ দখলমুক্ত করা আশু জরুরী এবং পরবর্তীতে নদী খননসহ সংস্কার করার প্রয়োজন। বৃহত্তর এ প্রক্রিয়ায় সর্বসাধারণকে জড়িত করার পাশাপাশি সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। তবে সর্বদলীয় রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস ও দেশপ্রেম যুক্ত না হলে নদীসমূহ পানি নিষ্কাশনযোগ্য করা অসম্ভব হয়ে যাবে। এমতাবস্থায়, ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করা, জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং রাজনৈতিক দলসমূহের সত্যিকার সদিচ্ছা একান্তভাবে জরুরী।

তথ্য সহায়তা

১। সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা ঃ ৮ অক্টোবর ২০০০।

২। দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা ঃ ১৩ অক্টোবর ২০০০।

৩। দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা ঃ ১৭ অক্টোবর ২০০০।

৪। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ঃ ১৯ অক্টোবর ২০০০।

৫। ভোরের কাগজ, ঢাকা ঃ ১৯ অক্টোবর ২০০০।

৬। দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ঃ ২১ অক্টোবর ২০০০।

৭। জীবনের জন্য নদী ঃ হ্যাগার্ট, কেলি (অনূদিত ঃ শরফুদ্দীন, আবদুল্লাহ আল-মুতী, সাহিত্য প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৬।

৮। বাংলাদেশের নদী ঃ আজহারুল হক, সৈয়দ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৯। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ভূগোল ও পরিবেশ ঃ হাসান, মাহবুব, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

১০। বাংলাদেশের নদীমালা ঃ আব্দুল ওয়াজেদ, প্রকৌশলী; ঢাকা, ১৯৯১।

১১। যশোর জেলার ইতিহাস ঃ আসাদ, আসাদুজ্জামান; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ঢাকা, ১৯৮৯।

১২। সুন্দর বনের ইতিহাস ঃ আব্দুল জলিল, এ, এফ, এম; আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮৬।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া

মোঃ শাহ আলম গাজী*

The process of Settlement of Audit Objection

Abstract

The public accounts of the Republic and all authorities and officers of the Government should be audited and reported on by the Auditor General. For that purpose any person authorized by him or her on behalf of Auditor General shall have access to all records, books, vouchers, documents, cash, stamps, securities, stores or other Government property in the possession of any person in the service of the Republic. The reports of the Auditor General relating to the public accounts of the Republic should be submitted to the President, which should be laid before Parliament.

An attempt has been made to understand the process of settlement of audit objections in this article. This article may help to broaden the knowledge of public officials working in different Government, semi-government and autonomous bodies.

১.০ ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮, ১৩১ ও ১৩২ অনুচ্ছেদসমূহ, সি এন্ড এজি (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এ্যাক্ট ১৯৭৪ এবং ঐ এ্যাক্টের ১৯৭৫ সালের সংশোধনীর বিধানবলে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক যথাক্রমে প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি হিসাব রাখেন ও ঐ হিসাবের অডিট করেন। সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অডিট কার্যাবলী সম্পাদন ও বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট পেশ করেন। সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে সি এন্ড এজি কিংবা তাঁর প্রতিনিধি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রশিদ, দলিল, নগদ অর্থ, ষ্ট্যাম্প, জামিন, ভান্ডার বা অন্য প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত। এরূপ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন নন। অডিট সম্পর্কিত বিষয়ে যে কোন বিধি প্রণয়ন ও নির্দেশাবলী প্রদান তাঁর নিজস্ব এখতিয়ার। রুলস্ অব বিজনেস অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারের আর্থিক বিধি বিধান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। এতদভিন্ন আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের জারিকৃত নির্দেশিকা, কর্মপদ্ধতি, ব্যাখ্যা ইত্যাদি আছে। কাজেই সংক্ষেপে এ দাঁড়ায় যে, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর দায়িত্ব পালনের ভিত্তি হল নিম্নরূপঃ

১. তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা;

* সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

২. সরকার (অর্থ মন্ত্রণালয়) কর্তৃক প্রণীত আর্থিক নির্দেশমালা;
৩. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশিকা, ব্যাখ্যা, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি;
৪. দেশের প্রচলিত সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক আইন।

অডিটের প্রাথমিক কার্যাবলী হলো হিসাবের সঠিকতা ও যথার্থতা যাচাই করা যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সকল রাজস্ব ও প্রাপ্তি যথাযথ খাতে হিসাবভুক্ত হয়েছে এবং সকল ব্যয় ও প্রদান যথাযথ ভাউচার, কর্তৃত্ব দ্বারা সমর্থিত হয়েছে এবং ইহাদের শ্রেণীকরণ শুদ্ধ হয়েছে, সর্বোপরি চূড়ান্ত হিসাবে আর্থিক চিত্রের সার্বিক ও সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। এতদসংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা দেখা। অডিটের কার্যাবলী আর্থিক বিষয়াবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সরকারি অর্থ ব্যয়ের মিতব্যয়িতা নিশ্চিত করার বিষয়টি নির্বাহী কর্তৃপক্ষের হলেও আর্থিক অডিটের আওতায় অডিট অযথা, অনিয়মিত, অমিতব্যয়, অপচয় ও অযৌক্তিক ব্যয় প্রভৃতি বিষয়গুলো পরীক্ষা করে থাকে।

অডিট রিপোর্টে কি কি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি ও মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত হবে তা অডিটর জেনারেলই নির্ধারণ করেন, কোন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই কিংবা তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের। উল্লেখ্য যে, সকল অডিট আপত্তিই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বভেদে যথাযথ যাচাই-বাছাই পূর্বক অডিটর জেনারেলের বিবেচনা অনুযায়ী অডিট আপত্তি অডিট রিপোর্টে স্থান পায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির যথেষ্ট সুযোগ যেমন থাকে তেমনি অডিটের ফলাফল প্রক্রিয়াকরণেরও দীর্ঘ প্রক্রিয়া রয়েছে। অডিট আপত্তিতে শুধু কি কি বিধি বা আদেশ লঙ্ঘিত হয়েছে তার উল্লেখই যথেষ্ট নয় বরং অনুরূপ আদেশ লংঘনে সরকারি আর্থিক স্বার্থ কতটুকু এবং কিভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে তারও পরিস্ফুটন প্রয়োজন। অর্থ মন্ত্রণালয় ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে অডিট আপত্তির ধরন, সংখ্যা, আর্থিক বিধির লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিষয়াদি যেমন অডিট থেকে অবহিত রাখা আবশ্যক তেমনি আর্থিক নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি সমধিক গুরুত্ব অরোপ করাও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

অডিট তার কার্যকর মূল্যের উপর নির্ভরশীল, যা তার অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে অডিট রিপোর্টের ফলাফল যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণার্থে কর্তৃপক্ষের নিকট যথাসময়ে তুলে ধরে অনিয়ম দুর করা এবং একই অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করার মধ্যে নিহিত। যথাযথ কর্তৃপক্ষ হলেন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, সরকার নিজে অথবা সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে পার্লামেন্ট। অডিট আপত্তি উপস্থাপন থেকে শুরু করে পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে আলোচনাকরণ পর্যন্ত দীর্ঘ পক্রিয়া সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

২.০ অডিট পদ্ধতি

বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ৯ (নয়) টি অডিট অধিদপ্তরের মাধ্যমে বেসামরিক, সামরিক ও রেলওয়ে অডিট কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। এ নয়টি

অডিট অধিদপ্তরাধীন নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিট সংখ্যা ২২৫০০টি। উল্লেখ্য ৩০০টি অডিট পার্টি সাংবৎসরিক অডিট কাজে নিয়োজিত থেকে পোষ্ট অডিট (Post Audit) এবং আরও সুস্পষ্টভাবে হিসাবে নির্ভুলতা ও পূর্ণাঙ্গতা যাচাইয়ের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল পরীক্ষামূলক অডিট (Test Audit) করে থাকে। সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের অডিট দুইটি পর্যায়ে বিভক্তঃ (১) প্রাথমিক (Initial) অডিটঃ প্রত্যেক আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পর কোনও প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের উপর আর্থিক অডিট (২) চূড়ান্ত হিসাব অডিটঃ লাভ-ক্ষতি, ম্যানুফ্যাকচারিং, ট্রেডিং একাউন্ট, ব্যালান্সসীট ও উপযোজন হিসাবের উপর অডিট। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বৎসর এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানের পঞ্জিকা বৎসর অনুসারে হিসাব সম্পন্ন হয়। সে অনুযায়ী গুরুত্বভেদে অডিট কাজ সম্পন্ন করা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসরে এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বকেয়া অডিটের ক্ষেত্রে কয়েকটা বৎসরের হিসাব একসাথে অডিট করা হয়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন সময়ে সরকারের বিশেষ নির্দেশে কিংবা সংবাদপত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে অডিট কাজ সম্পাদিত হয় এবং একে বিশেষ অডিট বলা হয়ে থাকে। অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কনকারেন্ট অডিট পার্টি সারা বৎসরই কর্মরত থাকে যাতে আর্থিক অনিয়ম তাৎক্ষণিক দূর করা সম্ভব হয়। আবার কেন্দ্রীয়ভাবেও কিছু কিছু পোষ্ট অডিট কাজ সম্পাদিত হয়। পোষ্ট অডিটের মাধ্যমে উত্থাপিত অডিট আপত্তি ও অডিট মন্তব্যের সমন্বয়ে অডিট রিপোর্ট প্রণীত হয়। অর্থাৎ অডিট বা নিরীক্ষা হচ্ছে কোন কাজ সম্পাদনের পর কাজটি সঠিক নিয়মে করা হয়েছে কিনা, সঠিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে কিনা, সঠিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে কিনা, ব্যয়ীত অর্থের সঠিক হিসাব ও কাগজপত্র সংরক্ষিত হয়েছে কিনা, অর্থ ব্যয়ের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছে কিনা, বাজেট বরাদ্দ আছে কিনা ইত্যাদি পর্যালোচনা করার নামই অডিট বা নিরীক্ষা।

২.১ নিরীক্ষাকালে যাচাই যোগ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

ক) বেতন বিলঃ

১) নির্ধারিত ফরমে উত্তোলিত হয়েছে;
২) গ্রহীতা আইনসম্মত দাবীদার;
৩) সঠিকভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে;
৪) প্রথম নিয়োগোত্তর বেতন ছাড়া সকল প্রথমবার বেতনের সমর্থনে শেষ বেতনের প্রত্যায়নপত্র রয়েছে;
৫) প্রথম নিয়োগোত্তর বেতনের সময় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রত্যয়ন পত্র;
৬) গাণিতিকভাবে হিসাব শুদ্ধ;
৭) ছুটিতে থাকা কর্মচারী অনুমোদিত ছুটিতে রয়েছেন;
৮) নন-গেজেটেড কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন উত্তোলনের সময় এ মর্মে প্রত্যয়ন পত্র রয়েছে;
৯) দক্ষতা সীমা অতিক্রমকালীন নিয়ন্ত্রকারীর

গ) ক্ষতিপূরণ ভাতা ও সম্মানী ভাতা বিলঃ

১) মঞ্জুরীকারী কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত কর্মচারীকে ভাতা প্রদানের যৌক্তিকতা রেকর্ড করেছেন;
২) ক্ষতিপূরণ ভাতা যাতে গ্রহীতার লাভের উৎসে পরিণত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ঘ) ঠিকাদারী ও সরবরাহের বিলঃ

১) ঠিকাদারী নিয়োগের চুক্তির শর্তাবলী সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট;
২) চুক্তি প্রণয়নের পূর্বে আইনগত ও আর্থিক উপদেশ গৃহীত হয়েছে;
৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া চুক্তির শর্ত পরিবর্তিত হয়নি;

প্রত্যয়ন পত্র বিলের সাথে রয়েছে;

খ) ভ্রমণ ভাতা বিলঃ
১) ভ্রমণ বাস্তবে করা হয়েছে;
২) ভ্রমণের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধি করা হয়েছে;
৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;
৪) তা সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে করা হয়েছে;
৫) বর্তমান বিল পূর্বে উত্তোলিত হয়নি;
৬) উত্তোলিত অর্থ প্রচলিত হার ও শর্তের সাথে সংগতিপূর্ণ।

৪) খোলা দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োজিত হয়েছে এবং সর্বনিম্ন দরদাতাকে বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে কারণ দর্শানো হয়েছে;
৫) দরপত্র বাছাইকালে দরপত্র দাতার আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা হয়েছে;
৬) ঠিকাদারের নিকট অর্পিত সরকারি সম্পত্তির হেফাজতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
৭) সরবরাহকৃত সামগ্রী ভাল অবস্থায় গৃহীত হয়েছে;
৮) দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণী বিলে রয়েছে।

৩.০ অডিট আপত্তি উত্থাপন

বার্ষিক অডিট কর্মসূচির ত্রৈমাসিক কর্মসূচি অনুযায়ী অডিট দল কোন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান/অডিট কিংবা হিসাব শাখার প্রধান এর নিকট পরিচয় প্রদানের পর অডিট কাজ শুরু করে। অডিট শুরুর প্রথম ২/১ দিন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, জটিলতা, ব্যাপকতা, কর্মপদ্ধতি এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য জারিকৃত হালনাগাদ নির্দেশিকা ইত্যাদি অনুধ্যান (Study) করার পর অডিট দল লিখিতভাবে অডিট অধিযাচন পত্রের (requisition letter) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বুক, রেজিষ্টার, ভাউচার, দলিলাদি সংগ্রহ পূর্বক সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। অডিটকালীন বিভিন্ন অনুসন্ধিৎসা (query) বা অবজারভেশন (observation) লিখিতভাবে অফিস প্রধান বা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানকে প্রদান করে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে জবাব প্রদানের অনুরোধ জানায়। অডিট অনুসন্ধিৎসার লিখিত জবাব প্রাপ্তির পর তা যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনাপূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হলে খসড়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। উল্লেখ্য যে, দৈনন্দিন যে সকল অনিয়ম নজরে আসে সে সকল অনিয়মই অবজারভেশনের মাধ্যমে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের গোচরীভূত করার বিধান আছে। কোন কোন সাধারণ ধরনের আপত্তি থাকে যা লিখিত অনুসন্ধানীপত্র ইস্যু না করেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর করলে এবং কর্তৃপক্ষ অডিটকালীন নিয়মিত করে নিলে চূড়ান্ত পরিদর্শন রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয় না। নিয়মানুযায়ী মূল পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির জন্য অডিটকালীন প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রতিবেদন নিয়ে অডিটের শেষ দিনে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে অডিট দলের আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনার গুরুত্ব এই যে ইস্যুকৃত আপত্তিগুলোর মধ্যে আলোচনার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যায় অনেক আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ থেকে যায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির উপর কি কি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তা প্রতিষ্ঠান প্রধান জানতে পারেন এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

৩.১ অডিট বা নিরীক্ষার প্রকারভেদ

অডিট বা নিরীক্ষা ২ প্রকার

ক) প্রি-অডিট (খরচ পূর্ব নিরীক্ষা)
খ) পোষ্ট-অডিট (খরচোত্তর নিরীক্ষা)

পোষ্ট অডিট আবার ৩ (তিন) প্রকার। (১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (২) বহিঃনিরীক্ষা (৩) সরকারি নিরীক্ষা।

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ঃ প্রায় বিভাগ ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব নিরীক্ষক দ্বারা নিজস্ব অফিসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করিয়ে থাকে। এই ধরণের নিরীক্ষাকে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বলে।

(২) বহিঃনিরীক্ষা ঃ বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো লিমিটেড কোম্পানী, ব্যাংক, বীমা, এনজিও প্রভৃতির হিসাবাদি কোম্পানী আইন ১৯১৩ মোতাবেক চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করানোর বিধান রয়েছে। এরূপ নিরীক্ষাকে বহিঃনিরীক্ষা বলা হয়।

(৩) সরকারি নিরীক্ষা ঃ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করাকেই বলে সরকারি নিরীক্ষা। এগুলো সবই খরচোত্তর নিরীক্ষা (Post audit)। প্রাক্তন এজি এর নিয়ন্ত্রণাধীন সি,এ,ও, জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এবং থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সকল মন্ত্রণালয় এবং সকল সরকারি অফিসের প্রি-অডিট এর কাজ সম্পন্ন এবং ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

৩.২ অডিট আপত্তি নিরসনের লক্ষ্যে সরকারি তহবিলের টাকা উত্তোলন ও প্রদানের বিষয়ে নীচের বিধানসমূহ অনুসরণ করা হয় ঃ-

১। দাখিলকৃত বিলে কোন সনের, কোন মাসের বেতন, ভ্রমণ ভাতা বিলে, অফিসারের নাম কর্মচারীর নাম, কর্মস্থল, মূল বেতন, পদবী সদর দপ্তর, তারিখ, হিসাবের খাত উল্লেখ এবং ডিডিও, নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

২। বিলে দাবিকৃত বেতন, বেতনের ধাপ, বাড়ি ভাড়া, আপ্যায়ন ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, দৈনিক ভাতা, মাইলেজ, রেলভাড়া, ষ্টিমার ভাড়া, মালের ভাড়ারহার, মালের পরিমাণ, সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩। ভবিষ্য তহবিল, কল্যাণ তহবিল, যৌথ বীমা, বাড়ি ভাড়া, ডাক জীবন বীমা, পৌর কর, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যয় কর প্রণালী, বিদ্যুৎ, গাড়ী ব্যবহার, অতিরিক্ত উত্তোলিত বেতন ও ভাতাদি, বেতন অগ্রীম, বদলীর ভ্রমণ ভাতা অগ্রিম, গৃহনির্মাণ, মটরকার, মটর সাইকেল অগ্রিম, ঋণ, বিধি মোতাবেক কর্তন এবং প্রয়োজনীয় সিডিউল বিলের সাথে দিতে হবে।

৪। বিলের নীট দাবী অংকে, কথায় লিখিত হবে, কাটাকাটি এবং উপরিলিখন চলবে না। বিলে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও সংশোধন স্থলে অনুস্বাক্ষর থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫। নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, আত্মীকরণ, ছুটি মঞ্জুরী, পদ সৃষ্টি, লোক বল, বন্টন নামা বরাদ্দ, অগ্রিম ভ্রমণের আদেশ বিলের সাথে দিতে হবে। এসবের মূল কপি ডাকের (পোষ্ট অফিসের) মাধ্যমে হিসাব রক্ষণ অফিসে আসতে হবে।

৬। জেলা, থানা, প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিস হতে শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র চাকুরীর ইতিহাস, ছুটির হিসাব, ভবিষ্য তহবিলের জমা হিসাব প্রদান করতে হবে (বদলীর ক্ষেত্রে)।

৭। বাড়ি সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র, ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র, সুস্পষ্টভাবে দিতে হবে এবং এর নিচে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

৮। টাইপ করা, কার্বন কপি, অফিস কপি, বিল অডিট অফিসে গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। পুর্ববর্তী পদের, বর্তমান পদের, পূর্ববর্তী কর্মস্থলের, বর্তমান কর্মস্থলের, অব্যাহতিপত্র, যোগাযোগ পত্র, দায়িত্বভার ত্যাগের দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিবেদন দিতে হবে। অঘোষিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে প্রতি স্বাক্ষর করে দিতে হবে।

১০। ঘোষিত কর্মকর্তার বেলায় নিরীক্ষা অফিস হতে ছুটির প্রাপ্যতা রিপোর্ট ব্যতীত ছুটি মঞ্জুরী আদেশ অডিট অফিসে গ্রহণযোগ্য নয়। আরো উল্লেখ্য যে, ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে এবং ছুটি শেষে যথাযথ দায়িত্বভার ত্যাগ এবং দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিবেদন বিলের সাথে দিতে হবে।

১১। বিলের উল্লেখিত সময়ে কর্মরত ছিলেন কিনা অথবা ছুটিতে থাকলে ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে কিনা প্রয়োজনবোধে তার প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে।

১২। অনুপস্থিত বিবরণী বিলে দেয়া হয়েছে এবং ছুটি সার্ভিস বুকে নোট করা ছিল কিনা এই মর্মে প্রত্যয়ন দিতে হবে।

১৩। ছুটিকালীন বেতন বিল আলাদা হবে এবং ছুটিকালীন যাতায়াত ভাতাও আলাদা হবে।

১৪। কর্মচারীর দক্ষতা সীমার অফিস আদেশ বিলের সাথে দিতে হবে।

১৫। বিলটি যথা সময়ে দাখিল না করার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। এক্ষেত্রে এস,আর ৯০(এ) ও (বি) অনুযায়ী বিলম্বভেদে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ইনভেষ্টিগেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে।

১৬। পূর্বে যে সকল টোকেন এর মাধ্যমে বিল তোলা হয়েছিল সে সমস্ত টোকেন নং বিলের গায়ে উল্লেখ করতে হবে। এরিয়ার নোটিং সার্টিফিকেট দিতে হবে।

১৭। বিলে উল্লেখিত খরচের মঞ্জুরী অডিট অফিসে ডাকে প্রেরণ করতে হবে এবং বিলের সাথেও ১টি কপি দিতে হবে।

১৮। অডিট অফিসে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের সহিত বিলের প্রদত্ত স্বাক্ষরের মিল থাকতে হবে। স্বাক্ষরের নিচে তারিখ দিতে হবে।

১৯। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী খরচের পরিমাণ ভেদে যথার্থভাবে টেন্ডার আহ্বান, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে। বর্তমান প্রচলিত বিধানানুযায়ী ৫০০ টাকার উর্দ্ধে কেনা কাটার জন্য দরপত্র আহবান এবং খরচের পরিমাণ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্দ্ধে হলে পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা প্রয়োজন।

২০। মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক দরপত্র, কার্যাদেশ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং গ্যারান্টি সার্টিফিকেট এর মূল কপি দিতে হবে।

২১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-এম/এফ/(ইপি-১ ডিপি-৪/৮৫/১৫৮ তারিখঃ ২৯/৭/৮৫ আইটেম নং ৯ মোতাবেক গাড়ী মেরামত এর ক্ষেত্রে সরকারি মেরামত কারখানার অপরাগতার পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং মেরামত উত্তর ফিটনেস সার্টিফিকেট এর মূল কপি দিতে হবে। পুরানো যন্ত্রাংশগুলো কোথায় রাখা হয়েছে সে মর্মে বিলের গায়ে সনদ প্রয়োজন।

২২। আসবাব পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশানুযায়ী (পুনঃ-৯/৮৪/১৪৬ তারিখঃ ২১/১০/৮৩ গণপূর্ত কাঠ কারখানা বিভাগ হতে আসবাবপত্র সংগ্রহ করতে হবে। নচেৎ উক্ত দফতরের অপারগতার সনদ দাখিল করতে হবে।

২৩। বিলের গায়ে ভাউচার এ মালামাল বুঝে পাওয়ার পর মওজুত রেজিষ্টার এন্ট্রির প্রত্যয়ন দিতে হবে।

২৪। বাড়ি ভাড়ার বিলে পুরা বাড়িটি সরকারি অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা এই মর্মে প্রত্যয়ন করতে হবে। সরকারি নির্দেশ (এম/এফ (এসি-১) ডিপি-৪/৮৫/১৫৮ তারিখঃ ২৯/৭/৮৩ আইটে নং ১৩ (২১) (প) মোতাবেক পিডব্লিউডি-এর অপরাগতা সনদ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট বাড়িটির উপর আয়কর প্রদান করা হয় কিনা আয়কর দপ্তরের ফাইল নম্বরসহ বাড়িওয়ালা কর্তৃক বিলে প্রত্যয়ন পত্র দিতে হবে।

২৫। সঠিক পরিমাণ আয়কর কর্তন করতে হবে এবং কর্তনের সিডিউল বিলের সাথে দিতে হবে।

২৬। বাজেট বরাদ্দ সঠিকভাবে দেখাতে হবে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিমাণ দাবীর সমর্থনে সম্পূরক মঞ্জুরী প্রয়োজন। উপযোজনের ক্ষেত্রে যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপযোজন অনুমোদিত হতে হবে।

২৭। যানবাহনের জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবহণ পুলের স্মারক নং-এই/ই(টি/আর)-১ ষএম-১৪/৮২-৮০৬ তারিখঃ ১২/৭/৮৪ মোতাবেক গাড়ির সিসি

নং অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ তেল বাবহার করা যাবে । সরকারি পুল/মনোনীত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে জ্বালানী সরবরাহ হতে হবে । বিলে গাড়ি নং-সিসি নং এবং লগ বই এর এন্ট্রি সংক্রান্ত বিষয়াদি উল্লিখিত হতে হবে ।

৩.৩ নিরীক্ষা আপত্তি কিভাবে উত্থাপন করা হয়?

নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপনে কতিপয় নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হয়ঃ যেমন -

ক) প্রত্যেক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার একটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম থাকে (টাকার অংকসহ);

খ) প্রত্যেক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসায় প্রতিষ্ঠানের নাম, নিরীক্ষার বৎসর এবং যে সকল রেকর্ডপত্র হতে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করা হয়েছে তার নাম উল্লেখ করা হয়;

গ) প্রস্তুতকৃত জিজ্ঞাসা অনুচ্ছেদে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এবং গাণিতিক হিসাব উল্লেখ থাকে;

ঘ) নিরীক্ষা আপত্তির শেষাংশে অনিয়মের কারণ ব্যাখ্যার জন্য স্থানীয় অফিস প্রধানকে অনুরোধ জানাতে হবে;

ঙ) নিরীক্ষা দল প্রধানের স্বাক্ষরের পরে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসাটি স্থানীয় অফিস প্রধানের বরাবরে জবাব প্রদানের জন্য প্রেরণ করতে হয় । এটি নিরীক্ষা দলের পিয়ন বহিতে লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে এবং প্রাপকের প্রাপ্তি স্বীকারোক্তিমুলক স্বাক্ষত নিতে হয়;

চ) নিরীক্ষার শেষ দিন অথবা উভয় পক্ষের সুবিধামত কোন একদিন প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে অথবা তার প্রতিনিধির সাথে নিরীক্ষা দল নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন, আলোচনাকালে সন্তোষজনক জবাবের ভিত্তিতে কিছু কিছু অনুচ্ছেদের আপত্তি নিষ্পত্তি হতে পারে ।

৪.০ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নমুনাঃ

(ক) ভূমিকা ঃ প্রতিষ্ঠানের নাম, নিরীক্ষা বৎসর, নিরীক্ষা পরিচালনার সময়কাল, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(খ) প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনঃ

(১) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, পদবী ও স্থায়ীত্বকাল;

(২) আহরণ ও ব্যয়ন অফিসারের নাম, পদবী ও স্থায়ীত্বকাল;

(৩) আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয় জড়িত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও স্থায়ীত্বকাল ।

৪.১ অডিট প্রতিবেদন

অডিট প্রতিবেদন দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

প্রথম ভাগঃ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ যা খসড়া অনুচ্ছেদ হিসেবে অভিহিত ।গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ অডিট শেষ হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করার রীতি আছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ইস্যুর পূর্বেই এগুলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা, প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবের জন্য ইস্যু করার কথা । এরূপ গুরুতর অনিয়ম সংক্রান্ত আপত্তিগুলোকে অগ্রিম অনুচ্ছেদ বলা হয়ে থাকে ।

ক) গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়মের অনুচ্ছেদ সমূহ;

খ) সাধারণ অনুচ্ছেদ সমূহ;

গ) এ অনুচ্ছেদ বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জারী করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য/সুপারিশসহ নিরীক্ষা বিভাগে জবাব প্রদান করতে হয়;

ঘ) এ অনুচ্ছেদ বিভাগীয় প্রধানের বরাবরে জারী করা হয় এবং বিভাগীয় প্রধানের মন্তব্য/সুপারিশসহ নিরীক্ষা বিভাগে জবাব প্রদান করতে হয় ।

দ্বিতীয় ভাগঃ প্রতিষ্ঠানসমূহের চূড়ান্ত হিসাবের উপর মন্তব্য ।

চূড়ান্ত হিসাবের উপর মন্তব্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকেঃ

১. কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয় ।

২. ব্যবসায়িক কার্যক্রম ।

৩. ষ্টোর, ষ্টক, পরিবহনাধীন পণ্য সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।

৪. বিবিধ দেনাদার/ব্যবসায়ী দেনাদার, অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী ।

৫. স্থায়ী সম্পদ বাস্তব প্রতিবেদন, অপচয় নির্ধারণ সংক্রান্ত অনিয়ম সমূহ ।

৬. ক্যাশ ও ব্যাংক সংক্রান্ত বিষয়াদি ।

৭. বিভিন্ন বিনিয়োগ, ঋণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ।

৮. ঘাটতি, অনিয়মিত সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি ।

৯. হিসাব পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি ।

১০. হিসাব অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয় ।

১১. মূলধন ও ব্যয় পর্যালোচনা, ফান্ড ব্যবহার ইত্যাদি ।

চূড়ান্ত হিসাবের উপর প্রণীত মন্তব্য সংশ্লিষ্ট সচিব ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট প্রেরণের বিধান আছে । এক্ষেত্রেও ছয় সপ্তাহ সময় দিয়ে মতামত প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয় । কোন মতামত/মন্তব্য না পাওয়া গেলে দুই সপ্তাহের ব্যবধানে দুটো তাগিদপত্র দেয়া হয় । এতেও সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে মন্তব্য চূড়ান্ত করা হয় ।

৫.০ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ এবং অডিটে উত্থাপিত অন্যান্য বিষয় মীমাংসার প্রাথমিক দায়িত্ব প্রদানকারী কর্মকর্তার অফিস প্রধানের এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে শুধুমাত্র গুরুতর আর্থিক অনিয়ম অবগত করানো নয় বরং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অগ্রগতিও জানাতে হয় । গুণগত মানসম্মত অডিট আপত্তি উম্থাপন এবং অডিট আপত্তিসমূহের কৌশল, দ্রুত এবং জোরালোভাবে অনুসরণ করে ত্বরিত অডিট রিপোর্ট প্রণয়নের মধ্যেই অডিটের যথার্থতা নিহিত । রিপোর্ট নিরীক্ষা বিভাগের মহা-পরিচালকের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয় । মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত হলে আপত্তিসমূহ সংকলন পূর্বক পুস্তক আকারে মুদ্রণ করা হয় । মুদ্রিত পুস্তক মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আনুষ্ঠানিকভাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট অর্পণ করেন । রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে আলোচনার জন্য একটি পাবলিক একাউন্টস কমিটি গঠন করেন । বিরোধী দল ও সরকারি দলের জাতীয় সংসদের সদস্যদের সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠন করা হয় । পাবলিক একাউন্টস কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংকলিত আপত্তির অনুচ্ছেদসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । এ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পর্যায় সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

৫.১ অডিটকালীন নিষ্পত্তি (Spot Disposal during Audit):

ক. কোন ইউনিট/প্রতিষ্ঠান অডিটকালীন অডিট অনুসন্ধানী পত্রের (query sheet) পরিপ্রেক্ষিতে কোন আপত্তির যথাযথ লিখিত জবাব প্রদান করলে কিংবা আপত্তি নিয়মিত করে নিলে খসড়া পরিদর্শন রিপোর্টে উক্ত আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, অডিট টীম স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক ঐ সকল আপত্তি নষ্পিত্তি করতে পারেন। যদিও উপস্থাপিত সকল অডিট আপত্তিই খসড়া প্রতিবেদনের সাথে আলাদাভাবে সংযোজনপূর্বক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার বিধান আছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনর্বিবেচনা, পর্যালোচনা ও অন্তর্ভুক্তির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সুযোগ থাকে ।

খ. নিয়মানুযায়ী স্থানীয় পরিদর্শন রিপোর্টে অন্তর্ভুক্তির জন্য অডিটকালীন প্রস্তুতকৃত খসড়া পরিদর্শন রিপোর্ট নিয়ে অডিটের শেষ দিনে ইউনিট/প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে আলোচনা করতে হয় এবং কি কি অডিট আপত্তি হয়েছে তা তাকে দেখাতে হয় । তার দেখা ও আলোচনার পরই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয় । বিভিন্ন আপত্তির উপর বিশদ আলোচনায় ও যথাযথ ব্যাখ্যায় এবং যুক্তিতে অনেক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ থাকে ।

গ. অনেক সময় অডিট আপত্তির জবাব পর্যালোচনা পূর্বক বাস্তব যাচাই সাপেক্ষে মীমাংসিত কিংবা পরবর্তী অডিটে যাচাইযোগ্য মন্তব্য প্রদান করে অডিট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয় । অডিটকালীন যেহেতু পূর্ববর্তী পরিদর্শন রিপোর্টের অমীমাংসিত আপত্তিগুলো পর্যালোচনা করার বিধান আছে সেহেতু বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত

আপত্তিগুলোর যথাযথ তথ্য, উপাত্ত, বিধি, অনুমোদন অডিট টীমকে দেখানো হলে অডিট টীম বাস্তবে পরীক্ষাপূর্বক আপিত্ত মীমাংসার সুপারিশ করতে পারেন । ফলে এভাবে অনেক আপত্তি নিষ্পত্তির সুযোগ থাকে ।

৫.২ অডিট অফিসে আপত্তি নিষ্পত্তি (Disposal in Headquarter of the Audit):

ক. স্থানীয় পরিদর্শন রিপোর্ট প্রয়োজনীয় সমীক্ষান্তে অডিট ইউনিট/প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাব চাওয়া হয় । অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির যোগাযোগের প্রাথমিক পদক্ষেপ অনুযায়ী অডিট ইউনিট/প্রতিষ্ঠান অডিট আপত্তি ভিত্তিক যথাযথ জবাব অডিট অফিসে প্রেরণ করবেন । ইউনিট অফিস এবং নিয়ন্ত্রণকারী অফিস তাদের মতামত/মন্তব্য অডিট সমীপে তুলে ধরবেন, অডিট অফিসের এ প্রাথমিক জবাবকে ব্রডশীট জবাব বলা হয়ে থাকে । ব্রডশীট জবাবের ভিত্তিতে অডিট অফিস আপত্তিগুলো পুনঃপর্যালোচনা করে থাকে এবং জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্মোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে ঃ

১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি আদেশ/নির্দেশ, ব্যাখ্যা পর্যালোচনাপূর্বক জবাব সন্তোষজনক হলে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়,

২) অর্থ আদায় করতে হবে এমন আপত্তিগুলোর অর্থ আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণাদি দাখিল করলে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়,

৩) অর্থ সমন্বয় কিংবা অবলোপন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিল করলে পর্যালোচনাপূর্বক আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয় ।

ব্রডশীট জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল আপত্তি মীমাংসিত বলে গণ্য করা যায় না তার কারণ অডিটকে জানানো হয় । এর প্রেক্ষিতে পুনঃজবাব পেলে পর্যালোচনাপূর্বক আপত্তি মীমাংসা করা হয় ।

খ. অডিট আপত্তিভিত্তিক জবাবের সাথে প্রয়োজনীয় দলিল, তথ্য, প্রমাণক দাখিল করা না হলে জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও বাস্তব যাচাইয়ের প্রয়োজন হয় । অডিট আপত্তির গুরুত্বভেদে তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তব যাচাই টীম গঠনপূর্বক জবাবের সঠিকতা যাচাই করে আপত্তি মীমাংসার ব্যবস্থা নেয়া হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা টীমকে না পাঠিয়ে পরবর্তি অডিটে বিষয়টি যাচাই করা হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয় ।

গ. তহবিল তছরুপ, আত্মসাৎ জালিয়াতি, অপচয়, অনিয়মিত ব্যয়, মামলা সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়াদি যথাযথ অনুসরণের জন্য তাগিদপত্র দেয়া হয়ে থাকে । এ সকল গুরুতর আর্থিক অনিয়মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানের দৃষ্টিগোচর করা হয় । এভাবে বারংবার যোগাযোগের মাধ্যমে সন্তোষজনক জবাব পেলে আপিত্ত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয় ।

৫.৩ ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

সরকারি অর্থ/সম্পদ অপচয় সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিরসনকল্পে সরকার ১৪/০৯/১৯৮৬ তারিখ ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটি গঠনের অনুমোদন প্রদান করে ।

ক. মন্ত্রণালয়/বিভাগের যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটিকে প্রতি মাসে অন্তত একবার মিলিত হওয়ার এবং প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন অফিস পরিদর্শনপূর্বক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

খ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন সি এন্ড এজিকে নিয়মিত প্রেরণ পূর্বক এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। সি এন্ড এজিকে প্রতিবেদনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মনিটরিং করার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের মতামত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

গ. মন্ত্রণালয়/বিভাগের অডিট শাখাকে শক্তিশালী করে অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

ঘ. যে সকল অডিট আপত্তির সাথে আন্তঃ মন্ত্রণালয়/আন্তঃ বিভাগীয় লেনদেন জড়িত সে সকল ক্ষেত্রে আন্তঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চতর পর্যায়ে কমিটি গঠন/নিয়মিত বৈঠক করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়া হয়।

ঙ. সিএন্ডএজি-এর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার পর্যায়ে অন্ততপক্ষে ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

চ. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে ত্রৈমাসিক প্রতিদেবন মন্ত্রিপরিষদে দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়।

৫.৪ অগ্রিম অনুচ্ছেদ ও খসড়া অনুচ্ছেদ প্রণয়ন পর্যায়ে আপত্তি মীমাংসা

স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন জারি থেকে শুরু করে অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্তির পূর্ব পর্যন্ত যোগাযোগের চুড়ান্ত পর্যায়ে প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার সমীপে আধা-সরকারি পত্রে দেয়া সময়সীমা পর্যন্ত ১৮০ দিন (২৬ সপ্তাহ) সময় থাকে যে কোন অডিট আপত্তি মীমাংসার জন্য। কিন্ত বাস্তবে যোগাযোগের বিভিন্ন পর্যায়ে তার চেয়েও বেশী সময় ক্ষেপণ হয়। এত সময় পরও যখন আপত্তির জবাব পাওয়া যায় না কিংবা জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয় না তখন অডিট আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়। এমনকি, সিএন্ডএজি কর্তৃক খসড়া অডিট আপত্তি অনুমোদিত হয়েছে কিন্ত অডিট রিপোর্ট চুড়ান্তভাবে ছাপা হয়নি এমন পর্যায়েও আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হলে এবং তা প্রমাণসহ অডিট অফিসে পেশ করা হলে সি এন্ড এজি-এর অনুমোদনক্রমে আপত্তি মীমাংসার সুযোগ থাকে । তবে যে সকল অডিট রিপোর্ট চুড়ান্তভাবে মুদ্রিত হয়েছে, সংসদে পেশ করা হয়েছে বা পেশের অপেক্ষায় আছে তার কোন অনুচ্ছেদ আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় হলেও মীমাংসা করার অবকাশ থাকেনা, এমনকি অনুরূপ অনুচ্ছেদের অর্থ অবলোপনের কোন সুযোগও থাকেনা। তবে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায়ের অবস্থা কিংবা অবলোপনের যথার্থতা পাবলিক

ক. মন্ত্রণালয়/বিভাগের যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটিকে প্রতি মাসে অন্তত একবার মিলিত হওয়ার এবং প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন অফিস পরিদর্শনপূর্বক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

খ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন সি এন্ড এজিকে নিয়মিত প্রেরণ পূর্বক এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। সি এন্ড এজিকে প্রতিবেদনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মনিটরিং করার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের মতামত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

গ. মন্ত্রণালয়/বিভাগের অডিট শাখাকে শক্তিশালী করে অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

ঘ. যে সকল অডিট আপত্তির সাথে আন্তঃ মন্ত্রণালয়/আন্তঃ বিভাগীয় লেনদেন জড়িত সে সকল ক্ষেত্রে আন্তঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চতর পর্যায়ে কমিটি গঠন/নিয়মিত বৈঠক করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়া হয়।

ঙ. সিএন্ডএজি-এর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার পর্যায়ে অন্ততপক্ষে ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

চ. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে ত্রৈমাসিক প্রতিদেবন মন্ত্রিপরিষদে দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়।

৫.৪ অগ্রিম অনুচ্ছেদ ও খসড়া অনুচ্ছেদ প্রণয়ন পর্যায়ে আপত্তি মীমাংসা

স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন জারি থেকে শুরু করে অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্তির পূর্ব পর্যন্ত যোগাযোগের চুড়ান্ত পর্যায়ে প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার সমীপে আধা-সরকারি পত্রে দেয়া সময়সীমা পর্যন্ত ১৮০ দিন (২৬ সপ্তাহ) সময় থাকে যে কোন অডিট আপত্তি মীমাংসার জন্য। কিন্ত বাস্তবে যোগাযোগের বিভিন্ন পর্যায়ে তার চেয়েও বেশী সময় ক্ষেপণ হয়। এত সময় পরও যখন আপত্তির জবাব পাওয়া যায় না কিংবা জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয় না তখন অডিট আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়। এমনকি, সিএন্ডএজি কর্তৃক খসড়া অডিট আপত্তি অনুমোদিত হয়েছে কিন্ত অডিট রিপোর্ট চুড়ান্তভাবে ছাপা হয়নি এমন পর্যায়েও আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হলে এবং তা প্রমাণসহ অডিট অফিসে পেশ করা হলে সি এন্ড এজি-এর অনুমোদনক্রমে আপত্তি মীমাংসার সুযোগ থাকে । তবে যে সকল অডিট রিপোর্ট চুড়ান্তভাবে মুদ্রিত হয়েছে, সংসদে পেশ করা হয়েছে বা পেশের অপেক্ষায় আছে তার কোন অনুচ্ছেদ আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় হলেও মীমাংসা করার অবকাশ থাকেনা, এমনকি অনুরূপ অনুচ্ছেদের অর্থ অবলোপনের কোন সুযোগও থাকেনা। তবে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায়ের অবস্থা কিংবা অবলোপনের যথার্থতা পাবলিক

একাউন্টস কমিটির শুনানী গ্রহণকালে কমিটি সমীপে তুলে ধরা হলে আপত্তি নিষ্পত্তি হতে পারে।

৬.০ পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে অডিট আপত্তি উত্থাপন ও আলোচনা করণের প্রক্রিয়া

অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনার জনা সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৩ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৫ সুদস্য বিশিষ্ট পাবলিক একাউন্টস কমিটি রয়েছে। এ কমিটির কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

১. সরকারের ব্যয় নির্বাহকল্পে সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থের নির্দিষ্টকরণ সম্বলিত হিসাব, সরকারের বার্ষিক আর্থিক হিসাব ও সংসদে উত্থাপিত অন্যান্য আর্থিক হিসাব পরীক্ষা করা;

২. সি এন্ড এজি-এর পেশকৃত বাৎসরিক উপযোজন হিসাব ও আর্থিক হিসাব পরীক্ষা করা ;

৩. সি এন্ড এজি-এর পেশকৃত অডিট রিপোর্টসমূহ পরীক্ষা করা।

এ কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সচিবদের এবং সিএন্ডএজি ও তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সংসদে পেশকৃত অডিট রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অডিট আপত্তি ও হিসাবের উপর মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করে এবং উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে। সভানুষ্ঠানের পূর্বে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে সভার আলোচ্যসূচি নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় এবং আলোচ্যসূচির উপর জবাব প্রণয়ন করে, কমিটি সমীপে সভার তিন দিন পূর্বে পেশের নির্দেশ দেয়া হয়, অডিটিকেও ঐ জবারের উপর মন্তব্য প্রণয়নের জন্য ও কমিটি সমীপে পেশের অনুরোধ জানানো হয়। বিভিন্ন সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটি তাঁদের কার্যকালের কার্যপদ্ধতি নিজেরা প্রণয়ন করে, কখনও কখনও সাব-কমিটি করে দেয়া হয় এবং মূল কমিটি ও সাব-কমিটি/কমিটিগুলো কোন কোন মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি পর্যালোচনা পূর্বক তা নির্দিষ্ট করে থাকে। শুনানী গ্রহণকালে কোন কোন অডিট আপত্তি/অডিট মন্তব্যের জবাব কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুনঃজবাব প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। কখনও কখনও অডিটি ও মন্ত্রণালয়কে একত্রে বিষয়গুলো পুনঃপর্যালোচনাপূর্বক কমিটি সমীপে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। এভাবে একটি বৎসরে আলোচিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি ও অডিট মন্তব্যের উপর কমিটির গৃহীত সুপারিশের ভিত্তিতে সংসদ কার্যপ্রণালী বিধি ২১১ মোতাবেক সংসদে প্রতিবেদন আকারে কমিটির সুপারিশমালা পেশ করা হয়।

কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন ও অনুসরণের জন্য পিএসি-এর সচিবালয় রয়েছে। এতদ্ব্যতীত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীন পিএসি সেল নামে একটি সেল রয়েছে। বিভিন্ন

অডিট অধিদপ্তর থেকে কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করা হয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত তাগিদ দেয়া, বাস্তব যাচাই করা, পর্যালোচনা বৈঠক করা ও ফলাফল কমিটিকে অবগত করানো হয়।

৭.০ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অন্তরায়সমূহ

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ত্রিমুখী সমস্যা বিদ্যমান। একটা কাঁচির (scissors) যেমন দুটো অংশই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা অংশ ছাড়া অপর অংশ অকেজো তেমনি অডিটি ও অডিটর একে অন্যের পরিপূরক। দুয়ের পারস্পরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা ব্যতীত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে সমস্যা থেকেই যায়। অধিকন্তু, অডিটি ও অডিটর কতটুকু দায়িত্বশীল হবেন তা সামগ্রিকভাবে কার্যকর সংসদের উপর নির্ভরশীল। অডিটি, অডিটর এবং সংসদ তথা পাবলিক একাউন্টস কমিটির অডিট আপত্তি মীমাংসার সমস্য নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল ঃ

৭.১ অডিট কার্যকালীন (During the conduct of Audit)

ক. অডিট কার্যকালীন অডিট অনুসিন্ধৎসা পত্রের (audit queries) সুস্পষ্ট ও লিখিত জবাব পাওয়া যায় না। জবাব না পাওয়ার দরুন অডিট দলের পক্ষে একতরফা মন্তব্য পেশ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

খ. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য, ডকুমেন্টস প্রায়ই অডিট-এর সময়ে দেখানো হয় না অথবা তথ্য উপস্থাপনে বিলম্ব ঘটে। ফলে সাধারণ প্রকৃতির অনেক অনিয়ম পরিদর্শন প্রতিবেদনে স্থান পায়।

গ. পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদনের অমীমাংসিত অনুচ্ছেদসমূহ প্রায়ই অডিট প্রতিষ্ঠান/ইউনিটে সুবিন্যস্তভাবে থাকে না। ফলে অডিট দল সর্বক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পরিদর্শন রিপোর্টগুলোর অমীমাংসিত আপত্তিগুলোর সর্বশেষ হালনাগাদ অবস্থা তুলে ধরতে পারে না। এ কারণে মীমাংসাযোগ্য বহু আপত্তি অকারণে অমীমাংসিত থেকে যায়।

ঘ. বাস্তব যাচাই সাপেক্ষে মীমাংসিত বা বাস্তব বাচাইযোগ্য অনুচ্ছেগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই অডিটকালীন অডিট টীমের নিকট পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ তুলে ধরা হয় না। প্রায় ইউনিট/প্রতিষ্ঠানই অনুরূপ অনুচ্ছেদসমূহকে মীমাংসিত বলে ধরে নেয় এবং পরবর্তী অডিটের সময় অডিট দলকে ঐ সকল অনুচ্ছেদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেয়ার তাগিদ অনুভব করে না। ফলে মীমাংসাযোগ্য অনেক অনুচ্ছেদ অমীমাংসিত রয়ে যায়।

ঙ. অনেক অডিট ইউনিট/প্রতিষ্ঠান প্রধানই অডিটের শেষ দিনেও স্থানীয় পরিদর্শন রিপোর্ট আলোচনায় অংশ নেন না এবং অডিট দলকে সময় দেন না। ফলে যথাযথ ব্যাখ্যা, আলোচনায় যে সকল আপত্তি মীমাংসিত হতে পারতো তাও চূড়ান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭.২.১ অডিট আপত্তি অনুসরণের সময় করণীয় (Action during follow up of Audit):

ক. লক্ষা করা গিয়েছে যে, অডিট ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের সাধারণ প্রবণতা হলো পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর আপত্তিভিত্তিক যথাযথ পরীক্ষা এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব করা। ব্রডশীট জবাব সময়মত ও সঠিকভাবে দেয়া হয় না । ফলে অডিট আপত্তি অমীমাংসিত থেকে যায় ।

খ. ব্রডশীট জবাবে অনেক অনুচ্ছেদেরই জবাব দেয়া হয় না । প্রায় ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত জবাব অডিট আপত্তির বিষয়বস্তুর সাথে মিলে না অথবা অস্পষ্ট, অবোধগম্য হয় । ফলে বিষয়টির উপর অযথা যোগাযোগ বাড়ে কোন ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না ।

গ. সমুদয় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হয়েছে মর্মে কোন কোন সময় জবাব দেয়া হয় । কিন্ত ইহার স্বপক্ষে কোন তথ্যাদি ডকুমেন্টস সংযোজন করা হয় না । ফলে ঐ সকল আপত্তি মীমাংসা করা সম্ভব হয় না ।

ঘ. অগ্রিম অনুচ্ছেদ ও খসড়া অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ব্যতীতই অনেক ক্ষেত্রে অডিট অফিসে প্রেরিত হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব পুনঃপর্যালোচনা না করেই প্রদত্ত জবাবের সাথে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একমত পোষণ করা হয় । কোন কোন সময় লক্ষ্য করা যায় যে, এক বৎসর বা এরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও উত্থাপিত আপত্তির উপর পূর্ব প্রদত্ত জবাবের পুনরাবৃত্তি করা হয়, পরবর্তী অগ্রগতি সংযোজন করা হয় না । অনেক সময় কোন কোন প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয়/আঞ্চলিক অডিট অফিস হালনাগাদ জবাব সংযোজন করে পেশের নির্দেশ দিলেও বাস্তবে পূর্বে প্রদত্ত জবাব অপরিবর্তিত অবস্থায় অডিটে পেশ করা হয় । ফলে আপত্তি মীমাংসা ত্বরান্বিত হয় না ।

ঙ. তহবিল তছরুপ, জালিয়াতি সংক্রান্ত আপত্তিগুলোর উপর বিভাগীয় কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয় । কোর্ট কেইসের বিষয়গুলো দীর্ঘকাল অনিষ্পন্ন থাকে । কোন কোন অডিট আপত্তির অংশ যথাযথ তদন্ত রিপোর্ট বাতিরেকে অবলোপন করা হয় যা অডিটের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না । ফলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বাধাগ্রস্থ হয় ।

চ. গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অগ্রিম অনুচ্ছেদ, খসড়া অনুচ্ছেদের বিষয়ে যথাযথ তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলে জারির পর একাধিক তাগিদপত্র ইস্যু করা সত্বেও সকল আপত্তির উপর জবাব পাওয়া যায় না বা প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক হয়না । আধা-সরকারি পত্রের উপরও অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় । ফলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সম্ভব হয় না ।

ছ. প্রকৃত প্রক্ষে, অডিট ও প্রশাসন একে অন্যের পরিপূরক । অডিট প্রশাসনের সহায়ক ভূমিকা পালনকারী । আপত্তি উত্থাপনের খাতিরে আপত্তি উপস্থাপন অডিটের উদ্দেশ্য হতে পারে না, শুধু আপত্তি প্রদানের মধ্যে অডিটরের আত্মপ্রসাদ লাভ করার

কিছু নেই বরং আপত্তি নিয়মিত করা, যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে অর্থ আদায়পূর্বক আপত্তি মীমাংসা করা এবং অভিন্ন প্রকৃতির অডিট আপত্তির পুনরাবৃত্তি রোধ করার মধ্যেই অডিটের সফলতা নিহিত । অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অডিটের দুর্বলতাসমূহ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল ঃ

❍ অডিট অনুসন্ধানীপত্র (Audit query sheet) যথাসময়ে ইস্যু করা হয় না । প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অডিটের শেষ দিন সকল অবজারভেশনগুলো একসাথে ইস্যু করে জবাব চাওয়া হয় তখন জবাব প্রদানের সুযোগ থাকে না । ফলে সাধারণ প্রকৃতির অনেক অনিয়মও খসড়া পরিদর্শন রিপোর্টে স্থান পায় ।

❍ অডিট আপত্তি প্রদানকালে অডিটি প্রতিষ্ঠানের/ইউনিটের মতামত বা অবস্থার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না । অডিটি প্রতিষ্ঠানের বাস্তবতা ও উদ্দেশ্য, কাজের ধরন, প্রকৃতি ও জটিলতার বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয় না । ফলে অডিট আপত্তির জবাব প্রদানের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় ।

❍ কোন প্রতিষ্ঠানের অডিট শেষ হওয়ার সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে স্থানীয় প্ররিদর্শন রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে (head quarter) পেশের নির্দেশ থাকলেও প্রায় ক্ষেত্রেই যথাসময়ে রিপোর্ট পেশ করা হয় না ।

❍ প্রায় ক্ষেত্রেই একেবারে ব্যক্তিগত ও তুচ্ছ আপত্তি দেয়া হয় । গুণগতমানসমৃদ্ধ অডিট আপত্তির সংখ্যা কাদাচিৎ থাকে । ফলে অডিটিগণের অডিট আপত্তির জবাব প্রদানের উৎসাহ বোধ হয় না ।

❍ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর উপর প্রদত্ত অডিট আপত্তিগুলোতে বিধি ও নির্দেশের লংঘন তুলে ধরা হয়। কিন্ত প্রায় ক্ষেত্রেই সমস্যা উত্তরণের কোন পরামর্শমূলক বক্তব্য থাকে না এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনা থাকে না । গুরুতর অনিয়মগুলোকে অডিট শেষ হওয়ার পূর্বে সকল প্রমাণক দলিলপত্রাদিসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয় না ।

❍ সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরগুলোতে স্থানীয় পরিদর্শন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর প্রায় ক্ষেত্রেই অনধিক দুই সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট ইস্যু করা হয় না ।রিপোর্ট ইস্যুতে বিলম্বের কারণে জবাব প্রাপ্তিতেও বিলম্ব ঘটে ।

❍ অডিট প্রতিষ্ঠান থেকে জবাব প্রাপ্তির পর প্রায় ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত জবাব যথাযথভাবে ও যথাসময়ে পরীক্ষা করা হয় না এবং অডিট প্রতিষ্ঠানের পুনমন্তব্যের জন্য প্রেরণ করা হয় না । অনেক সময় অগ্রিম অনুচ্ছেদ ও খসড়া অনুচ্ছেদের উপর প্রাপ্ত জবাবও যথেষ্ট মনযোগ ও গুরুত্বসহকারে পরীক্ষা করা হয় না ।

❍ অগ্রিম অনুচ্ছেদসমূহ রিপোর্ট ইস্যুর পূর্বে তা নয়ই বরং রিপোর্ট ইস্যুর বহু পরে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নজরে নেয়া হয় । এ সকল অনুচ্ছেদের যথাযথ পরীক্ষা ও

পর্যালোচনা করা হয় না এবং কোন কোন সময় প্রয়োজনীয় ক্রোড়পত্র অনুচ্ছেদের সাথে সংযুক্ত করা হয় না।

❍ হিসাবের উপর প্রদত্ত মন্তব্য সম্বলিত বিষয়গুলো অনেক অডিট অধিদপ্তর থেকেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের মন্তব্যের/মতামতের জন্য সময়মত প্রেরিত হয় না এবং নিয়মিত তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় না।

৭.৩ দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা (Bilateral/Tripartite Meeting)

দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভায় সুপারিশকৃত অনুচ্ছেদ পরবর্তিতে মীমাংসিত না হলে অডিটের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেছে তা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকে। বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে, সভায় সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি প্রধান কার্যালয় হতে মীমাংসা করা হয় না। অধিকন্তু সভার কার্যবিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রাপ্তির পর অডিট আপত্তি মীমাংসার চূড়ান্ত ফলাফল অবহিত করণেও কালক্ষেপণ হয়ে থাকে। ফলে অডিট সভার কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

৮.০ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সমস্যা সমাধানের উপায়

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ব্যয় নির্বাহকারী কর্তৃপক্ষের বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ব্যয়ের রীতি নীতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে আপত্তিই কম উত্থাপন হয়। নচেৎ একদিকে পুঞ্জীভূত আপত্তি মীমাংসিত হতে থাকলেও অন্যদিকে নতুন আপত্তি বাড়তে থাকে। এ দৃষ্টিকোণের বিচারে অডিট আপত্তি মীমাংসায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেঃ

১. অডিটকে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা, মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো, অডিটের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উপলব্ধি থাকা;

২. অডিটকালীন অডিটের চাহিদা মোতাবেক সকল প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা, বাস্তব যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ডপত্র দেখানো এবং অডিটকে সময় দেয়া;

৩. অডিট আপত্তি অনুসরণের সময় সযত্ন প্রয়াস নেয়া, যাতে উত্থাপিত আপত্তির উপর দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

৪. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দক্ষ ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রেখে চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার দিকগুলোকে বিশেষ বিবেচনায় নেয়া;

৫. দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সভাগুলোকে অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ প্রতিনিধি সভায় প্রেরণ এবং সভায় গৃহীত সুপারিশের ত্বরিত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা;

৬. বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ এবং উপযুক্ত দক্ষ জনশক্তির সমাবেশ ঘটানো এবং তাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা যেতে পারে;

৭. প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল সমন্বয়ে অডিট সেল প্রতিষ্ঠা করা যাতে গুরুতর আর্থিক অনিয়মগুলোর যথাযথ ও সময়মত জবাব প্রদান করা যায় এবং অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়;

৮. অডিট আপত্তির জবাব নিখুঁত এবং আপত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তার প্রতি সচেষ্ট হওয়া । জবাবের সাথে সকল তথ্য, বিধি, ডকুমেন্টস সংযোজন করা । মনে রাখতে হবে যে, সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তি মীমাংসা এডহক ব্যবস্থা, স্থায়ী ব্যবস্থা হলো জবাবের মাধ্যমে আপত্তি মীমাংসা করা;

৯. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব করা ও আপত্তি নিষ্পত্তিতে গাফিলতির জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।

৯.০ অডিটের দায়িত্ব

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অডিটের দায়িত্বও অপরিসীম । আপাতঃ দৃষ্টিতে অডিটের দৃষ্টিকোণ থেকে অডিট রিপোর্ট প্রণয়নই চূড়ান্ত বিবেচিত হলেও প্রণীত রিপোর্ট সমাদৃত না হলে অডিট স্পৃহা হারাতে বাধ্য । এ আঙ্গিকে অডিটের দায়িত্ব নিম্নরূপ হতে পারেঃ

১. অডিট রিপোর্টে আবশ্যকভাবে অডিটি-এর মতামত এবং অবস্থা প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং অডিট রিপোর্ট নির্ভুল পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত ।

২. অডিটে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংসগুলো সময়মত যথাযথ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা যাতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় ।

৩. অডিট আপত্তির উপর প্রাপ্ত জবাব যত্নের সাথে পরীক্ষা করা এবং সঠিক পুনঃজবাব যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সমীপে দ্রুত তুলে ধরা ।

৪. যে কোন রেকর্ড, দলিলাদি অডিটের পরীক্ষা করার এখতিয়ার থাকলেও অডিটকালীন বিভিন্ন নথিপত্র এমনভাবে রিকুইজিশন দেয়া উচিৎ যাতে অডিট প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজ বিঘ্নিত বা বিলম্বিত না হয় ।

৫. বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত গুরুতর আপত্তিগুলো বিশেষ টীম গঠন করে তাৎক্ষণিক যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেয়া এবং অন্যান্য অনুরূপ বাস্তব যাচাই স্বাভাবিক অডিটের কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া যায়।

৬. দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করা এবং সভায় গৃহীত সুপারিশ কার্যকর করার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত ।

৭. একেবারে ব্যক্তিগত, তুচ্ছ ও টেকনিক্যাল প্রকৃতির আপত্তির বিষয়ে সময় ব্যয় না করে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি প্রদানের প্রতি সতর্ক থাকা এবং সমস্যা সমাধানের সুপারিশ প্রদান করা ।

৮. কোন প্রতিষ্ঠানের অপরিবর্তিত অডিট আপত্তিগুলো স্থানীয় পরিদর্শন রিপোর্টের প্রথম অংশে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া।

৯. সর্বোচ্চ পেশাগত মান অর্জন এবং তা কাজে লাগানোর প্রতি আগ্রহী হওয়া, অডিট রিপোর্ট হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নেয়া এবং অডিটরের মানসিকতার পরিবর্তন আনা যাতে অনিয়ম উদঘাটনের চেয়ে ভবিষ্যত অনিয়ম প্রতিরোধে অডিটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়।

১০.০ উপসংহার

আপাততঃ বিচারে অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন অডিটরের কাজের চূড়ান্ত পর্ব মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে অডিটের ফলাফলের ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি অধীর আগ্রহান্বিত হয়ে পরবর্তিতে আরও উন্নততর গুণগতমান সম্পন্ন অডিট রিপোর্ট প্রণয়নের প্রয়াসের ধারণায় এটা শুরু মাত্র। অডিট কতটুকু কার্যকর হবে তা যেমন নির্ভর করে অডিটের গুণগতমান কি, তেমনি অডিট কেমন সমাদৃত হচ্ছে তার উপরও সমভাবে নির্ভরশীল। জবাবদিহিতার প্রশ্নটি স্পর্শকাতর,উন্নয়নশীল দেশতো বটেই উন্নত বিশ্বেও অডিট অবজারভেশনের এবং অডিটের সমালোচনা করা হয়। আমাদের দেশে অডিট উপেক্ষিত হওয়ার অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা এবং ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ অন্যতম। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ সরকারের দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার হলেও এর কার্যকর বাস্তবায়ন কঠিন। এ নিবন্ধে উল্লিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো নিজেরা দূর করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার গতিশীলতা ও সত্যিকারের উন্নতি অর্জন সম্ভব এবং অডিট আপত্তি কমে আসবে বলে ধারণা করি।

অনুসৃত গ্রন্থসমূহ

১। আইন ও বিধি, আরেফিন, মোঃ শামসুল, প্রকাশক বেগম ফাতেমা ৩২৮, আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা, ১৯৯৬।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৩। জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস্ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড।

৪। রুলস্ অব বিজনেস (কার্যবিধিমালা, ১৯৭৫)।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

বাংলাদেশের বন্যা ঃ সমস্যা ও সম্ভাব্য প্রতিকার

ব্যোমকেশ তালুকদার*

Flood of Bangladesh: Problems and Probable Solutions

Abstract

Almost every year Bangladesh face flood. Causes of flood in Bangladesh are different and their types are also different. The country has been experiencing four types of floods since the historic past. Floods caused extensive damage to public facilities, agriculture, property, loss of human and animal lives, damage roads, bridge, culverts, homestead, disrupted of social and economical activities and break down of essential services. Flood leaves considerable impact on the country's economy and society. Different measures have been taken to manage the floods, but they are not working effectively. The paper argues that the floods have to be managed both structurally and non-structurally and in a eco-friendly way.

ভূমিকা

বাংলাদেশ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি সমতল ব-দ্বীপ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র এবং কর্ণফুলীর মত বিশাল নদ-নদী ও তাদের শাখা প্রশাখা দ্বারা এই ভূখন্ড খন্ডিত হয়েছে । তাই বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল যার অধিকাংশই নদীর পলি গঠিত সমভূমি । এদেশের ভূমির উচ্চতা সমুদ্রের গড় উচ্চতা থেকে উপকূলে ৩ মিটার এবং সর্ব উত্তরের পঞ্চগড়, তেতুলিয়ায় ৬০ মিটার । উপকূলে এবং নদী তীরবর্তী একটা এলাকা ভরা জোয়ারে (পুর্ণিমা-অমাবস্যা) এমনিতেই প্লাবিত হয় । দেশের ৬৫% জমিই গড় সমুদ্র পৃষ্ঠের ৭.৫ মিটার উচ্চতার নীচে এবং ২৫০০ বর্গ কিলোমিটার হাওর বিল । বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর এবং দেশের মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদনের (জিডিপি) ৫০% কৃষিখাত থেকে আসে । এদেশের ৯.৬ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ধানের চাষ হয় । অবশিষ্ট অংশে মৎস্য চাষ, পশুচারণ ও বনাঞ্চল অবস্থিত । প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশ আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও দেশ। অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন পূর্বে ছিল বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আশা করা যায়। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকে পিছিয়ে দিয়েছে এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ । অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশে অনিয়মিতভাবে হলেও বন্যা যেন এদেশের একটি নিয়মিত দুর্যোগে পরিণত হয়েছে । তাই বন্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা, গবেষণা, নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ইত্যাদি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে । ২০০০ সালে

* মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলা বিশেষ করে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরার মানুষ নিদারুন দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়। অকস্মাৎ বন্যার ফলে দেশের খুলনা বন্দর বেনাপোল স্থল বন্দর বন্যার কারণে অচল ছিল বেশ কয়েকদিন । বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল ১৯৫৪,১৯৮৫, ১৯৮৮, এবং ১৯৯৮ সালে । ১৯৯৮ সালের বন্যার ভয়াবহতা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায় এ দেশের বন্যার ইতিহাসে। ১৯৯৮ সালের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় । ১৯৯৮ সালের বন্যার সময় দেখা গেছে যে, পানি সহজে নামছে না । ফলে ফসলহানি ও জনগণের দুর্ভোগ হয় সবচেয়ে বেশী । কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয় । আর এজন্যই বন্যার নামে দেশের লোক আঁতকে ওঠে । বাংলাদেশের অদ্ভুত ভৌগলিক অবস্থানের জন্য হিমালয় পর্বতমালার বরফগলা এবং অববাহিকা অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের কোটি কোটি কিউসেক পানি প্রতি সেকেন্ডে অসীম ধারায় বিভিন্ন নদ-নদীর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে । যার ফলে প্রতিবছর বাংলাদেশের উপর দিয়ে নেমে আসে বন্যা । অর্থাৎ বন্যা একটা সাংবৎসরিক ঘটনা ।

বন্যার সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বন্যা হচ্ছে নদীর পানি আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যখন নদীর দুকূল প্লাবিত করে প্রবাহিত হয় । আমাদের দেশে বন্যার সংজ্ঞা ভিন্ন । এখানে পানি বাড়ে বর্ষাকালে । তখন নদীর দুকূল ছাপিয়ে পানি দুপাশের ভূমিতে ঢুকলেই আমরা বন্যা বলিনা, একে আমরা বর্ষার পানি বলি । তবে বর্ষার পানি যদি মানুষের শস্য বাড়ী ঘর, রাস্তা ঘাট অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে কিছু ধ্বংস করে তখন আমরা তাকে বন্যা বলি । বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বন্যার সঙ্গে শস্যের একটি সম্পর্ক আছে । সাধারণ বন্যার পানিতে এদেশের লোকজন অ্যাডজাষ্ট করতে পারে । একটি পর্যায়ে মানুষ যখন বন্যার পানির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনা তখন তাকে আমরা বন্যা বলি । আমাদের দেশে এ পর্যায় নির্ভর করে শস্যের ক্ষয়ক্ষতির উপর । যেমন কোন স্থানে এক ফুট পাট গাছ আছে কিন্তু পানি বেড়ে তিন ফুট হলে পাট গাছ নষ্ট হবে । তখন আমরা বন্যা বলি সেই পানিকে, আবার পাঁচ ফুট পাটগাছ আর পানি জমেছে চার ফুট এবং পাট গাছ নষ্ট হয়নি তা হলে আমরা সেই পানিকে বন্যা বলিনা । এ ছাড়া বাংলাদেশে অনেক নিম্নাঞ্চল আছে যেখানে বন্যার পানি না জমলে বাংলাদেশের জন্য সেটা এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতো (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ১৯৯৫) ।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয় আবহাওয়া মন্ডলীর দেশ । দেশটির পূর্ব অঞ্চলে কিছু ছোটখাট পাহাড় ব্যতীত সমস্ত এলাকাই নীচু সমভূমি যা নদীর পলি দ্বারা গঠিত । বাংলাদেশের অবস্থান ২১° থেকে ২৬° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° থেকে ৯৩° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে যার আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (মাধ্যমিক ভূগোল, ২০০২) । কিন্তু এই দেশের মধ্য দিয়ে এদেশের আয়তনের ১৪

গুণ বেশী এলাকার অর্থাৎ প্রায় ২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার এলাকার পানি নিস্কাশিত হয় । হিমালয়বেষ্টিত এই এলাকা ২৩° থেকে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৮° থেকে ৯৮° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত । এই বিশাল এলাকার মধ্যে আছে চীন, নেপাল, ভুটান ও ভারত । নীচে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো:-

ক) বাংলাদেশের উৎপত্তি ও গঠন এমন যে এটি তিন দিক উচ্চ ভূমিবেষ্টিত সমুদ্রের দিকে মুখ খোলা একটি গামলা-রূপ নিম্ন প্লাবন ভূমি।

খ) বাংলাদেশে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নামক পৃথিবীর অন্যতম দুটি বৃহৎ নদীর মিলন হয়েছে । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেঘনা, যার অববাহিকা পৃথিবীর অন্যতম বৃষ্টিবহুল অঞ্চল ।

গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য । এই পানিও নদী প্রবাহের সঙ্গে যোগ হয় ।

ঘ) এই তিনটি নদীর মোট অববাহিকা অঞ্চলের আয়তনের আনুমানিক শতকরা ৭.৫ ভাগ মাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত । অন্যকথায়, এই বিশাল জলরাশিকে গ্রহণ করা ছাড়া বাংলাদেশের গত্যন্তর নেই ।

ঙ) নদীর শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের অবস্হানের কারণে নদীর ঢাল অত্যন্ত কম, প্রতি মাইলে প্রায় ৫ ইঞ্চি মাত্র । ফলে পানি দ্রুত নেমে যেতে পারে না ।

চ) তিনটি বিশাল জলধারা একটি সামগ্রিক নদী ব্যবস্হা সৃষ্টি করেছে । ফলে এর যে কোন এক অংশের প্রভাব অন্যান্য সকল অংশেই কম-বেশি প্রতিফলিত হয় ।

ছ) অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলগুলো বর্ষাকালের অতিরিক্ত পানির জলাধার হিসেবে কাজ না করলে অন্যান্য অঞ্চলে প্লাবন গভীরতা আরও বেশী হতো ।

জ) বাৎসরিক প্লাবন বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্হান ও ভূগঠনের কারণে স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা । একই যুক্তিতে বন্যাও অবশ্যম্ভাবী । কারণ, যে সকল প্রাকৃতিক কারণে জুন থেকে অক্টোবরের প্লাবন হয়, মূলতঃ সেই সকল প্রাকৃতিক কারণে স্হান কাল ভেদে বিভিন্নতার ফলে বন্যা হয়ে থাকে । (আলম. এবং শামসুদ্দীন - ১৯৮৮)

বাংলাদেশের নদীর তথ্য

বাংলাদেশের প্রবহমান জলধারায় পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার নাম সবচেয়ে আগে আসে । হিমালয়সহ উচ্চভূমি থেকে প্রবাহিত জলরাশি আমাদের এই ব-দ্বীপের পানি সম্পদের অন্যতম পরিচায়ক । পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, গোমতী, সুরমা, কর্ণফুলীর মতো নদীগুলো আমাদের দেশের পানি সম্পদের প্রধান সূত্র হিসেবে চিহ্নিত । এই সব নদী বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে আছে । প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে এসব নদী অঞ্চল ভেদে নিজেদের গতিপথকে

করেছে সম্প্রসারিত । ১৩,৬০০কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জায়গা নিয়ে এদের অস্তিত্ব। মৌসুমী ঋতুতে এসব নদীর জলাংশের পরিমাণ ৮৪০০ কিলোমিটার (প্রায় ৫২৫০ মাইল) শুস্ক মৌসুমে কমে গিয়েও দাঁড়ায় ৫১৯২ কিলোমিটার (প্রায় ৩২৪৫ মাইল)। প্রধান প্রধান নদীগুলো থেকে শাখা নদী ও উপনদীর জন্ম । জালের মতো নদীবেষ্টিত আমাদের এই জন্মভূমি । শাখা নদী ও উপনদীর সংখ্যা ২২৫টি । যার মধ্যে ১০৮ টি উপনদী এবং ১১৭টি শাখা নদী । বাংলাদেশের বৃহত্তর বিভাগগুলোর অঞ্চলভিত্তিক নদী, শাখানদী ও উপনদীর অবস্থান সারণী-১ এ দেখানো হলো ঃ-

সারণী - ১
অঞ্চলভিত্তিক নদী, শাখানদী ও উপনদীর অবস্থান

বিভাগের নাম	শাখা নদীর সংখ্যা	উপ নদীর সংখ্যা	মোট
ঢাকা	১৮	২০	৪২
চট্টগ্রাম	২৭	১২	৪৯
রাজশাহী	১৪	৩২	৪৬
খুলনা	৫৮	২০	৭৮

উৎস ঃ সচিত্র বাংলাদেশ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১১

এসব নদীর জলপ্রবাহ দ্বারা নদী অববাহিকায় প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয় । মোটামুটিভাবে ১৩,৬০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এক বিস্তৃত এলাকা নিয়ে এই অববাহিকা গঠিত । যার সুফল ভোগ করে গোটা দেশ । নিম্নে সারণী-২ ও সারণী-৩ এ বাংলাদেশের প্রধান ৩টি নদীর তথ্য সমূহ এবং অভ্যন্তরীণ জলাধার সমূহের পরিসংখ্যান দেওয়া হলো ঃ-

সারণী - ২
বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীর তথ্য সমূহ

নদীর নাম	দৈর্ঘ্য	অতিক্রমকারী দেশ	পানি প্রবাহের মাত্রা	মোট অববাহিকার আয়তন	বাংলাদেশে অববাহিকার আয়তন
ব্রহ্মপুত্র	২৯০০ কিঃমি	চীন, ভারত, বাংলাদেশ	৫২৭ মিটার টন	৮৯৬০০০ বর্গ কিঃ মিঃ	৫১২০ বর্গ কিঃ মিঃ
গঙ্গা-পদ্মা	১৫০০ কিঃমি	চীন, নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ	৫৭,০০০ ঘন মিটার/সেকেন্ড	৫২৯,৯২০ বর্গ কিঃ মিঃ	২৫,৬০ বর্গ কিঃ মিঃ
মেঘনা	৯৫৬ কিঃ মিঃ	ভারত, বার্মা, বাংলাদেশ	৭,১০৯ ঘন মিটার /সেকেন্ড	২৫,৬০ বর্গ কিঃ মিঃ	২৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ

উৎস ঃ সচিত্র বাংলাদেশ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৫ ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা

সারণী - ৩
অভ্যন্তরীণ জলাঞ্চলের ধরন, পরিমাণ এবং শতকরা হার

উৎসের ধরন	জলাঞ্চল (হেক্টর)	মোট পরিমাণের % হার
স্থানীয় জলাঞ্চল	১৫.৮২.২০.৭৩	১০০
নদী ও তার শাখা	৯৩৮৭৫৩	৬০
নদীর মোহনা	১৮২৯৯৬	১১
হাওর-বাঁওর, বিল অশ্ব ক্ষুরাকৃতি হ্রদ	২,৯৩,১১৭	১৮
পুকুর ও দিঘি	৭৫৫১৮	৫
কর্ণফুলী কাপ্তাই হ্রদ	৯০৬৮৮	৬
জলমগ্ন ধানক্ষেত	২৮৩৪০০৮	--

উৎস ঃ সচিত্র বাংলাদেশ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৬

বৎসরে বাংলাদেশে বাহাদুরাবাদে ব্রহ্মপুত্রের গড়প্রবাহ ৭১,০০০ হাজার ঘনমিটার/সেকেন্ড ও সর্বোচ্চ ৮৪,০০০ ঘনমিটার/সেকেন্ড পানি । হার্ডিঞ্জ ব্রীজে পদ্মার বাৎসরিক গড়প্রবাহ ৫৭,০০০ ঘনমিটার/সেকেন্ড এবং সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ ঘনমিটার/সেকেন্ড । ১৯৯৮ সনে এই পয়েন্টে পদ্মা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৫ মিটার উঁচুতে অর্থাৎ বিপদসীমার ৯০ সেন্টিমিটার উঁচু দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্বের সকল রেকর্ড ভংগ করেছে । ভৈরব-আশুগঞ্জে মেঘনার গড় প্রবাহ ৭,১০৯ ঘনমিটার/ সেকেন্ড যা ১৯৮৮ সনে সর্বোচ্চ প্রবাহ দাঁড়িয়েছিল ১৯,৮০০ ঘনমিটার/সেকেন্ড । এখন এই তিন নদী একত্রে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেলে বাংলাদেশ পবে প্রতি সেকেন্ডে ৮৪,০০০ + ৭৫,০০০ +১৯,৮০০ = ১,৭৮,৮০০ ঘন মিটার পানি । অর্থাৎ ১ দিনে ১,৭৮,৮০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ = ১৫৪৫ কোটি ঘন মিটার পানি এবং ১০ দিনে ১৫,৪৫০ কোটি ঘনমিটার পানি যা সমস্ত দেশকে ১মিটার ঢেকে দিতে পারে, যদি সমুদ্রে এই বিশাল পরিমাণ পানি নিস্কাশিত না হয় । এর পর আরো ছোট বড় ৫২ টি সীমান্ত নদী আছে । আরো আছে বৎসরে গড়ে ১৯০০ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত । এর সাথে বরফগলা পানি নিয়ে বৎসরে প্রায় ৭,৭৫০ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি বাংলাদেশে প্রবেশ করে (হাসন মনজুর, ২০০০) ।

বন্যার কারণ

আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞগণ বন্যার কারণসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকা, সেমিনার কারিগরি প্রবন্ধে তাদের বিভিন্ন মতামত থেকে দেখা যায় বন্যা দুটি কারণে হয়ে থাকে । প্রাকৃতিক কারণ ও কৃত্রিম কারণ । নিম্নে কারণসমূহের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ-

প্রাকৃতিক কারণ

১। বাংলাদেশ গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং মেঘনা এই তিনটি নদীর মিলন স্হলে অবস্হিত । এটি একটি নদী গঠিত প্লাবন সমভূমি, সুদূর অতীত থেকেই এই প্লাবন সমভূমিতে পলি সঞ্চয়নের সাথে সাথে পলির পুনবন্টনের

প্রয়োজনে প্লাবন সৃষ্টি হয় । সুতরাং বাংলাদেশে প্লাবন/বন্যা একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ।

২। সমুদ্র সমতল থেকে বাংলাদেশের গড় উচ্চতা ৬-৭ মিটার। অন্যান্য এলাকা প্রায় সমতল । যার ফলে নদীর ঢাল অত্যন্ত কম এবং বর্ষাকালে নদীর অতিরিক্ত পানি দ্রুত সমুদ্রে নিস্কাশিত হতে পারে না এর ফলে সহজেই নদী অববাহিকায় প্লাবন দেখা যায়।

৩। বঙ্গ অববাহিকার নদী সমূহের একই সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহে উপনীত হওয়াও বন্যার অন্য আরেকটি কারণ (Ministry of Agriculture, 1987, BWDB Report, 1987 and UNDP Report, 1985) । সাধারণতঃ গঙ্গার পানি যে সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহে উপনীত হয় যমুনার পানি তারপর সর্বোচ্চ প্রবাহে উপনীত হয়। কিন্ত যে বর্ষায় গঙ্গা ও যমুনার প্রবাহ একই সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহে উপনীত হয় তখন পুনরায় নিস্কাশন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। ফলে কেন্দ্রীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রধান নদীগুলোতে যখন উচ্চ প্রবাহ আসে তখন উপনদীগুলোর প্রবাহ সহজ ও দ্রুততার সাথে মূল নদী দ্বারা নিস্কাশিত হতে না পেরে স্হানীয়ভাবে বন্যার সৃষ্টি করে (আলম. এবং শামসুদ্দীন - ১৯৮৮, বাংলাদেশের বন্যা, কারণ ও এর সঙ্গে সহাবস্হানের উপায় ভূগোল পত্রিকা ৭ঃ৫- ১৬) ।

৪। গঙ্গা পদ্মা ব্রক্ষপুত্র যমুনা এবং মেঘনা এই তিনটি আন্তর্জাতিক নদী অববাহিকা অঞ্চলে প্রবল বর্ষণ হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বর্ষণ এলাকা মেঘনা অববাহিকায় অবস্হিত ।

৫। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের ৮০% হয়ে থাকে । বাংলাদেশের বাইরে এবং দেশের অভ্যন্তরে স্বল্প সময়ের মধ্যে এই ধরনের উচ্চ মৌসুমী বৃষ্টিপাত এ দেশের বন্যার একটি বিশেষ কারণ। দেশের বাইরে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে তা প্রধান নদী ও উপনদীগুলোর মাধ্যমে দ্রুত বাংলাদেশে প্রবেশ করে । একই সময়ে বাংলাদেশ অঞ্চলেও বৃষ্টিপাতের ফলে প্রধান নদী উপনদী ও শাখা নদীগুলোতে পরিপূর্ণ প্রবাহ থাকায় দেশের বাইরের অতিরিক্ত বৃষ্টিজনিত প্রবাহে বাংলাদেশের নদীগুলো দ্রুত নিস্কাশনে ব্যর্থ হয়। ফলে প্লাবন/বন্যার সৃষ্টি হয়।

৬। সিলেটের হাওর, পাবনার চলনবিল ও মাদারীপুরের বিল এ তিনটি বৃহদাকার জলাভূমি ছাড়াও মাঝারি ও ছোট আকৃতির বহু প্রাকৃতিক জলাভূমি বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী ব্যবস্হার অংশ হিসেবে সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে। এ সমস্ত জলাভূমি বড় নদীগুলোর সংরক্ষণাগার হিসেবে কাজ করে । এ সকল জলাভূমিতে ক্রমাগত প্রাকৃতিক কারণে পলি জমে পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে পানি প্রবাহের স্বল্প বৃদ্ধিতেই স্হানীয়ভাবে বন্যা দেখা দেয়।

৭। বর্ষাকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে সাগরে পড়ে। অথচ এই সময়ে সাগর পৃষ্ঠ প্রায় ২-৩ ফুট উঁচু থাকে। ফলে নদীর পানি অন্য সময়ে যে বেগে সাগরে পতিত হয় এই সময় তা পারে না। ফলে নদী অববাহিকায় পানি ফুলে উঠে বন্যা হয়।

৮। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদীর শাখা নদীগুলো পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া বন্যার অন্য একটি কারণ। বাংলাদেশে প্রবাহিত নদীগুলো উজান থেকে প্রচুর পলি বহন করে আনে এবং ভাটিতে সেই পলি জমে নদী ভরাট হয়ে তলদেশ উঁচু হয়। ফলে পরের বছর একই পানি আসলেও বন্যা দেখা দেয়।

৯। বঙ্গোপসাগরে জোয়ার-ভাটার তীব্রতা এবং অনেক সময় দক্ষিণ-পূর্ব মৌসূমী বায়ু বন্যার অন্য একটি কারণ।

খ) কৃত্রিম কারণ

১। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও পরিবেশের উপর মানুষের নানারূপ হস্তক্ষেপের কারণেও প্লাবন/বন্যা হতে পারে। গুরুত্বের দিক থেকে অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহের চাইতে এ সকল কারণ অধিক বিবেচনার যোগ্য। নদীর অববাহিকায় ব্যাপক বাঁধ ও বেড়ি বাঁধ নির্মাণ, এবং প্লাবন/বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্পের নামে বহুমুখী কৃত্রিম পানি সংরক্ষণাধার তৈরি বন্যা সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। নদী ব্যবস্থায় এ সমস্ত মনুষ্য নির্মিত নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ড নদীর স্বাভাবিক কার্য প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আরো পরিস্কারভাবে বললে প্রধান নদী, উপনদী ও শাখা নদীসমূহ মিলে একটি সম্পূর্ণ সমন্বিত নদী ব্যবস্হা হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। উপনদীর কাজ প্রধান নদীতে পানি সরবরাহ করা, সেই পানি প্রধান নদীর নিজস্ব পানি সহ শাখা নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে নিস্কাশন করে। বেড়ি বাঁধ কিংবা নদীর পার বরাবর বাঁধের কারণে নদীর অতিরিক্ত পানি প্রবাহ নদী খাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, ফলে নদীর বয়ে আনা পলি নদী খাতে দ্রুত সঞ্চিত হয়। নদী খাত ভরাট হয়ে উপরে আসে। তাতে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাছাড়া নদী অববাহিকার নিম্নাঞ্চলগুলোতে অতিরিক্ত পানি জমা হতে না পারায় নদীতে খুব সহজেই প্লাবন/বন্যার সৃষ্টি হয়। বাঁধের কারণে স্হানীয় বৃষ্টির পানিও সহজে নদীতে নিস্কাশিত হতে পারে না, তাতে জলাবদ্ধতাজনিত প্লাবন/বন্যা সৃষ্টি হয়। গঙ্গা নদীর ভারতীয় অংশে ৩৪টিরও বেশি বৃহদাকার ও ১৭০টি মধ্যমাকৃতির সেচ প্রকল্প চালু রয়েছে এবং একইভাবে ব্রহ্মপুত্র নদীতেও কয়েক হাজার মাইলের অধিক বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ভারতীয় উজান এলাকা থেকে পানি দ্রুত বাংলাদেশের ভাটি এলাকায় নেমে আসে এবং প্রায়শ গঙ্গা ও যমুনা নদী, এদের মিলন স্হান প্রায় একই সময় সর্বোচ্চ প্রবাহে উপনীত হয়। উজান প্রাকৃতিক জলাধারগুলোতে পানি ধারণের সুযোগ থাকলে অতিরিক্ত পানি ভাটি এলাকায় ধীরে ধীরে নেমে আসত, তাতে উভয় নদীর একই

সময় সর্বোচ্চ প্রবাহে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যেতো, ফলে বন্যার প্রকোপও কম হতো।

উপরন্তু, বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও প্রায় ১৫টি প্রধান বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প ও বেশ কিছু বেড়ি বাঁধ নির্মিত হয়েছে একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব প্রকল্প মূলতঃ বাংলাদেশের ভিতরে নদী প্রবাহ এবং নিম্নাঞ্চলগুলোর পানি নিস্কাশন ও ধারণ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে সংকুচিত করছে । ভারতীয় অংশের প্রকল্পগুলোর কারণে পানি দ্রুত বাংলাদেশে নেমে আসে এবং প্রায়ই গঙ্গা-যমুনার মিলন স্থানে একই সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহে উপনীত হয়ে নিস্কাশন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অংশের প্রকল্পগুলোর কারণে একাধারে নিস্কাশন ও ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। উওরোত্তর গভীর থেকে গভীরতর বন্যা সৃষ্টির জন্য এই হচ্ছে প্রকল্পজনিত কারণ (আলম. এবং শামসুদ্দীন - ১৯৮৮ বাংলাদেশের বন্যা, কারণ ও এর সঙ্গে সহাবস্থানের উপায় **ভূগোল** পত্রিকা,৭ঃ৫-১৬।)

২। গঙ্গা ও **ব্রক্ষ্মপুত্রের** পার্বত্য ও মধ্যগতি এলাকায় নেপাল ও ভারত অংশে শিল্প কারখানায়, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ও বিশেষভাবে জ্বালানী কাঠের প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে নির্বনীকরণ চলছে। তাছাড়া এ সমস্ত এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বহু নতুন জনপদ সমতল ভূমি থেকে উচ্চ ঢালে গড়ে উঠছে। এ ধরনের জনপদের জন্য প্রয়োজনীয় চারণক্ষেত্র ও কৃষি ভূমি উচ্চ ঢালের বনভূমি পরিস্কার করেই তৈরি করা হচ্ছে। এভাবে তৈরি চারণক্ষেত্র ও কৃষি ভূমিতে প্রথম দুই তিন বৎসর উৎপাদন ভাল হলেও পরে আর তেমন উৎপাদন হয় না। কারণ, ভূমির পৃষ্ঠদেশে সঞ্চিত ফসলের জন্য পুষ্টিকর রাসায়নিক উপাদান পানির সাথে পৃষ্ঠ প্রবাহের মাধ্যমে ধুয়ে যায়। ফলে উর্বরতা ক্রমেই হ্রাস পায়। অনুর্বর জমি পরে পরিত্যক্ত হয় এবং পুনর্বার নতুন বনভূমি পরিস্কার করার প্রয়োজন হয়।

এভাবে নির্বনীকরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখা যায়। মাটির উপর বনভূমির আচ্ছাদন না থাকলে বৃষ্টির পানি মাটি ভেদ করে তলদেশে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পায় না। বৃষ্টির ফোটার আঘাতে উন্মুক্ত মাটির কণা টুকরা হয়ে মাটি কণার/শিলার অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্রগুলো বন্ধ করে দেয়, তাতে বৃষ্টির পানি মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে পৃষ্ঠপ্রবাহ দুইভাবে ক্ষতি করে। প্রথমতঃ অধিক ঢালের কারণে প্রবাহ খুবই দ্রুত নিম্ন দেশে নেমে আসে। ফলে মূল নদী তার প্রবাহের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে । দ্বিতীয়তঃ অধিক ঢাল ও উন্মুক্ত ভূমির কারণে বৃষ্টির আঘাতে যে সমস্ত মাটি কণিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় তা সহজেই পৃষ্ঠপ্রবাহের সাথে নিচে নেমে আসে। এ ভাবে বয়ে আসা পৃষ্ঠপ্রবাহে পলির পরিমাণ অধিক থাকায় নদীর স্বাভাবিক পরিবহণ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তা সহজেই নদী খাতকে ভরাট করে তোলে । ফলে, নদীতে সহজেই প্লাবন/বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার আরও কিছু তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে যেমন

- সড়ক, রেলপথ ও জনপদের অবস্থান। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও জনপদসমূহ নদী ব্যবস্থার স্বাভাবিক জল নিস্কাশনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্লাবন/বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভবতঃ ব্যয় সংকোচনের জন্য সড়ক ও রেলপথে যথেষ্ট সংখ্যক কালভার্ট ও সেতু রাখা হয় না। কখনো জীর্ণ কালভার্ট ও সেতু মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার নজির আছে। (আলম. এবং শামসুদ্দীন - ১৯৮৮। বাংলাদেশের বন্যা, কারণ ও এর সঙ্গে সহাবস্থানের উপায়, ভূগোল পত্রিকা। ৭ঃ৫- ১৬)।

১৯৫৪, ১৯৮৫, ১৯৮৭, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকারী বন্যার চিহ্নিত কারণসমূহ বর্ষ ,মাস ও সংগঠিত এলাকাসহ সারণী -৪ তে দেওয়া হলো । এতে দেখা যায়১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকারী বন্যার চিহ্নিত মূল কারণ হলো এমন একটি সময় তিনটি বৃহৎ নদীর প্রবাহ সর্বোচ্চ মাত্রায় উপনীত হয় যখন দেশের সবগুলো নদীই উচ্চ মাত্রায় প্রবাহিত ছিল এবং সেই সাথে তিনটি অববাহিকাতেই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

সারণী- ৪

১৯৫৪, ১৯৮৫, ১৯৯৭, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যার চিহ্নিত কারণসমূহ

বর্ষ	মাস	সংগঠিত এলাকা	চিহ্নিত কারণসমূহ	তথ্যের উৎস
১৯৫৪	জুলাই ও আগষ্ট	১৫,০০০ বর্গমাইল	ব্রহ্মপুত্রের ও গঙ্গা নদী একই সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহ উপনীত হয়	ক্রুপ মিশন রিপোর্ট ১৯৫৭
১৯৮৫	জুন জুলাই ও সেপ্টেম্বর	চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেট উপকূলীয় এলাকা	অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত জনিত অকস্মাত পাহাড়ী ঢলের কারণে বন্যা দেখা দেয়। উপকূলীয় এলাকায় ঘুর্ণিবাত্যার কারণ জলোচ্ছাস সৃষ্টি হয়, তাতে বন্যা দেখা দেয়।	ইউ এন ডি পি ১৯৮৮
১৯৮৭	আগষ্ট সেপ্টেম্বর	জুলাই ও আগষ্ট মাসে রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁও, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর শহর বন্যা আক্রান্ত হয়। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে চাপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী, কুষ্টিয়া রাজবাড়ী ফরিদপুর, মাইজদি ও রাজধানীর ঢাকা বন্যা প্লাবিত হয়।	স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত স্থানীয় ও উপ্পঞ্চলের বৃষ্টিপাত। মূল কারণ সমূহ নিম্নরুপঃ - অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত - একই সময়ে প্রধান নদী সমূহের সর্বোচ্চ প্রবাহে উপনীত হওয়া - একই সময়ে স্প্রীং টাইড (ভরা জোয়ার) ও উচ্চ সমুদ্র তলের সাথে সাথ বঙ্গোপোসাগরের সৃষ্টি নিম্নচাপ - অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট উন্নয়নের ফলে বাধাপ্রাপ্ত জল নিস্কাশন বাবস্থা - বন্যা প্রতিরক্ষার জন্য নির্মিত বাধসমূহ কারণ বন্যা প্রবাহ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরকরণ	**ইউ এন ডি পি**

১৯৮৮	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ফরিদপুর, ঢাকা নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, বগুড়া, কুষ্টিয়া যশোর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও নোয়াখালী জেলার ব্যাপক অংশ	১। জুলাই-আগষ্ট মাসে প্রায় একই সময় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় বৃষ্টিপাত; ২। সেপ্টেম্বরের শুরুতে মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে তিনটি নদী সর্বোচ্চ প্রবাহে উপনীত হয় । ৩। সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে যখন বন্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল, সেই সময় চন্দ্রউদয় এবং সূর্যগ্রহণ ঘটে। ফলে দেশের দক্ষিনাঞ্চলে বন্যার পানি নেমে যেতে বিলম্ব হয়।	বি ডব্লিউ ডি বি- ১৯৮৮
১৯৯৮	জুন, জুলাই ও আগষ্ট	বাংলাদেশের ৫০ টি জেলা	এবছর বন্যার জন্য বৃষ্টিপাতের আধিক্য, উজানে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ও অমাবস্যা পূর্নিমার দরূন জোয়ার - এ তিন কারণের যৌথ প্রভাবকে বিশেষজ্ঞগণ দায়ী করেছেন । আবার কেউ কেউ বঙ্গোপসাগরের ভূমিকম্প হওয়াকেও এর সাথে যুক্ত করেছেন ।	১৯৯৮ সনের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা

উৎস ঃ আলম, শা. এবং শামসুদ্দীন, দা- ১৯৮৮ । বাংলাদেশের বন্যা, কারণ ও এর সঙ্গে সহাবস্থানের উপায় । ভূগোল পত্রিকা। ৭ঃ৫-১৬ । এবং ১৯৯৮ সনের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা

বন্যার প্রকারভেদ

সময়ের বিবেচনায় বন্যাকে তিনভাগে ভাগ করা যায় । যথাঃ (১) প্রাক-বর্ষা বন্যা, (২) বর্ষার বন্যা এবং (৩) বর্ষা-পরবর্তী বন্যা । সাধারণতঃ বন্যার তীব্রতা, গভীরতা, স্থায়িত্বকাল এর বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে বন্যাকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কেউ কেউ বন্যাকে চারভাবে ভাগ করেছেন ।

ক) প্রধান নদীর বন্যা অর্থাৎ নদীর পানি উপচে গিয়ে দুই পার প্লাবিত করা বন্যা।

খ) ফ্লাশ ফ্লাড পাহাড়ের পাদদেশ অঞ্চলে পানির ঢল নামা ।

গ) জলাবদ্ধতা পানি নিস্কাশনের পথ রুদ্ধ হলে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এতে একটি এলাকা ডুবে যেতে পারে এবং তাকে বন্যা বলা যায়। এবং

ঘ) উপকূলীয় জোয়ারে নিমজ্জন (টাইডাল ফ্লাড) জলোচ্ছ্বাস ছাড়াও বর্ষা মৌসুমে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার সময় জোয়ারে এর উচ্চতা অনেক বেশি হয়। এতে উপকূল অঞ্চল ডুবে যায়। (ডঃ আইনুন নিশাত, ১৯৯৫)। কেউ কেউ আবার উৎসের উপর ভিত্তি করে বন্যাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন । বাংলাদেশের বন্যার উৎসভিত্তিক প্রকারভেদ সারণী - ৫-এ দেখানো হলো ঃ-

সারণী-৫
বাংলাদেশের বন্যার উৎসভিত্তিক প্রকারভেদ

বন্যার প্রকার	বন্যা**উপদ্রুত** অঞ্চল	সময়	বন্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য
আকস্মিক বন্য	উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের নদী সমূহ, পূর্ণভবা, করতোয়া, ধরলা, তিস্তা, সুমশ্বরী, কংস, যদুকাটা, সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, ধালিন, খোয়াই, গোমতি, মুহুরী, হালদা, সাংগু ও মাতামহুরী নদী অববাহিকা ।	এপ্রিল - সেপ্টেম্বর	উর্ধ্ব অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পাদদেশীয় অংংলে বন্যার জল মাত্র স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দ্রুত বেড়ে যায় এবং একই ভাবে ত্বরিত হ্রাস পায়। বন্যার স্থিতিকাল খুবই সংক্ষিপ্ত, মাত্র (১-৩ দিন) । এবং উচ্চ পানির বেগ থাকে ।	ফসল ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়
বৃষ্টিজনিত বন্যা	ঝড়বৃষ্টির অবস্থান ভিত্তিতে বাংলাদেশর যে কোন নিম্নাঞ্চলেই এ ধরনের বন্যা হতে পারে ।	জুন থেকে সেপ্টেম্বর	স্থানীয় নিস্কাশন ক্ষমতার অতিরিক্ত ১-১০ দিন স্থায়ী বৃষ্টিপাতের ফলে স্থানীয়ভাবে এ ধরণের বন্যা হয় । জল মাত্রার উচ্চতা মাঝামাঝি পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে । স্থানীয় বৃষ্টিপাতই বন্যার পানির প্রধান উৎস ।	স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়, ফসল, বাড়ী ও রাস্তাঘাট নিমজ্জিত হয় ।
বন্যা উপদ্রুত অঞ্চল	উপকূলীয় এলাকা ।	এপ্রিল, মে ও অক্টাবর- নভেম্বর	স্বল্পস্থায়ী প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সাথে উপকূলীয় জলোচ্ছাস দেখা যায় । বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের ফলে প্রধানত এ ধরণের বন্যা হয়	লোনাপানিতে উপকূলীয় এলাকায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় ।
প্রধান নদীসমূহ দ্বারা প্রভাবিত মৌসুমী	প্রধান তিনটি নদী ব্যবস্থার বিভিন্ন উচ্চতা সম্পন্ন প্রাবনভূমি সমূহ ।	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর	এ ধরণের বন্যার তুলনামূলকভাবে স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ হয় (১০-২৪ দিন) । বন্যার পানি ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত হয় এবং পানির মাত্রা ধীর উঠা নামা করে । বন্যার উৎস প্রধানতঃ বৃষ্টিপাত ও পার্বত্য অঞ্চলের বরফগলা পানি ।	ফসল ও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

উৎস ঃ আলম, শা. এবং শামসুদ্দীন, দা- ১৯৮৮ । বাংলাদেশের বন্যা, কারণ ও এর সঙ্গে সহাবস্থানের উপায়, ভূগোল পত্রিকা, পৃঃ৭৫-১৬ ।

বাংলাদেশের বন্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের বন্যা সংক্রান্ত প্রাচীন কোন তথ্য আমাদের প্রাচীন কাগজ পত্রে নেই । তবে বাংলাদেশের ভৌগালিক অবস্হানের জন্য যুগে যুগে এ ভূ-খন্ড যে বন্যা কবলিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় ৪০০ বছর পূর্বে ১৫৮৪-৮৫ সনে বর্তমান বরিশাল বিভাগীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যায় ২ লক্ষ লোক নিহত হয় । জনাব আবুল ফজল রচিত বিখ্যাত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই বন্যার উল্লেখ আছে ।১৬৬০ সনে কুমিল্লা-ত্রিপুরা এলাকার গোমতী নদীতে হঠাৎ বন্যায় ফসল, জনবসতি ও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তখনকার

রাজা গোমতী নদীর দুই তীরে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করেন । ১৬৬২ সালে সুবে বাংলার সুবেদার মীরজুমলার সময় ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় আসামে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় । এই বন্যার কারণে মীরজুমলা আসাম অভিযান পরিত্যাগ করে কুচবিহার চলে আসেন । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আমলে ১৭৬৯-৭০ সনে প্রথম খরা ও পরে বন্যায় বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ নিহত হয় । এই সময়কে বাংলা সনের হিসেবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে । ১৭৮৪ সনে সিলেট ও ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘনা অববাহিকায় হঠাৎ বন্যা দেখা দেয় । ১৭৮৭ সনে বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয় । এতে উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয় । তিস্তা ও আত্রাই নদী তাদের দক্ষিণমুখী গতিপথ পরিবর্তন করে যমুনায় মিলিত হয় । ১৮০০ শতাব্দীতেও বাংলাদেশে অনেক বন্যার রেকর্ড রয়েছে । ১৮২২ সালে নোয়াখালী ও বরিশাল অঞ্চলে এক ভয়াবহ বন্যা হয়। ঐ বন্যায় প্রায় ৬ মিটারের উপর পানি উঠেছিল । এতে প্রায় ৭৪ হাজার লোক বন্যার পানিতে এবং ৫০ হাজার লোক কলেরায় মারা যায় । এ ছাড়াও ১৮৪২, ১৮৫৮ ও ১৮৭১ সালে ভয়াবহ বন্যা হয়। ১৯২২ সনে অধ্যাপক মহলানবীশ নামক আবহাওয়াবীদদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঐ বৎসর সমস্ত রাজশাহী বিভাগ জুড়ে ব্যাপক বন্যা হয়েছিল । ঐ রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায়, ১৮৭০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রতি ২ বৎসরে ১বার ছোট আকারের বন্যা এবং প্রতি ৬-৭ বৎসরে একটা বড় বন্যা হয়েছিল (হাসন মনজুর, ২০০০)। এরপর ১৯৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৬৩, ৬৮, ৬৩, ৬৮, ৭০,৭১, ৭৪, ৮৪, ৮৭, ৮৮ এবং ১৯৯৮ সন যে বড় মাপের বন্যা হয় তাতে দেখা যাচ্ছে বন্যা আক্রান্ত এলাকা ৩৬,০০০ বর্গকিলোমিটার হতে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । এর মধ্যে ১৯৫৪, ৭৭, ৮৭ ৮৮ এবং ৯৮ এর বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । বাংলাদেশে বিভিন্ন বৎসর যে পরিমাণ জমি বন্যাক্রান্ত হয়েছে তা সারণী-৬ এ দেখানো হলো ।

সারণী-৬
বন্যাক্রান্ত জমির পরিমাণ

বৎসর	প্লাবিত এলাকা (বর্গকিলোমিটার)	বৎসর	প্লাবিত এলাকা (বর্গকিলামিটার)
১৯৫৪	৩৬,৭৮০	১৯৭০	৪২,৪৮০
১৯৫৫	৩৮,৮৫০	১৯৭১	৩৬,৩৪০
১৯৫৬	৩৫,৮৪০	১৯৭৪	৫২,৫২০
১৯৬২	৩৭,৩০০	১৯৮৪	২৮,২১০
১৯৬৩	৩৫,২৩০	১৯৮৭	৫৭,২৭০
১৯৬৩	৩৭,৩০০	১৯৮৮	৭৭,৭০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৯৫৪ সনের বন্যায় ১১টি প্রধান নদী বিপদসীমা অতিক্রম করেছিল । কিন্তু ১৯৮৮ সনের বন্যায় ৩০টি নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং ১৯৯৮ সনের বন্যায় প্রায় সব নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় । ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বন্যা কবলিত এলাকার আয়তন ও ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান সারণী -৭ এ দেওয়া হলো ।

সারণী-৭

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বন্যা কবলিত এলাকার আয়তন ও ক্ষয়ক্ষতির সামগ্রিক খতিয়ান

বছর	বন্যা কবলিত এলাকা (কর্গ কিঃ মিঃ)	মোট আয়তনের শতকরা হার	ফসলের ক্ষতির পরিমাণ	মানুষের মৃত্যু (জনে)/ ক্ষতিগ্রস্থ (মিলিয়নে)	ঘর বাড়ী সম্পূর্ণ নষ্ট	গবাদি পশুর মৃত্যু	মোট ক্ষতি (মিলিয়ন টাকায়)
১৯৫৪	৩৬,৯২০	২৫.৬৪	১০.২৩ মিলিয়ন একর	–	–	–	১,৫০০
১৯৫৫	৫০,৭০০	৩৫.২১	–	–		–	–
১৯৫৬	৩৫,৬২০	২৪.৭৪	১০.৬৮ মিলিয়ন একর	–		–	১,৫৮০
১৯৬০	২৮,৬০০	১৯.৭৬	–	–		–	–
১৯৬১	২৮,৮৬০	২০.০৪	–	–		–	–
১৯৬২	৩৭,৪৪০	২৬.০০	১০.৬৮ মিলিয়ন একর				১,৫০০
১৯৬৩	৪৩,১৬০	২৯.৯৭	–	–		–	–
১৯৬৪	৩১,২০০	২১.৬৭	–	–		–	–
১৯৬৫	২৮,৬০০	১৯.৮৬	–	–		–	–
১৯৬৬	৩৩,৫৪০	২৩.২৯	–	–		–	৬০০
১৯৬৭	২৫,৭৪০	১৭.৮৬	১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন খাদ্য শষ্য	–		–	–
১৯৬৮	৩৭,৪৪০	২৬.০০	৯ লক্ষ ৮৪ হাজার টন	–	১,০৭০০০		১,২০০
১৯৬৯	৪১,৬০০	২৮.৮৯	–	–	–	–	১,১০০
১৯৭০	৪২,৬৪০	২৯.৬১	–	–	–	–	১,০০০
১৯৭১	৩৬,৪৭৫	২৫.৩৩	১২ লক্ষ টন	১২০	২১৯,০০০	২,০০০	–
১৯৭২	২০,৮০০	১৪.৪৪	৩ লক্ষ টন	৭৭	৯৪,০০০	২,৫০০	–
১৯৭৩	২৯,৯০০	২০.৭৬	১৬ লক্ষ টন	৩৮	৪৮,০০০	৭৮৩	–
১৯৭৪	৫২,৭২০	৩৬.৬১	২০ লক্ষ টন	১৯৮৭/৩০	৬,১৫,০০০	৪৬,০০০	২০,০০০
১৯৭৫	১৬,৫৯০	১১.৫২	৪ লক্ষ টন	১৫	১০,০০০	৫১০	–
১৯৭৬	২৮,৪১৮	১৯.৭৩	৯ লক্ষ টন	৫৪	১৫,০০০	৩,০৬৬	–
১৯৭৭	১২,৫৪৮	৮.৭১	১ লক্ষ টন	–	–	–	–
১৯৭৮	১০,৮৩২	৭.৫২	২ লক্ষ টন	–	–	–	–
১৯৮০	৩৩,০৭৭	২২.৯৭	১৪লক্ষ টন	২০	–	–	৪০০
১৯৮২	৩,১৪৯	২.১৯	৮০ হাজার টন	–	–	–	–
১৯৮৩	১১,১১২	৭.৭২	৭ লক্ষ টন	–	–	–	–
১৯৮৪	২৮,৩১৪	১৯.৬৬	৯ লক্ষ টন	৫৫৩/২০	৫,৭৮,০০০	৬৭,৪৫১	৪৫০
১৯৮৫	১১,৪২৭	৭.৯৩	–	–	–	–	–
১৯৮৬	৪,৫৮৯	৩.১৯	–	–	–	–	–
১৯৮৭	৫৭,৪৯১	৩৯.৯২	১৫ লক্ষ টন	১,০০০/৪১	৭,০০,০০০	৪,৩৪,০০০	৩৫,০০০
১৯৮৮	৯৮,০০০	৬৮.০০	১৮ লক্ষ টন	১,৬০০/৫০		২,০০,০০০	৪০,০০০

উৎস ঃ বন্যা কবলিত এলাকা ও শতকরা হারের উৎস ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ।
অন্যান্য তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে । শূন্য স্থানের তথ্য পাওয়া যায়নি ।

১৯৯৮ সালের মহাপ্রলয়ঙ্করী ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা

১৯৯৮সালের বন্যাকে শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যা বলে অভিহিত করা হচ্ছে । এ বন্যার রুদ্র ভয়াল তান্ডবে প্রায় সমগ্র দেশ বিপর্যস্ত হয়েছে । ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৫০টিই বন্যা কবলিত হয়েছে । অপরদিকে এ বন্যা ছিল দীর্ঘস্থায়ী বন্যা । প্রায় ৩ মাস যাবত এ বন্যার স্থায়িত্বকাল ছিল । ৯৮ এর এ বন্যার প্রধান কারণ হিসেবে অতিবৃষ্টিকেই দায়ী করা হচ্ছে । এ বছর জুলাই ও আগষ্ট মাসের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল সারাদেশে ৪০ হাজার ৩০০ মিঃমিঃ যা স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাতের চাইতে ১০ হাজার ৭২৪ মিঃমিঃ বেশী ছিল । এ বছর মার্চ, এপ্রিল ও মে এ তিন মাসেও অধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে । তদুপরি দেশের নদীগুলোর উৎসমুখেও এ বছর বেশী বৃষ্টিপাত হয় । ফলে বন্যা প্রবল আকার ধারণ করে । বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণ হিসেবে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের আধিক্য, উজানে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ও অমাবস্যা পুর্ণিমার দরুণ জোয়ার - এ তিন কারণের যৌথ প্রভাবক বলে বিশেষজ্ঞগণ দায়ী করেছেন । আবার কেউ কেউ বঙ্গোপসাগরে ভূমিকম্প হওয়াকেও এর সাথে যুক্ত করেছেন । নিম্নের সারণী -৮ থেকে১৯৯৮ সনের বৃষ্টিপাতের আধিক্যের একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায় ।

সারণী -৮

মাস	স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)	এবারের বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)	দেশী	শতকরা
মার্চ	১২০৩	৩২০৩	২০০০	+ ১৬৮ %
এপ্রিল	২৯২০	৫২২০	২৩০০	+ ৭৯ %
মে	৮০৬২	৮৬৪৬	৫৮৪	+ ৭ %
মোট	১২১৮৫	১৭০৯৬	৪৯১১	+ ৪০ %

সূত্র ঃ দৈনিক ভোরের কাগজ, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

১৯৮৮ ও ১৯৯৮ এর বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

১৯৫৪-১৯৮৮ সালের বিভিন্ন বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় । এসব বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিম্নে দেওয়া হয়েছে । ১৯৯৮ সালে বন্যার কারণেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ (বি,আই,ডি,এস) এর সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এবারের বন্যায় বিভিন্ন খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশী । এর মধ্যে কৃষিখাতে ৫ হাজার কোটি টাকা, অবকাঠামো খাতে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা এবং শিল্প খাতে ১২শ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে । শিল্পখাতের মধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারী কুটিরশিল্পের ক্ষতি ১ হাজার কোটি টাকার বেশী । খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সমীক্ষায় বলা হয়েছে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ স্বাভাবিক সময়ে ২২ লাখ টন থেকে বেড়ে ৪৩ লাখ টনে উন্নীত হওয়ার আশংকা রয়েছে । ঘাটতি পূরণে সরকারকে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্য শস্য আমদানী করতে

হবে তাতে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে বিরূপ প্রভাব পড়বে। ১৯৫৪-৮৮ সালের বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র, ১৯৮৮-মহাপ্লাবনে ক্ষয়ক্ষতির বিশেষ দিকসমূহ ও ১৯৯৮ এর বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র, ১৯৫৪-৮৮

সাল	ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ	সামগ্রিক আর্থিক ক্ষতি
১৯৫৪	ফসল ক্ষতি ঃ ১ কোটি ২৩ লক্ষ একর জমির	১৫০ কোটি টাকা
১৯৫৬	ফসল ক্ষতি ঃ ১ কোটি ৬০ লক্ষ একর জমির	১৫০ ,, ,,
১৯৬২	ফসল ক্ষতি ঃ ১ কোটি ৬৮ লক্ষ একর জমির	১৫০ ,, ,,
১৯৬৬		৬০ ,, ,,
১৯৬৮		১২০ ,, ,,
১৯৬৯		১১০ ,,
১৯৭০	৫২০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত	১১০ ,, ,,
১৯৭৪	৮৩০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত ২৮০০০ মৃত্যু, ৩০ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত	২০০০ ,, ,,
১৯৮০	৫২০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত ২০ মিলিয়ন লোক ক্ষতি গ্রস্ত	৪০০ ,, ,,
১৯৮৪	৬৫০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত ২০ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত	৪৫০ ,, ,,
১৯৮৭	৮৮০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত ৪০টি জেলা উপদ্রুত, ১০০০ মৃত্যু, ৪১ মিলিয়ন লোক ক্ষতি গ্রস্ত	৩৫০০ ,, ,,
১৯৮৮	৫২০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত, ৫৩টি জেলা উপদ্রুপ, ৫০ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত, ১৬০০ মৃত্যু।	৪০০০ ,, ,,

উৎস ঃ ইলাহী , কে, মে, ১৯৮৮ বন্যার আর্থ- সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং বন্যার সাথে সহাবস্থান সম্ভাবনা। বাংলাদেশে বন্যা ঃ ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি, বাংলাদেশ ভূগোল সমিতি, ঢাকা ঃ ১৬ অক্টোবর।

১৯৮৮- মহাপ্লাবনে ক্ষয়ক্ষতির বিশেষ দিকসমূহ

ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়	ক্ষতির আকার
ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	৫৩
ক্ষতিগ্রস্ত থানা	৩৫৫
উপদ্রুপ এলাকা (বর্গ কিলোমিটার)	৯৮,০০০
প্রাণ হানী	১,৬০০
ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৫০
ফসলী জমির ক্ষতি (হাজার একর	৫০০
ফসল (ধ্বংস হাজার টন)	৩২০
মহাসড়ক (ক্ষতিগ্রস্ত কিঃমিঃ)	২,৮৮০
রেল সেতু ধ্বংস	৪৪
গবাদি পশুর মৃত্যু (হাজার)	২০০
হাঁস-মুরগীর মৃত্যু (হাজার)	৪০০
ঢাকায় মোট আনুমানিক ক্ষতি (কোটি টাকা)	৪,০০০

উৎস ঃ ইলাহী , কে, মে, ১৯৮৮ বন্যার আর্থ- সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং বন্যার সাথে সহাবস্থান সম্ভাবনা। বাংলাদেশে বন্যা ঃ ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি, বাংলাদেশ ভূগোল সমিতি, ঢাকা ঃ ১৬ অক্টোবর।

মহাপ্লাবনে ক্ষয়ক্ষতি - ১৯৯৮

ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়	ক্ষতির আকার
সরকারি হিসেব মতে বন্যাকবলিত হয়েছিল	প্রায় ৩ কোটি লোক
বন্যাজনিত ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা	১ লাখ ৩৫ হাজার
ডায়রিয়ায় মৃতের সংখ্যা	১০০ জন
বন্যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে কমপক্ষে	সাড়ে ৩ মিলিয়ন মানুষ
বন্যার কারণে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ	২৮৭২০০০ মেট্রিক টন
বন্যায় ফসল নষ্ট হয়েছে	১৩ লাখ টন
মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ	সাড়ে ১২শত কোটি টাকা
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাতে ক্ষতির পরিমাণ	প্রায় ২০০০ কোটি টাকা
বন্যায় সড়ক বিধ্বস্ত হয়েছে	১৩ হাজার কিঃমিঃ
সড়ক বাঁধ বিধ্বস্ত হয়েছে	সাড়ে ৩,০০০ কিঃমিঃ
পেভমেন্ট বিধ্বস্ত হয়েছে	৩,৬৮৫ কিঃমিঃ
কালভার্ট বিধ্বস্ত হয়েছে	৫৯০ টি
সেতু বিধ্বস্ত হয়েছে	৪৫৮ টি
ফেরীঘাট বিধ্বস্ত হয়েছে	৫০ টি
বন্যার ফলে ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন টাওয়ার	২৫০০ টি
দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোজনিত ক্ষতি হয়েছে	প্রায় ৬ শত ৫০ কোটি টাকার
বন্যায় ঢাকা ওয়াসার পানি উৎপাদন কমে গেছে	৫০ লাখ লিটার
প্রাণহানির সংখ্যা	৫৫৯
সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী	প্রায় ৯ লাখ
ফসল হানি হয়েছে	প্রায় ১৪ লাখ একর জমি
গবাদি পশুর মৃত্যু	২২ হাজার

উৎস ঃ কারেন্ট কনসেপ্ট, অক্টোবর, ১৯৯৮, বিশেষ সংখ্যা পৃঃনং - ১২

অর্থনীতিতে বন্যার প্রভাব- বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট

সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার কারণে বর্তমান অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) এর হার ৫ দশমিক ৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৩ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে বিশ্বব্যাংকের এ সমীক্ষায় বলা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি ব্যয় বাজেট লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সর্বোচ্চ ১৫শত কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ৯০০ কোটি টাকা হ্রাস পেতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪ দশমিক ৯ শতাংশ হতে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশের বন্যার উপর বিস্তারিত সমীক্ষা চালিয়ে বিশ্বব্যাংক এই মূল্যায়ন করেছে। বাংলাদেশঃ দি ফ্লাডস অব ১৯৯৮ শীর্ষক এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, বন্যার কারণে লেনদেনের ভারসাম্যে বড় ধরনের প্রভাব পড়বে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, চলতি হিসাবে ঘাটতি জিডিপির ১ দশমিক ৪ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২ দশমিক ৮ শতাংশ হতে ৩ দশমিক ১ শতাংশের মধ্যে থাকবে। রফতানী হ্রাস এবং খাদ্য আমদানীর কারণে বর্ধিত আমদানী ব্যয়ের ফলে বৈদেশিক সম্পদের ঘাটতি ৪১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার হতে ৫৭ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার সীমিত থাকবে। তবে প্রবাসীদর রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং খাদ্য ও পণ্য সাহায্য প্রাপ্তির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অপরিবর্তিত অর্থ্যাৎ ১৯০ কোটি ডলার থাকবে। বন্যার আগে খাদ্য আমদানীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৬ কোটি ডলার। বন্যার কারণে খাদ্যশস্য আমদানী ৫৯ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার দাঁড়াতে পারে। বন্যায় তৈরী পোশাক রফতানীর লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ১৩ শতাংশ হতে সাড়ে ৮ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে চলতি অর্থ বছরে ডলারের অংকে রফতানী প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন্যায় সবচাইতে **গুরুত্বপূর্ণ** প্রভাব পড়েছে সরকারি ব্যয়ের উপর। বন্যার কারণে সরকারি ব্যয় ৭শত কোটি টাকা হতে ১৫শত কোটি টাকা বেড়ে যাবে। চলতি ব্যয় বাড়বে বাজেট লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৬শত কোটি টাকা। অধিকাংশ ব্যয় বাড়বে খাদ্য বন্টনজনিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণে। এছাড়া শিল্পখাতে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্যে পুনর্বাসন সহায়তা, কৃষি উপকরণ এবং অতিরিক্ত সার আমদানীর জন্যেও ব্যয় বাড়বে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, সরকার এডিপি'র অর্থ সাশ্রয় করে অবকাঠামো পুনর্বাসন কর্মসূচিতে ব্যয় করেছে। সবকিছু বিবেচনায় এডিপি'র আকার এবার ৯শত কোটি টাকা কমতে পারে। সব মিলে বাজেট লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব আয় ৫ শতাংশ কম হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের মতে, ভয়াবহ বন্যার কারণে দেশের সার্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রবৃদ্ধির হার কমে যাবে। প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ হতে পারে। কৃষি খাতের মধ্যে শস্য খাতে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৬ হতে ১০ শতাংশ কমতে পারে। এর মধ্যে চালের উৎপাদন ক্ষতি ৫ হতে ১২ শতাংশ। আবার এর মধ্যে

আমনের ক্ষতি ২০ শতাংশ, আউশের ক্ষতি ১৬ শতাংশ, পাট উৎপাদনের ক্ষতি ৭ শতাংশ এবং তরিতরকারী ও শাকসবজি উৎপাদন ক্ষতি ২৭ শতাংশ। গবাদি পশুর খাতে প্রবৃদ্ধি গত পাঁচ বছরের গড় ৮ দশমিক ২ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে ৩ শতাংশে। সব মিলে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৩ শতাংশ নিম্নমুখী হবে (হাসন মনজুর, ২০০০)।

শিল্প খাতে বন্যার ফলে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। ফলে উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধির হার হবে ২ দশমিক ৭ শতাংশ। গত ৫ বছরের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এর মধ্যে বৃহৎ শিল্প প্রবৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র শিল্পে ২ শতাংশ। গত ৫ বছরে বৃহৎ শিল্পের প্রবৃদ্ধি ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র শিল্পে ৪ শতাংশ। পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৬ দশমিক ২ শতাংশ, বন্যায় এই হার ৫ শতাংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিবহণ খাতে গত ৫ বছরে প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিলো ৫ দশমিক ৯ শতাংশ, বন্যার ফলে এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪ দশমিক ৬ শতাংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সকল খাতে মূল্য সংযোজন হার হ্রাস পেলেও পুনর্বাসন কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করার জন্য ব্যাংকিং খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৭ শতাংশ হতে বেড়ে ৪ শতাংশ হবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোগ

বিগত ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সনের নজিরবিহীন বন্যার পর ১৯৫৬ সনে জাতিসংঘের উদ্যোগে গঠিত ক্রুগ মিশন ১৯৫৭ সনে যে সকল সুপারিশ প্রদান করেন তার ভিত্তিতে ১৯৫৯ সনে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা নামক একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিস্কাশন ও সেচ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন। পরবর্তীকালে, যথাক্রমে ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সনে দু'জন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করে। এদের একজন মিসিসিপি নদী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নেদারল্যান্ডের নদী বিষয়ক অধ্যাপক। ওয়াপদার ১৯৬৪ সনের মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী নামক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক একটি পরামর্শক সংস্থা। তাঁদের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শস্যের সুরক্ষা করা এবং পরবর্তীকালে পানি সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল মহা-পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। মহা-পরিকল্পায় ৫১টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং তিনটি ব্যারেজ নির্মাণের সুপারিশ ছিল। ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা-পদ্মা এবং মেঘনার উভয় পাশে বাঁধ নির্মাণসহ মোট ২০০০ মাইল দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। তবে ১৯৬৪ সনের মধ্যেই কয়েকটি বৃহদাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল। এগুলোর মধ্যে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, কর্ণফুলি বহুমুখী প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ

ডেমরা প্রকল্প, উপকূলীয় বেঁড়ি বাঁধ প্রকল্প এবং ব্রহ্মপুত্র পশ্চিম তীর বাঁধ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর ওয়াপদার পানি অংশকে বিদ্যুৎ অংশ থেকে আলাদা করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। উপরোল্লিখিত বৃহৎ প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং দ্রুত ফল উৎপাদক বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিস্কাশন প্রকল্পর উপর জোর দেয়া হয়। তথাপি ১৯৭৮-৮০ সনের মধ্যে যে সকল বৃহৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় তার মধ্যে মেঘনা-ধনাগোদা প্রকল্প এবং পাবনা প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। অর্থের অভাবে কোন কোন প্রকল্প যেমন ঢাকা- দক্ষিণ-পশ্চিম এবং ফরিদপুর-বরিশাল প্রকল্প স্হগিত রাখা হয়েছে। কতিপয় ছোট ছোট প্রকল্প বিভিন্ন বিদেশী সংস্হার অর্থানুকূল্যে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত মোট ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৮৩ সনে সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাস্টারপ্লান অর্গানাইজেশন নামে একটি সংস্হার উপর জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। উক্ত সংস্হা ১৯৮৬ সনে একটি খসড়া জাতীয় পানি পরিকল্পনা পেশ করেছে।

১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের ব্যাপক বন্যার পর আবার সবার দৃষ্টি বন্যার দিকে নিবদ্ধ হয়। তখন বিশেষজ্ঞরা মত দেন আভ্যন্তরীণ বৃষ্টিপাত বন্যার সামান্য কারণ হলেও মূল পানি দেশের বাইর থেকে আসে তাই বন্যা প্রতিরোধ সম্ভব নয়। কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্হ পানির মজুদ বৃদ্ধি, শিল্প বর্জ্য নিস্কাশন প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করে স্বল্পবিস্তর বন্যা মেনে নেবার চিন্তা করা হয়। বড় মাপের বন্যায় ক্ষুদ্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো কোন কাজ দেয় না বলে স্বীকার করা হয়। ১৯৮৭-৮৮ এর বন্যার পর জুলাই ১৯৯০ সালে দাতা গোষ্ঠী প্যারিস জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন বাংলাদেশ সাংবার্ষিক বন্যার একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান সুপারিশ করেন। ইতিমধ্যে যে সমস্ত সমীক্ষা চালানো হয় তা নিম্নরূপ । প্রথম ৩টি প্রতিবেদন একইরূপ ব্যবস্হা নিতে বললেও শেষের প্রতিবেদন ভিন্নমত পোষণ করে।

- ☐ জাতীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি - সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় - ১৯৮৮।
- ☐ বন্যা নীতি সমীক্ষা বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংগ উন্নয়ন কর্ম কর্মসূচি - ১৯৮৯।
- ☐ বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই বাংলাদশ সরকার ও ফ্রান্স ১৯৮৯।
- ☐ বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা জরিপ - পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাপান, ১৯৮৯।

ফ্লাড এ্যাকশান প্লান

রিপোর্টগুলি সমন্বয় করে ৫ বৎসরের জন্য বন্যা কার্যক্রম নক্সা (ফ্লাড এ্যাকশান প্লান) বা ফ্যাপ প্রতিষ্ঠা করা এবং ১৯৮৯ সনের ডিসেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত দাতাদের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে ফ্যাপ অনুমোদিত হয়। ফ্যাপ ৫ বৎসরে ১১টি মূল নীতির উপর ১৫ ধরনের কাজ করবে যাতে বাংলাদেশ সরকারও অনুমোদন দিয়েছে। ১৯৯১ থেকে ৯৫ এ ৫ বছর এ কর্মসূচির আওতায় শুধূ স্টাডি হয়েছে যার খরচ ৬০০ কোটি টাকা। এ স্টাডির প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন নদীর পার্শ্বে বাঁধ, রিজার্ভার তৈরী ও অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন । এতে মোট খরচ হয়েছে ১৬ হাজার থেকে ৫৬ হাজার কোটি টাকা এবং সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫ বৎসর। ফ্যাপ বন্যার পানির সাহায্যে বৎসরের অন্য সময়ের পানি ঘাটতি পূরণ করতে চাচ্ছে । বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্হাপনা **ষ্ট্রাটেজি** নামের চূড়ান্ত প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এতে বলা হয়েছে ঃ-

- ফ্যাপ কিছু ভৌত কাঠামো ও কাঠামোবিহীন প্রকল্প নিয়ে কাজ করবে ।

- প্রকৌশলগত ভৌত কাঠামো নির্মাণ করলে পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনীতির উপর কাঠামোর প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করবে ।

- প্রকল্পগুলি যাতে বহাল থাকে সেজন্য পরিকল্পনা থেকে নির্মাণ ও বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজে স্হানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

- কৃষি ও পরিবেশের উপর, বিশেষ করে মাটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ভূগর্ভে পানি প্রবেশ, নৌচলাচল পথ বৃদ্ধি, শহরাঞ্চলে শিল্পের বর্জ্য নিস্কাশনে সহায়ক বলে বন্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে না ।

বন্যা ব্যবস্হাপনা বা প্রতিরোধে সম্ভাব্য উপায়

বাংলাদেশে বর্তমান শতকে বন্যার প্রকোপ অধিক মাত্রায় দেখা যায়। প্রাকৃতিক গঠন এবং নদী ব্যবস্হার মিলনস্হলে অবস্হানের কারণে বাৎসরিক প্লাবন/বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার স্হায়ী কোন উপায় নেই বাংলাদেশের । বন্যা ব্যবস্হাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে সমাজকে বাচানো। অবশ্য বন্যা ব্যবস্হাপনার এতদিনের লক্ষ্য অন্যরকম ছিল। সেটা হচ্ছে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমি যাতে ডুবে না যায় তার ব্যবস্হা করা। এতে করে উচ্চফলনশীল ধান উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। কিংবা আমন ধানকে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারে। বন্যার মত প্রাকৃতিক দূর্যোগগুলো মানুষ যুগ যুগ ধরে নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করছে। আমাদের দেশে বন্যা ব্যবস্হাপনার প্রয়োজনও আছে। বন্যার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা

এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা ঃ

ক) অবকাঠামোগত বা ষ্ট্রাকচারাল অর্থাৎ ডুবে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা;

খ) অবকাঠামোগত বহির্ভূত ব্যবস্থাপনা বা নন-ষ্ট্রাকচারাল ব্যবস্থা অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাকে নিয়ন্ত্রনে রাখা । ডঃ আইনুন নিশাত, (১৯৯৫) বন্যা ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলো ব্যবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

১। জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে পানির প্রবাহকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা, এটি ব্যয়বহুল। এটি পাহাড়ী অঞ্চলে নির্মাণ করতে হয় এবং বহুমুখী প্রকল্প হিসাবে কাজ করে। এতে সামাজিক ও পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাড়তে পারে। বাংলা-দেশে কেবলমাত্র চট্রগ্রাম অঞ্চলে এটি সম্ভব। অন্যান্য বন্যার জন্য এ ধরনের জলাধার নির্মাণ করতে হলে তা ভারতে করতে হবে।

২। বাঁধ দিয়ে নদীর পানি উপচে পড়াকে বন্ধ করা এটিই আমাদের দেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রযুক্তি। তবে মনে রাখতে হবে যে বাঁধ দিয়ে তারপর সে বাঁধ যদি কোন কারণে কার্যকর না হয় তাহলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যায়। দেশে ছোট বড় অনেক বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। এ সমস্ত ব্যবস্থার ফলে দেশে ধানের উৎপাদন যে বেড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে একই স.ঙ্গে অন্তত তিনটি মৌলিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

- এ সমস্ত প্রকল্প গ্রহণের সময়ে পরিবেশের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা বিবেচনা করা হয়নি বলে এগুলো বিভিন্ন পরিবেশিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে।
- যে সব এলাকায় বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে সে সব এলাকা বন্যার ধাক্কা থেকে রক্ষা পাচ্ছে কিন্তু অন্যান্য এলাকায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- নদীর পারে বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীগর্ভে পলি জমে নদীর গভীরতা কমে গেছে এবং বন্যার প্রকোপ বেড়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনায় রেখে আমাদের ভবিষ্যৎ বাঁধ প্রকল্প তৈরী করতে হবে।

৩। নদীর পানি পরিবহণ ক্ষমতা বাড়ানো। এ জন্যে ড্রেজিং এবং খনন কাজ করা যেতে পারে। যাতে বর্ষকালে অতি বৃষ্টিতে পানি দ্রুত নিস্কাশিত হতে পারে।

৪। নদীর পানি অন্যত্র প্রবাহিত করা। এটি অবশ্য বেশ জটিল ব্যাপার।

৫। বনায়নের কাজ করা । বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকহারে বনায়ন করা এবং গঙ্গা অববাহিকার নেপাল এবং ভারতের যে জায়গায় ব্যাপক বন ধ্বংস করা

হয়েছে (ধারণা করা হয়) সে জায়গায় ব্যাপক বনায়ন করতে পারলে বন্যার প্রকোপ কিছুটা কমিয়ে আনা যাবে বলে মনে করা হয়। তবে এটা হবে দীর্ঘমেয়াদী এবং এর ফল ভোগ করতে ৩০-৪০ বৎসর লেগে যেতে পারে।

৬। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ । আমাদের বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস সমন্ধে পূর্বাভাস খুবই উন্নত কিন্তু সতর্কীকরণ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। এলাকাভিত্তিক পূর্বাভাস নেই বললেই চলে। বন্যা সতর্কীকরণ ও পূর্বাভাস স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎস অঞ্চলের দেশের সহযাগিতায় এটি সহজে করা সম্ভব। এতে সম্পদ ও লোকক্ষয় কমবে।

৭। ফ্লাড ফাইটিং বা বন্যার প্রকোপে আক্রান্ত ষ্ট্রাকচারাল ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকর রাখা। বাঁধ নির্মাণের সময়ে বাঁধের মাটির গুণাগুণ ভালভাবে পরীক্ষা করা, বাঁধের পার্শ ঢাল ঠিক রাখা, বাঁধের এলাইনমেন্ট মাটির কমপেকশন ঠিকমত করা এবং এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

৮। ফ্লাড প্রুফিং অর্থাৎ সবকিছু এমনভাবে নির্মাণ করা যাতে তা স্বাভাবিক বন্যার উপরে থাকে । এর জন্য দেশের গ্রাম অঞ্চলে বসতির আয়তন পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৯। জোনিং অর্থাৎ নিচু জায়গায় কিংবা বন্যায় আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকা চিহ্নিত করা এবং জনসাধারণকে সতর্ক করা। বন্যার সম্ভাবনা দেখা দিলে লোকজনকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া এবং ত্রাণ বিতরণ করা। দুর্গত অঞ্চল থেকে লোক সরিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করলে লোকক্ষয় ও সম্পদ ক্ষয়ের পরিমাণ কমবে। প্রতি বছর বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বে বন্যা প্রস্তুতি গ্রহণ নিয়মিত দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন । এ জন্য স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১০।ছোট বড় নদীর বা খালের মুখ বন্ধ না করে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা

১১।বাংলাদেশের বন্যা ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণের জন্যে সম-অববাহিকা অঞ্চলের দেশসমূহের পারস্পারিক সহযোগিতা আবশ্যক।

১২।দেশের প্রতিটি জায়গায় স্বাভাবিক পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা ঠিক রাখা ।

১৩।সস্তা শ্রমশক্তি ব্যবহার করে পুকুর নালা বিল খনন করে পানি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪।নদীর তীরকে স্থায়ী মজবুত কাঠামো দ্বারা সংরক্ষিত করলে নদী স্রোত বৃদ্ধি হয়ে পলি জমা বন্ধ হবে। যে রূপ স্থায়ী কাঠামো যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় করা হয়েছে।

১৫।নদীর তীর রক্ষায় পার, গ্রোয়েন, গ্যাবিয়ন ইত্যাদি নিক্ষেপের পাশাপাশি এলাকায় এবার্টমনট বা পিয়ারর মত স্কাউর তেপথর নীচ পর্যন্ত কংক্রিটের দেয়াল নির্মাণ করা উচিত প্রতি বৎসর অল্প করে হলেও ।

১৬। কৃষিকাজ ও কৃষির বৃদ্ধির ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে। বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কমবেশী এই ছয় মাস প্লাবন হয় না। এই ছয় মাসের মধ্যে উৎপাদনযোগ্য ফসল নির্ধারণ করে উদ্ভাবন করতে হবে। একই সঙ্গে বর্ষাকালে প্লাবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে পারবে এ জাতীয় উচ্চ ফলনশীল বাওয়া ধানের আবাদ করতে হবে। এ কাজে আমাদের কৃষিবিদদের সাহায্য নিতে হবে।

১৭ । অধ্যাপক ইলাহীর প্রস্তাব সমর্থন করে বলতে চাই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দেশের জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল উদ্ভাবনের নিমিত্তে দুর্যোগের সমীক্ষা ও মনিটর করার জন্য দেশে একটি কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন । যেখানে ভূগোলবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, পরিবেশবিদসহ সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞগণ বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলায় অবদান রাখতে সক্ষম হবেন ।

১৮। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচি আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে অবকাঠামোগত মেরামত প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন বিশেষ ভৌগোলিক ও পরিবেশগত অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বন্যা ব্যবস্থাপনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ।

উপসংহার

বন্যা সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান আমাদের মত ভৌগালিক অবস্থানের দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া প্লাবন বা নিয়ন্ত্রিত বন্যা আমাদের জন্য উপযোগী। প্রতিটি বন্যার পর আমাদের গভীরভাবে সমীক্ষা চালাতে হবে যাতে পরবর্তীতে এ ধরনের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। বন্যা নিছক একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। বন্যা সমস্যা মোকাবেলার জন্য একটি সামগ্রিক পরিবেশ চেতনা জনসাধারনের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। বন্যা সমস্যার একটি বিশেষ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। তাই বন্যা সমস্যার মোকাবেলায় আমাদের সহ অবস্থানের চিন্তা করতে হবে। কারণ প্রযুক্তি ও কৌশলগত ব্যবস্থায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে নানারূপ পার্শপ্রতিক্রিয়া পরিবেশের উপর বেশ চাপ সৃষ্টি হয়। সুতরাং, বন্যার সংগে সহ অবস্থানের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেই আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে। বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এখন শুধু স্থানীয় আর্থসামাজিক বা কারিগরি সমস্যায় সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের বন্যা এখন একটি আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সবশেষে বন্যা দুর্যোগের মোকাবেলা কোন একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সাহসিকতা ও একতা নিয়ে এই জাতীয় দুর্যোগের মোকাবেলায় সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য এবং সরকারি নীতিমালা তৈরীর সময় ষ্ট্রাকচারাল ও নন-ষ্ট্রাকচারাল কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করা খুবই প্রয়োজনীয়। এ জন্য প্রয়োজন সরকারি সদিচ্ছা, জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্বেচ্ছাসেবীদের কাজে লাগানো। সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন জাতীয় ঐকমত্যের যার পূর্বশর্ত অবাধ, নির্ভুল এবং উদ্দেশ্যমূলক নয় এমন তথ্য প্রবাহ ।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১। আলম, শা. এবং শামসুদ্দীন, দা- ১৯৮৮ । বাংলাদেশের বন্যা, কারণ ও এর সঙ্গে সহাবস্হানের উপায়, ভূগোল পত্রিকা, ৭ঃ৫-১৬ ।

২। আব্বাস এ, টি, বি, এম, ১৯৮৫ঃ বাংলাদেশের পানি সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

৩। আসাদুজ্জামান, মো. ১৯৯৫। বন্যাঃ কারণ ও প্রতিকার। সচিত্র বাংলাদেশ। বিশেষ সংখ্যাঃ ১১০-১১৫।

৪। দৈনিক ভোরের কাগজ, ২২ সেপ্টেম্বর- ১৯৯৮ ।

৫। নিশাত আইনুন ডঃ ১৯৯৫। বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও প্রতিকার । সচিত্র বাংলাদেশ। বিশেষ সংখ্যাঃ ৮৬-৮৯।

৬। বন্যা ৮৮ গবেষণা রিপোর্ট (অপ্রকাশিত)। ঢাকা ঃ ভূগোল বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

৭। হক স. ম. ১৯৯৬ ঃ বাংলাদেশের নদী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

৮। হাসন মনজুর ২০০০ । বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও সম্ভাব্য প্রতিকার । প্রবাহ। ১৮-২৯।

9. Hossain, M. 1987. Floods in Bangladesh. Disaster and Peoples Survival, Dhaka: University Research Centre

10. Miah, M.M. 1988. Floods in Bangladesh. Dhaka University Press

11. Rashid H. and Paul B.K., 1987: Flood Problems in Bangladesh, is there any indigenous solution? Environmental Management Vol. 11(2), PP. 155-173.

12. Tarafdar. M.R., 1974: Rivers and flood problems in Bangladesh, in A.F.M. Kamaluddin (edited): Studies in Bangladesh Geography, Bangladesh National Geographical Association.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মোঃ আবুল বাশার*

Disaster and Disaster Management: Bangladesh Context

Abstract

We know that Bangladesh is a disaster prone country. Natural disasters like flood, cyclone etc. are regular visitors here. So disaster is a very important issue for Bangladesh. A Separate ministry has been formed here to mitigate the sufferings of people caused by disasters. This paper discusses the conceptual issues of disaster management in Bangladesh drawing examples from current and historical situations.

Disaster শব্দের বাংলা অর্থ দুর্যোগ। অনেকেই Disaster এবং Hazard শব্দ দুটোকে সমার্থক মনে করে থাকেন। কিন্ত আভিধানিক দিক থেকে শব্দ দুটোর মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। Disaster হলো ব্যাপক মাত্রায় ক্ষয়ক্ষতি, যার প্রভাব অনেক বেশী প্রতীয়মান হয় মানবকূলের উপর । অর্থাৎ এটি একটা বিশাল গোষ্ঠী বা সমাজ বা জাতীয় জীবনে অতিমাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর দ্বারা একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চরম বিপর্যয় ঘটে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বহু দেশের সরকার দুর্যোগ মোকাবেলা করতে অক্ষম বা সফল না হওয়ার ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। তাই দুর্যোগ কেবল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই ঘটায় না রাজনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটায়। পক্ষান্তরে Hazard শব্দটিকে দুর্যোগ হিসেবে উল্লেখ না করে দৈব ঘটনা কিংবা আকস্মিক ঘটনা বল্লেই বোধ করি বেশী মাত্রায় গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এর দ্বারা একটা পরিবার বা শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জাতীয় ক্ষতি বা ব্যাপক আকারের ক্ষতি এর দ্বারা সংঘটিত হয় না। সুতরাং Disaster এবং Hazard এর মধ্যকার মূল পার্থক্য হল Disaster মূলত জাতীয় (national) সমস্যা আর Hazard কখনই জাতীয় সমস্যা হিসেবে পরিগণিত নয়। Hazard দ্বারা মানুষের ক্ষতি হতে ও পারে আবার না ও হতে পারে। যদি সমস্যা হয়ও তাহলে অত্যন্ত সীমিত আকারের যেমন একটা এলাকার জনগণের সমস্যা কিংবা এক বা একাধিক পরিবারের সমস্যা হতে পারে। যেমন ডেঙ্গু জ্বর এবং আর্সেনিক সমস্যা কে আমরা Hazard এর যথার্থ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। বাংলাদেশের মাত্র গুটি কয়েক অঞ্চলে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ দেখা যায়; তাই ডেঙ্গু জ্বর Disaster নয়। তবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন আর্সেনিক সমস্যা হয়ত এক সময়ে বাংলাদেশে দুর্যোগ তথা Disaster হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এ সমস্যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, টর্নেডো, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মহামারী সবই দুর্যোগের আওতাভুক্ত। এ গুলোর কোনটি প্রাকৃতিক আবার কোনটি মানব সৃষ্ট।

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

দুর্যোগ ছিল, আছে এবং থাকবে। এটা মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি দুর্যোগ (Disaster) দ্বারা জানমালের ক্ষয়ক্ষতি না হত তাহলে মানুষ দুর্যোগ নিয়ে এতটা ভাববার সুযোগ পেতনা। জনমানবহীন কোন পরিবেশে কোন বিপর্যয় (Hazard) সংগঠিত হলে মানুষ কখনই তা নিয়ে উৎকণ্ঠা বোধ করে না, কারণ এর দ্বারা মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রা ব্যহত হয় না।

দুর্যোগের ধরন

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২। মানবসৃষ্ট দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ক) বন্যা, খ) সাইক্লোন, গ) খরা, ঘ) টর্নেডো, ঙ) নদীভাঙ্গন, চ) ভূমিকম্প ইত্যাদি ।

মানবসৃষ্ট দুর্যোগ

ক) যুদ্ধ, খ) দুর্ভিক্ষ, গ) দাঙ্গা, ঘ) কৃত্রিম খাদ্যাভাব, ঙ) অগ্নিকান্ড ইত্যাদি ।

দুর্যোগ নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা একটি দূরুহ কাজ। তাই এ আলোচনা কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এশিয়ার কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ।

সারণী-১

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ কতিপয় দেশের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র (১৯০০- ১৯৯৮)

দেশের নাম	দুর্যোগের সংখ্যা			প্রাণহানী	আহত	ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা	গৃহহীন	ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ (মাঃ ডঃ)
	প্রাণহানী							
	১০-৯৯	১০০ - ৯৯৯	১০০০ +					
বাংলাদেশ	৭৪	৬২	২৭	২.৫৭১.৭৪৪	৮৫৪.০০৬	৩৬২.২৭০.৪২৬	৪১,৮১০,৬৬৭	৯,০২৪,২৭৯,০০০
চীন	১৩৬	৯৬	৪৬	১১,৮২৯,২৭৩	৬৪৭.৬৪১	১,১১৯,৬৭৯.৬৫৬	৩১,৫০৪,৪৯০	১৬২,৬৩৮.০১৫
ভারত	১২৪	১৫৬	৮৬	১,৮১৭,০১৩	৩৫,৬০২	১,৭৯৬.৩৮০,৮৩৪	২৩,৬৭৪,১০০	২৮,৮৮৭,১৬১.০০ ০
ইন্দোনেশিয়া	৭৮	৪৩	১১	৫৭,৬১৩	২৭২,১২২	১০,৫৭২,৪৩৬	৭৭৩,০২৮	১৮,৪২৯,৫৫৬,০০ ০
জাপান	১০৫	৫০	২৫	২২০,৭৭৯	৩৫,৯৫৭	৭,৬৩৯,২১৭	১,৭০৫,১০০	১৬৫,৩৩২,৬০০,০ ০০
মায়ানমার	১১	৭	৩	৭.৬৩০	২০০	৬,৬৮০	৭৫৭,৯৩৯	৫৬৬,৬১৫,০০০
নেপাল	১৯	১৯	৩	১৭,১৪৬	৭,০৮৮	৭,০২৬,৫২৫	৯৬,৩৫০	৫৮০,৬১৩,০০০
ফিলিপাইন	১৫১	৮৪	১২	৬১,৫৭৮	৪১,২৬২	৬৮,৭৩২,৩৮৫	৯,১৯৯,৩৫৪	৭,৭৩৭,০৬৮,০০০
শ্রীলংকা	১৪	৫		২,০৯৯	৬,০০০	১৬,৪৮৬,৩১৭	২,৩৫১,১৪০	৪৪০,০৬০,০০০
থাইল্যান্ড	১৯	৭		৩,৫৫৩	৩,৪১৬	২৭,৩৭৩,৮০৭	২৪৭,১৪০	৪,২৩১,২৬৬,০০০

উৎস ঃ এডিআরসি বার্ষিক প্রতিবেদন, মার্চ ১৯৯৯, পৃঃ ২৪

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। এমনভাবে এর তিন দিক স্থল বেষ্টিত এবং এক দিক জল বেষ্টিত যে এর দক্ষিণাংশ অনেকটা ফানেল আকৃতির। তাই বঙ্গোপসাগরে কোন নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে তা বাংলাদেশের উপর প্রভাব ফেলবে বলেই ধরে নেয়া হয়। আর এ কারণেই প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশের উপর দিয়ে সাইক্লোন প্রবাহিত হয়। সাইক্লোনের বাতাসের গতিবেগ এবং সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস ক্ষতিসাধন করে দেশের দক্ষিনাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল, ধ্বংস করে মানুষের জীবন, ঘরবাড়ী, গবাদীপশু, রাস্তাঘাট ইত্যাদি। গঙ্গা, ব্রক্ষ্মপুত্র, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা নদীর পলি দ্বারা এ দেশ সৃষ্টি। ভারত থেকে আগত উল্লেখিত প্রথম তিনটি নদী পৃথিবীর সবচাইত বেশী পরিমাণ বৃষ্টির জল পরিবহন করে। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি ১০ থেকে ১৫ বছর অন্তর দীর্ঘস্থায়ী (Prolong) বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে। শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যা ১৯৮৮ এর ঠিক দশ বছর পর প্রলয়ংকরী বন্যা ১৯৯৮ দেখা দিল বাংলাদেশে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে ১৯৮৮ সালের বন্যায় দেশের ৮৪% এলাকা প্লাবিত হয়। এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৪.৫ কোটি লোক। বন্যা কালীন সময়ে ১৬০০ জন এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে উদারাময় রোগে প্রায় ৭৩৫ জন লোক মারা যায়। প্রায় ২৫০০ কিঃমিঃ বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ, ১০০০০ কিঃমিঃ সড়ক ও জনপথ, রেললাইন ও স্থানীয় সড়ক, ১৯০০০ এর উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১৪৬৮ টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঘরবাড়ী বাদে অবকাঠামো নির্মাণে ১১০০ কোটি টাকা খরচা হবে বলে হিসাব করা হয়েছিল (ফসিহ উদ্দীন মাহতাব, ১৯৯৩ পৃঃ ৫২)

সার্বিকভাবে বাংলাদেশ খরা প্রবণ দেশ না হলেও বহুবার এদেশে আংশিকভাবে খরা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৫৭, ১৯৭২, ১৯৭৯ সালে প্রচন্ডতম খরার শিকার হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে দেশের প্রায় ৪২ শতাংশ এলাকা খরা কবলিত হয়েছিল।

সাইক্লোন বাংলাদেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রায় প্রতিবছর এখানে সাইক্লোন দেখা যায়। কোন কোন বছর একাধিক মারাত্মক সাইক্লোন বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯১ সালের সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার লোক মারা যায়। ১৯৬০ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত সাইক্লোনের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সারণী-২
বাংলাদেশের সাইক্লোন (১৯৬০-১৯৯৮)

তারিখ	সাল	বাতাসের গতিবেগ কিঃমি/ঘন্টা	জলোচ্ছ্বাস উচ্চতা (ফুট)	মৃতের সংখ্যা
০৯ অক্টোবর	১৯৬০	১৬২	১০	৩,০০০
৩০ অক্টোবর	১৯৬০	২১০	১৫-২০	৫,১৪৯
০৯ মে	১৯৬১	১৪৬	৮-১০	১১,৪৬৬
৩০ মে	১৯৬১	১৪৬	২০-২৯	+

২৮মে	১৯৬৩	২০৩	১৪-১৭	১১,৫২০
১১ এপ্রিল	১৯৬৪	+	+	১৯৬
১১মে	১৯৬৫	১৬২	১২	১৯,২৭৯
৩১মে	১৯৬৫	+	২০-২৫	+
১৪ ডিসেম্বর	১৯৬৫	২১০	১৫-২০	৮৭৫
০১ অক্টোবর	১০৬৬	১৪৬	১৫-৩০	৮৫০
১১ অক্টোবর	১৯৬৭	+	৬-২৮	+
২৪ অক্টোবর	১৯৬৭	+	৫-২৫	+
১০ মে	১৯৬৮	+	৯-১৫	+
১৭ এপ্রিল	১৯৬৯	+	+	৭৫
১০ অক্টোবর	১৯৬৯	+	৮-২৪	+
৭ মে	১৯৭০	+	১০-১৬	+
২৩ অক্টোবর	১৯৭০	+	+	৩০০
১২ নভেম্বর	১৯৭০	২৩৩	২০-৩০	৫,০০,০০০
০৮ মে	১৯৭১	+	৮-১৪	+
৩০ সেপ্টেম্বর	১৯৭১	+	৮-১৪	+
৬ নভেম্বর	১৯৭১	+	৮-১৮	+
১৮ নভেম্বর	১৯৭৩	+	৮-১৩	+
৯ ডিসেম্বর	১৯৭৩	১২২	৫-১৫	১৮৩
১৫ আগস্ট	১৯৭৪	৯৭	৫-২২	+
২৮ নভেম্বর	১৯৭৪	১৬২	৭-১৬	+
২১ অক্টোবর	১৯৭৬	১০৫	৮-১৬	+
১৩ মে	১৯৭৭	১২২	+	+
১০ ডিসেম্বর	১৯৮১	৯৭	০৬	০২
১৫ অক্টোবর	১৯৮৩	৯৭	+	+
৯ নভেম্বর	১৯৮৩	১২২	+	+
৩ জুন	১৯৮৪	৮৯	+	+
২৫ মে	১৯৮৫	১৫৪	১০-১৫	১১,০৬৯
২৯ নভেম্বর	১৯৮৮	১৬২	৫-১০	২,০০০
২৯ এপ্রিল	১৯৯১	১৪০	২০-২৫	১,৩৮,০০০
২ জুন	১৯৯১	১০০	০৬	+
১৯ মে	১৯৯৭	২২৫	১৫	১২৬
২৬ সেপ্টেম্বর	১৯৯৭	১৫০	১০	৭০
২০ মে	১৯৯৮	১২০	০.০	৩

+ তথ্য পাওয়া যায়নি।

Source : First National Workshop on Sustainable Development & disaster Reduction, Jointly Organised by BPATC & DMB Page 50-51.

বাংলাদেশে সীমিত এলাকা জুড়ে প্রায় প্রতি বছরই কমবেশী টর্ণেডো পরিলক্ষিত হয়। টর্ণেডো স্বল্প স্থায়ী ব্যপক মাত্রার একটি দুর্যোগ। বাংলাদেশে সাধারণতঃ প্রাক বর্ষা মৌসুমে টর্ণেডো পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের যে সমস্ত স্থানে প্রায়শঃ টর্ণেডো আঘাত হানছে তার মধ্যে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, বগুড়া, নারায়নগঞ্জ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের টর্ণেডো গুলোর মধ্যে ১৯৬৯ এর ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৪ এর ১১ই এপ্রিল, ১৯৭৭ এর ০১ লা এপ্রিল, ১৯৮৯ এর ২৬শে এপ্রিল এর টর্ণেডো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নদী ভাঙ্গন বাংলাদেশের প্রকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে আরেকটি অন্যতম পরিচিত দুর্যোগ। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রায় ২৩০ টি নদী প্রবহমান। ১৯৭০ হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাংলাদেশে নদী ভাঙ্গনের চিত্র সবচেয়ে বেশী দেখা যায় বরিশাল, ভোলা, বাগেরহাট, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, লক্ষীপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও চাঁদপুরে।

বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো ভূমিকম্প। বিগত ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়ে গেল ২৬শে জানুয়ারী, ২০০১ ভারতের গুজরাটে। এই ভূমিকম্পে লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানী ঘটে। গুজরাটে ভূমিকম্পের পর পরই ফেব্রুয়ারী ১ থেকে ১৬, ২০০১ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে একাধিকবার মৃদু ভূমিকম্প দেখা যায়। ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জে, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ-এ সংঘটিত ভূমিকম্পের খবর দেশের প্রায় সব পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্র না থাকায় এই ভূমিকম্পের মাত্রা জানা সম্ভব হয়নি। ইদানিং বাংলাদেশে যে ছোট ছোট ভূমিকম্প দেখা যাচ্ছে তা নিয়ে আজ পুরো দেশবাসীই উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, অনেকগুলো ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় কোন ভূমিকম্পের আলামত। এ দেশে ১৮৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত কমবেশী ২০টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পের রেকর্ড পাওয়া যায়। ১৮৬২ সালের ভুমিকম্পের ফলে সিলেটের হাওড় এর সৃষ্টি হয়। ১৮৭৬ সালের ভূমিকম্পে সৃষ্টি হয় মধুপুর গড়ের এবং এ ভূমিকম্প দ্বারা রাতারাতি গতিপথ পরিবর্তিত হয় ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা নদীর। এ দিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক জরিপে বলা হয়, ঢাকা নগরীর অবস্থান একটি বড় ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায়। জরিপের অভিমত, যথাযথ ক্ষতিপূরণ না করে ভূগর্ভের পানি ইত্তোলনে মাটির কণার চাপ বৃদ্ধি পায়, মাটির আভ্যন্তরীণ সজ্জায় পরিবর্তন ঘটে এবং কর্দম উপাদান সংকুচিত হয়ে পড়ে, পরিণতিতে ভূমির ধস ও অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তবে ভূমিকম্পের কারণ যাই হোক না কেন প্রায় সকল ভূ-বিশেষজ্ঞ এখন একমত যে, বাংলাদেশে ৬ রীকটার স্কেলে ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের প্রায় ৮০ শতাংশ বাড়ী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশী দুর্যোগ পূর্ণ ভূমিকম্পনপ্রবণ এলাকা হলো বৃহত্তর সিলেট এবং তারপরেই ঢাকা অঞ্চলের অবস্থান। তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এর তীব্রতা ততটা প্রকট নয়।

সারণী-৩
বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

সাল	দুর্যোগের ধরন	মৃতের সংখ্যা
১৬৪৪-৪৫	বন্যা	+
১৬৪৮	বন্যা	+
১৭৬৯-৭০	খরা	+

১৭৮৩-৮৪	খরা	+
১৭৯৭	সাইক্লোন	+
১৮২২	সাইক্লোন	+
১৮৩৩	ভূমিকম্প	+
১৮৬৫-৬৬	পূর্বের পশ্চিম বঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশ	৪০,০০০
১৮৭১	বন্যা (রাজশাহী)	১৩৫,০০০
১৮৭৬	সাইক্লোন	১০০,০০
১৮৮৫	বন্যা (রাজশাহী/দিনাজপুর)	
১৮৯২	বন্যা (রংপুর/দিনাজপুর)	
১৮৯৬-৯৭	খরা	+
১৮৯৭	ভূমিকম্প	+
১৮৯৭	সাইক্লোন	+
১৮৯৮	সাইক্লোন	১৭৫,০০০
১৯০৬-৭	পূর্ব বঙ্গের বন্যা	+
১৯০১	সাইক্লোন	+
১৯০৯	সাইক্লোন (২)	+
১৯১১	সাইক্লোন	+
১৯১৭	সাইক্লোন	+
১৯১৮	ভূমিকম্প	+
১৯১৮	বন্যা	+
১৯১৯	সাইক্লোন	+
১৯২২	সাইক্লোন	+
১৯২২	সাইক্লোন	+
১৯২২	বন্যা	+
১৯২৩	সাইক্লোন	+
১৯২৬	সাইক্লোন	+
১৯৩৬	সাইক্লোন	+
১৯৪১	সাইক্লোন	+
১৯৪২	সাইক্লোন	+
১৯৪৩-৪৪	খরা, অনিয়মিত বর্ষা, আবহাওয়ার পরিবর্তন	৩,০০০,০০০
১৯৪৭	ভূমিকম্প	+
১৯৫০	ভূমিকম্প	+
১৯৫৪	ভূমিকম্প	+
১৯৫৫	বন্যা	+
১৯৫৭	ভূমিকম্প	+
১৯৬০	সাইক্লোন (২)	১১,১৪৯
১৯৬১	সাইক্লোন	১১,৪৬৮
১৯৬৩	সাইক্লোন	১১,৫২০
১৯৬৪	সাইক্লোন	১৯৬
১৯৬৫	সাইক্লোন	১৯,২৭০
১৯৬৬	সাইক্লোন (২)	৮৫০
১৯৬৯	সাইক্লোন	৭৫
১৯৬৯	টরেন্ডো	৯২২
১৯৭০	সাইক্লোন	৩০০,০০০
১৯৭২	খরা	+
১৯৭৩	সাইক্লোন (২)	১০৩
১৯৭৪	সাইক্লোন	২০
১৯৭৪		৩০,০০০
১৯৭৫	সাইক্লোন	৫

১৯৭৫	বন্যা	+
১৯৭৭	সাইক্লোন	+
১৯৭৮/৭৯	খরা	+
১৯৮১	সাইক্লোন	২
১৯৮২	খরা	+
১৯৮৩	সাইক্লোন (২)	৩৪৩
১৯৮৪	বন্যা	+
১৯৮৪	সাইক্লোন	+
১৯৮৫	সাইক্লোন	১১,০৬৯
১৯৮৬	সাইক্লোন	১৪
১৯৮৮	বন্যা	১,৬৫৭
১৯৮৮	বন্যা	২,৩৭৯
১৯৮৮	সাইক্লোন	৫,৭০৮
১৯৮৯	খরা	+
১৯৯১	সাইক্লোন	১৩৮,৮৬৮

+ তথ্য পাওয়া যায়নি

Source: Disaster Preparedness and Management, SAARC workshop Report, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) Cotbari, Comilla, Bangladesh. Page: 71-73

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। আধুনিক কালে দুর্যোগ মোকাবেলার চাইতে ব্যবস্থাপনা বিষয়টি বিশ্বব্যাপী অনেক বেশী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। কেননা দুর্যোগকে একেবারে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হল দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানো। এজন্য দরকার গণসচেতনতা এবং সরকারি সুষ্ঠ নীতিমালা। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে একটি মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে অধিদপ্তর, দপ্তর। এ কথা দিবালোকের মত সত্যি যে, কেবল সরকারি পৃষ্টপোষকতা কিংবা নীতিমালা দ্বারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয় এর জন্য দরকার ব্যাপক গণসচেতনতা। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এ্যাক্ট তৈরী হলেও এ এ্যাক্ট মানা হয় অতি সামান্যই। আর সে জন্যই গুজরাটের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর আমাদের টনক নড়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার তিনটি পর্যায় রয়েছে। যথা ঃ ১। দুর্যোগ পূর্ব পর্যায়; ২। দুর্যোগকালীন পর্যায়; এবং ৩। দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায় ।

১। দুর্যোগ পূর্ব পর্যায়

এটি এমন একটি সময় যখন দুর্যোগের তাৎক্ষণিক কোন বিপদের আশংকা না থাকলেও ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ফলাফল অনুমান করে দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

দুর্যোগ পূর্ব পর্যায় কার্যক্রম সমূহ

ক) প্রস্তুতি ও মহড়া (প্রস্তুতি চার রকমের হতে পারে শারীরিক, মানসিক, সাংগঠনিক এবং আর্থিক)

খ) সতর্ক সংকেত ও বিপদ সংকেত প্রচার (বাংলাদেশে ঝড়ের জন্য সামুদ্রিক এবং নদী বন্দরে যথাক্রমে ১১টি ও ৪টি সতর্ক সংকেত ব্যবহার করা হয়। এ সংকেত গুলো হুশিয়ারী সংকেত, সতর্ক সংকেত, বিপদ সংকেত এবং মহাবিপদ সংকেত নামে পরিচিত)।

গ) জীবন ধারণের উপকরণ সুরক্ষিত করণ/মজুদকরণ (যেমন হাইপ্রোটিন বিস্কুট, চিড়া, গুড়, কেরোসিন, মোমবাতি, শাড়ি, লূঙ্গি, শিশুদের পোষাক, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ব্লিচিং পাউডার, ফিটকিরি, কম্বল, পলিথিনের আচ্ছাদন, খাবার স্যালাইন, তাবু, প্লাষ্টিকের বালতি ইত্যাদি)।

ঘ) অপসারণ, আশ্রয়গ্রহণ

ঙ) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহ (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন) সক্রিয়করণ ইত্যাদি

২। দুর্যোগকালীন পর্যায়

কোন স্থানে দুর্যোগ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং এর তান্ডবলীলা এখনও বিরাজমান, দুর্যোগের এ অবস্থাকে বলা হয় দুর্যোকালীন পর্যায়। এ সময় দুর্গত জনগণ, গবাদীপশু ইত্যাদি খুবই অসহায়ত্ব বোধ করে।

দুর্যোগ কালীন পর্যায় কার্যক্রম সমূহ

ক) চুরি ডাকাতি বোধ করণ; খ) ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ; গ) জরুরী ঔষধ পত্র সরবরাহ; ঘ) মৃতদেহ সৎকার; ঙ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ইত্যাদি

৩। দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়

কোন স্থানে দুর্যোগ শেষ হওয়ার পর যে অবস্থা তাকে দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা বা পর্যায় বলে। এ পর্যায়ে দুর্গত জনগণ পুনরায় বাঁচবার এবং জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এ সময়ে দুর্গত জনগণের খাদ্যাভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায় কার্যক্রম সমূহ

ক) প্রাথমিক চিকিৎসা; খ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ; গ) আর্থিক সহায়তা বা ঋণ বিতরণ; ঘ) রেশন বিতরণ (যেমন চাল, ডাল, লবণ, আটা, তেল ইত্যাদি স্বল্পমূল্যে বিতরণ); ঘ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি ।

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজটি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা (NGO) উভয় পর্যায়েই পরিচালিত হচ্ছে। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোকে দুই ভাবে দেখানো যেতে পারে যেমন ঃ

১। সরকারি অবকাঠামো এবং ২। বেসরকারি সংস্থা বা NGO অবকাঠামো

১। সরকারি অবকাঠামো

বলতে গেলে মাত্র এক দশক আগেও সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট চিন্তা ভাবনা ছিলনা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ১৯৪১ সালের 'ফ্যামিন কোড,' ষাটের দশকের 'সাইক্লোন কোড' এবং সত্তর এর দশকের 'স্ট্যান্ডিং অর্ডার' ছাড়া তেমন কিছু নেই। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সবগুলো বিষয়ে যেমন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো, দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা, দুর্যোগ প্রস্তুতির প্রয়োগ পদ্ধতির উপর সরকার সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকার দুর্যোগ প্রশমন ও ব্যবস্থাপনার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। এ আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । প্রথমত ঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো এবং দ্বিতীয়ত ঃ মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো ।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো

প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় বলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এখন আমাদের দেশে জাতীয় গুরুত্ব পেয়েছে। এ জন্য সরকার জাতীয় ভাবে গঠন করেছে বিভিন্ন শক্তিশালী কাউন্সিল, সমন্বয় কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, টাস্কফোর্স ইত্যাদি। এগুলোর ওপর এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ

ক) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কাউন্সিলের সভাপতি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব গণ সদস্য হিসেবে এই কাউন্সিলে কাজ করে থাকেন। এই কাউন্সিলের প্রধান প্রধান কাজ হলো দুর্যোগ সংক্রান্ত পলিসি নির্ধারণ, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ইত্যাদি।

খ) আন্তঃ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, সশস্ত্র বাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এর মহাপরিচালকবৃন্দ এ কমিটির সদস্য। এই কমিটির প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিক সময়ে ও দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধান, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নীতি সমূহের বাস্তবায়ন, কাউন্সিলকে যথাযথ পরামর্শ দান ইত্যাদি।

গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই এ কমিটির সভাপতি মনোনীত করে থাকেন। দুর্যোগ প্রবণ এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও সাহায্যদাতা সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত থাকেন। এছাড়া কৃষি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এর চেয়ারম্যান, রেডক্রিসেন্ট ও

চেম্বার অব কমার্স এর চেয়ারম্যান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ এ কমিটির সদস্য থাকবেন। এ কিমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এর মহাপরিচালক। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়াই এ কমিটির প্রধান কাজ।

এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে রয়েছে প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড, গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়কারী গ্রুপ, ইত্যাদি।

মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো

জাতীয়ভাবে গঠিত কাউন্সিল, সমন্বয় কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি টাস্কফোর্সকে আরও শক্তিশালী এবং ফলপ্রসূ করবার জন্য সরকার মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর প্রতি বেশ যত্নবান। । মাঠ পর্যায়ে গঠন করা হয়েছে জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন কমিটি।

ক) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এ কমিটির সভাপতি হয়ে থাকেন। সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি এ কমিটির সদস্য। এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন জেলার সকল সংসদ সদস্য এবং সদস্য সচিব হিসেবে আছেন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা। এ কমিটির প্রধান কাজ হলো উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করণ, গণসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

খ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ সংশ্লিষ্ট উপজেলার ইউএনও এ কমিটির সভাপতি। সংশ্লিষ্ট থানার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, থানায় কর্মরত সকল সরকারি আধাসরকারি কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা এ কমিটির সদস্য। ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও পরামর্শ দান, গণসচেতনতা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা ইত্যাদি এ কমিটির প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

গ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ এ কমিটির সভাপতি হলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। ইউপি সসদ্যবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধি, স্থানীয় সমাজ সেবা সংগঠনের কর্মকর্তাগণ এ কমিটির সদস্য। দুর্যোগ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ, বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এ কমিটির প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২। বেসরকারি সংস্থা বা (NGO) অবকাঠামো

বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলা করার জন্য বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ

(এডাব), বাংলাদেশ ডিজেষ্টার প্রিপিয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি), ডিজেষ্টার রিসোর্স ইউনিট (ডিআরইউ), ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারী সার্ভিসেস (আইভিএস), অক্সফাম, কমিউনিকা, সাউথ এশিয়ান ডিজেষ্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (এসএডিএমসি) উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়াও ব্র্যাক, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, কনসার্ণ, কারিতাস, সিসিডিবি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালনা করে থাকে প্রতি বছর। কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের বাইরেও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (NGO) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে । বেসরকারী সংস্থা ছাড়াও দুর্যোগকালীন সময়ে এবং দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দল প্রায়শঃ দুর্গতদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা

আবহমান কাল থেকে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কমবেশী প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ কম নয়। অতীতকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কেবল দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমকে গুরত্বের সাথে বিবেচনা করা হতো। সে সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কেবল দুর্গতদের উদ্ধার, দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, জরুরী ঔষধপত্র সরবরাহ এবং দুর্গতদের পুনর্বাসনকে বুঝানো হতো। এর ফলে জনসাধারণের ক্ষয়ক্ষতি যতটুকু হওয়ার তা হয়েই যেত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধ্যান ধারণার পরিবর্তন অতি সম্প্রতি আমাদের দেশেও পরিলক্ষিত হচ্ছে, তবে তা আধুনিক বিশ্বের তুলনায় অপ্রতুল। স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতার অভাব থাকায় সরকারি পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত, দুর্গতদের উদ্ধার, ত্রাণ সামগ্রীর সুষ্ঠু বিতরণ, দুর্গত এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যবস্থায় প্রায়ই অনিয়ম এর কথা শোনা যায়। এ জন্য দরকার যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সুষ্ঠু জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কোনভাবেই বন্ধ করা যাবেনা। এ দেশের অবস্থানগত কারণে যে কোন সময়ে আকস্মিকভাবে যে কোন দুর্যোগ আঘাত হানতে পারে। সরকার এ কারণে দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। সরকার দুর্যোগ প্রশমনের জন্য নিজস্ব ও বিদেশী অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১৮৪১টি ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও ২০০টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এ ছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় বেড়ীবাঁধ তৈরী করা হয়েছে। ইউএনডিপি এবং ইউনিসেফ এর সহায়তায় সরকার ইতোমধ্যে দুর্যোগ প্রশমনের জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। এ ছাড়া ও ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত পদ্ধতির উন্নয়ন, দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

এখন প্রয়োজন ক্রমাগত গণসচেতনতা বৃদ্ধি। এ লক্ষ্যে সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি এনজিও প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে যে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। যাতে করে যে কোন দুর্যোগ সফলভাবে মোকাবেলা করা এবং এর দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়।

তথ্য নির্দেশিকা

Abbas, B.M.A.T.(1989). Flood Management in Bangladesh, Flood in Bangladesh, Dhaka: Community Development Library.

Anwar, J. (1991). Coastal Hazards, Bangladesh : the Bangladesh Observer, 22 May.

Asaduzzaman, M. (1991). "The Climate Change in Bangladesh and their Impact" : A Country Report presented at the Asian-Pacific Seminar on Climate Change, Nagoya, Japan, 23-26 January.

Asian Development Bank (1991). Disaster Mitigation in Asia and the pacific, Manila:ADB.

Bari, Fazlul. Kamaluddin Ahmed and Begum Nurun Nahar (1994). Disaster Preparedness and Management-SAARC Workshop Report, Comilla: BARD.

BWDB (1987). Flood in Bangladesh, Dhaka.

Carter, W. Nick (1991). Disaster Management: A disaster Manager's Hand book, Manila: ADB.

Chowdhury, A. M. (1989). "Tropical Cyclones in the Bay of Bengal" Paper presented at the Disaster Management Training Programme, Dhaka: IBA, 21 July.

Government of Bangladesh (1991). Environmental Issues and Management Plan, Pertinent to the Cyclone and Storm surges of April, 1991, Dhaka: Ministry of Environment and Forest.

Government of Bangladesh (1999). Standing Orders on Disaster, Dhaka: Ministry of Disaster Management and Relief, Disaster Management Bureau.

Government of Bangladesh (1997). Fifty Five Year Plan 1997-2002, Dhaka: Planning Commission.

Matin, M. A. (1987). Some Aspects of Flood 1987, Dhaka: Institution of Engineers.

Matin, M. A. and Hossain, A. (1988). Hydrological Aspects of 1988 Flood. Dhaka: Institution of Engineers.

আহমেদ, রফিক (১৯৮২)। জলবায়ু বিজ্ঞান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

চৌধুরী, সি, ই, (১৯৮৮)। আর্থনীতিক ভূগোলঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রহমান, মোঃ সাইদুর (১৯৯৩)। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়িকা, ঢাকাঃ প্যাকট বাংলাদেশ।

হোসেন, আফতাব (১৯৯২)। পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

মির্জা, এম মনিরুল কাদের ও পাল সুব্রত (১৯৯২)। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাংলাদেশের পরিবেশ, ঢাকা ঃ সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ঃ বাস্তবতা ও বাস্তবায়ন

মেহেদী মাসুদ*

Abstract

Affairs of Chittagong Hill Tracts (CHT) occupies an important place in our national politics. Even after four years of the signing of the Peace Accord real peace, one has to admit, is yet to be achieved. There has arisen a lot of controversy in terms of the implementation of the Peace Accord. The peace process in the Hills may run into trouble if the Accord is not implemented properly. Because of the gathering storms on the Hills, political analysts already have started saying, is CHT Peace Accord the end of the conflict or the beginning of a tragedy ? The Parbatya Chattogram Jana Sanghati Samiti (PCJSS) is also doubtful of the hesitant course of the peace implementation which is evident in the special booklet published by them to commemorate the fourth year of the signing of the Accord. In this booklet the unimplemented issues are mentioned. Against this backdrop this paper examines the realities and prospects for implementing the peace Accord in Chittagong Hill Tracts.

ভূমিকা

জাতিগত বিরোধ স্নায়ু যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে যা বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি স্বরূপ । বিশ্বব্যাপী জাতিগত বিরোধের এই ব্যাপকতার কারণে বোধকরি আমরা এই পর্যবেক্ষণটি করতে পারি যে স্নায়ুযুদ্ধ বিশ্বশান্তির প্রতি যেরূপ হুমকির কারণ ছিল বর্তমানে জাতিগত বিরোধ সেরূপ হুমকি হিসেবে বিরাজ করছে । এই প্রসংগে অধ্যাপক Hurst Hannum এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ "Ethnic conflict has replaced the cold war as the primary interest of political and military theorists, and even conflicts that may be primarily political or economical in nature are frequently given an ethnic cast. Such conflicts pose substantial threats to international peace and human life"।[১] বিশ্বময় জাতিগত অশান্তির এই পরিব্যাপন আমাদের ক্রমাগত শংকিত করে তোলে। কেননা বিশ্বের মাত্র ২০টি রাষ্ট্রের জনগণ তুলনামূলকভাবে সমপ্রকৃতি সম্পন্ন। প্রতিবেশী ভারতেই প্রায় ৩৫০টি জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় । নাইজেরিয়াতেও আনুমানিক ৪৫০টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান রয়েছে । আমাদের বাংলাদেশেও কমপক্ষে ৩৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা রয়েছে । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত এই জাতিসত্ত্বাগুলো আবার পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ - এই মেয়াদ কালে বিশ্বে মোট ৮২টি সংঘর্ষ/যুদ্ধ সংঘটিত হয় । তন্মধ্যে ৭৯টি সংঘর্ষ/যুদ্ধের কারণই ছিল জাতিগত অশান্তি[২]।

---

* মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

১. Hurst Hannum (1998), "The Specter of Secession: Responding to claims for Ethnic Self-Determination, Foreign Affairs, Vol. 77, March/April.

২. Anwar Husain, Syed (1999), "War and peace in the Chittagong Hill Tracts. Retrospect and Propect, Dhaka.

বর্তমান নিবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি ক্ষুদ্র পটভূমিসহ বিভিন্ন সরকারের আমলে এই সমস্যা নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে চুক্তির কার্যকারিতা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সরকারের উদ্যোগ

স্বাধীনতার জন্ম লগ্ন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট বহন করে আসছিল। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের ২৪২ নং ধারাটি বাতিল করা হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকারকৃত ১৯০০ সালের হিল ট্রাক্টস রেগুলেশনের আওতায় যে বিশেষ অধিকারের মর্যাদা পার্বত্য চট্টগ্রাম ভোগ করত তা সম্পূর্ণভাবে রদ হয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘুদের অধিকার বঞ্চনার অধ্যায় তখন থেকেই শুরু হয়। ১৯৫৭ সনে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে প্রায় ১ লক্ষ উপজাতি আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। ৫৪ হাজার একর জমি জলের নীচে তলিয়ে যায়। তদানীন্তন সরকার ক্ষতিগ্রস্ত চাকমাদের জন্য যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। ফলে উপজাতীয়রা খুব ক্ষুব্ধ হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে উপজাতীয়দের বাঙ্গালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হলে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু দাবি দাওয়া পেশ করেন ঃ ১) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ২) ১৯০০ সনের হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন বহাল করা ৩) ১৯০০ সনের রেগুলেশনের ধারা পরিবর্তন না করার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ৪)পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-পাহাড়ীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।[৩] কিন্তু এই দাবীগুলো প্রত্যাখ্যাত হলে উপজাতীয় জন-গোষ্ঠী ধীরে ধীরে সহিংসতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জন সংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) নামে একটি দল আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৩ সনের ৭ই জানুয়ারী এই দলেরই সশস্ত্র শাখা শান্তি বাহিনী গঠিত হয়। শান্তিবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত প্রথম অপারেশনটি পরিচালিত হয় ১৯৭৫ সনের প্রথমার্ধে। রাঙ্গামাটি শহর হতে ১২ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত শুভলং এ একটি পুলিশ পেট্রোল টিমের উপর সেই সময় শান্তি বাহিনী হামলা চালায়।[৪] শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হতে থাকে। ১৯৭৩ সনে তিনি রাঙ্গামাটিতে এক নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নিঃশর্তভাবে পাহাড়ী জনগণের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলেন।

পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন। প্রাথমিকভাবে এই উদ্যোগগুলোর বেশীর ভাগই ছিল অর্থনৈতিক। চিটগাং হিল ট্রাক্টস ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সনের জানুয়ারী মাসে।

---

৩. Murtaza Ali, Syed (1996) The Hitch in the Hills CHT Diary.

৪. Anwar Hussain, Syed (1999) Ibid.

এছাড়া ১৯৭৯ সনে একটি Multisectoral Development Programme এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয় । এই কর্মসূচির জন্য প্রাথমিক বরাদ্দ ছিল ৬,২৪২.৬৬ লক্ষ টাকা । ১৯৯২ সনে এই বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩,৭৬৬.৩৮ লক্ষ টাকা । ১৯৭৬ এর অর্ডিন্যান্স এর নং LXXII অনুযায়ী বোর্ডের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(১) স্থায়ী ভিত্তিতে ভূমিহীন জুম পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

(২) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ ও অন্যান্য সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করা;

(৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়ক সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা;

(৪) আয়মূলক কর্মকান্ডের জন্য জনগণের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা;

(৫) পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের জন্য সামাজিক সংগঠন স্থাপন করা । পাশাপাশি দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা;

(৬) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য সাহায্য প্রদান;

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হোস্টেল নির্মাণ ও উচ্চশিক্ষা উৎসাহিত করতে ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা ।

১৯৭৬ সনে বোর্ড যৌথ খামার প্রকল্প নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল জুমচাষী ও অন্যান্য ভূমিহীন পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ভূমিহীন পরিবারগুলোর প্রত্যেকটি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় ৫ একর করে জমি পায় কৃষিকাজের জন্য । আশা করা হয়েছিল আগামী তিন বছরের মধ্যে তাঁরা চাষাবাদ ও কৃষিজাত পণ্যের বিপণনের মাধ্যমে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করবে। এ ধরনের মোট আটটি যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ।

১৯৭৭ সনে উপজাতি সম্মেলন নামে একটি রাজনৈতিক ফোরাম গঠিত হয় । শুরুতেই এই সম্মেলনের মাধ্যমে সরকার জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সফল হন । জনসংহতি সমিতিও এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে । কিন্তু পরবর্তী কালে জনসংহতি সমিতি অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে এই সংলাপ থেকে পিছিয়ে আসে । ১৯৭৯-৮১ সালে সরকার সমতলের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন বাঙ্গালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করার প্রচেষ্টা চালায় । এটি ছিল একটি বিতর্কিত উদ্যোগ।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলে উপজাতীয়দের জন্য সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫% কোটা প্রবর্তন করা হয় । অধিকন্তু, এই ৫% কোটার বাইরেও অতিরিক্ত ১,৮৭৭ টি পদ উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত করা হয় ১৯৮৮ সনে । এসবই করা হয় আলোচনার টেবিলে জন সংহতি সমিতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য । ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সন পর্যন্ত মোট ৬ বার জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই সব বৈঠকের প্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সনে তিন পার্বত্য জেলায়

স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। এর আগে ১৯৮৪-১৯৮৫ অর্থ বছরে একটি বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তিন পার্বত্য জেলার জন্য ।

এরশাদ সরকারের আমলে মোট চারবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয় । এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় এপ্রিল, ১৯৮৩ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ পর্যন্ত মোট ২,২৯৪ জন বিদ্রোহী উপজাতীয় আত্মসমর্পন করে । এতসবের পরেও সার্বিক চিত্র খুব একটা আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠতে পারেনি ভারতীয় সরকারের অসহযোগিতার কারণে । এরশাদ সরকারের সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৯৮৫ সনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করা । এর আওতায় নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করা হয় ঃ

(১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য কর মওকুফ ;
(২) মূলধনী যন্ত্রাংশের আমদানীর জন্য ফি প্রত্যাহার ;
(৩) কোন প্রকল্প চালু হওয়ার পর মাত্র ৫% হারে ১০ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের সুবিধা ;
(৪) বিদ্যুৎ/গ্যাসের হ্রাসকৃত মূল্য ;
(৫) ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে সুদের হার ৫% হ্রাস করা ;
(৬) উপজাতি ও অ-উপজাতিদের যৌথ কারবারে উৎসাহিত করা ;
(৭) ১২ বছরের জন্য কর অবকাশ ; ও
(৮) প্রদর্শনী কেন্দ্রগুলোর জন্য শুল্ক ও প্রমোদ কর প্রত্যাহার ।

পাশাপাশি এ সময় রাজনৈতিক সমঝোতার প্রচেষ্টাও নেয়া হয়।১৯৮২ সনে উপেন্দ্র লাল চাকমাকে প্রধান করে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয় এই লক্ষ্যে । কিন্তু জনসংহতি সমিতি এই কমিটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ইতোমধ্যে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে নিহত হলে সরকারের পুরো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় । পরবর্তীতে আগষ্ট, ১৯৮৩ সনে উপজাতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয় । ১৯৮৫ সনের অক্টোবর মাসে সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির বৈঠক হয় । এই বৈঠকে কোন অগ্রগতি হয়নি । ১৯৮৭ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠিত হয় । একই বছরের ১৭-১৮ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের দ্বিতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় । সমিতি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন সহ পাঁচ দফা দাবী এই বৈঠকে পেশ করে যা তদানীন্তন সরকার সংবিধান সম্মত নয় বলে জানান । সরকার ১৯৮৮ সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে পর পর দুইটি বৈঠক করেন জনসংহতি সমিতির সাথে । পঞ্চম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের জুন মাসে। আগের মতই এই বৈঠকটিও ছিল নিস্ফলা। এমতাবস্থায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নয় দফা সুপারিশ পেশ করে। এই নয় দফা সুপারিশ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা সমর্থিত ছিল। ১৯৮৮ সনের ২৯ শে আগষ্ট থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত তিনটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় কমিটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈঠক করেন। মোট ৪৯ জন উপজাতীয় নেতা এই বৈঠকসমূহে উপস্থিত ছিলেন।

ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় । সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ অন্যান্য উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা করে। ফলে সমিতি ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে ষষ্ঠ বৈঠক আয়োজনে রাজি হয় । এই বৈঠকে সমিতি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের বদলে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করে । কিন্ত অন্যান্য দাবীগুলো অপরিবর্তিত থাকে। সরকারপক্ষও তাঁর নয় দফা সুপারিশ গ্রহণ করার জন্য সমিতিকে অনুরোধ জানায় । প্রাথমিকভাবে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে উপেন্দ্র লাল চাকমা, আহবায়ক, লিয়াজো কমিটির অনুরোধে সমিতি এটা ভেবে দেখবে বলে জানায় । সপ্তম বৈঠকটি সমিতির অসহযোগিতার কারণে হতে পারেনি । সমিতির নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে কোনরূপ সাড়া না পেয়ে সরকার ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলায় স্হানীয় সরকার পরিষদ গঠন করে । এই পর্যায়ে শান্তি বাহিনী হুমকি প্রদান করে যে এই পরিষদ সমূহ বাতিল করা না হলে তারা আলোচনায় বসবেন না । সরকার তাদের এই দাবী মেনে না নিলে পরিস্হিতি আরো অশান্ত হয়ে উঠে । হানাহানি ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে ।

১৯৯০ এর গণ **আত্মসমর্পণ** এরশাদের পতনের পর বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হন । এই সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন । সেই সাথে এটাও ঘোষণা করা হয় যে শান্তিবাহিনী সদস্য যারা অস্ত্রসমেত আত্মসমর্পট করবেন তাঁদের জন্য নগদ অর্থ প্রদানের বিধান থাকবে । এই বরাদ্দটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রতিটি এল,এম,জি	ঃ টাকা	৩০,০০০.০০
প্রতিটি মর্টার	ঃ টাকা	৩০,০০০.০০
প্রতিটি এস,এম,জি	ঃ টাকা	২৫,০০০.০০
প্রতিটি এস,এম,সি	ঃ টাকা	২২,০০০.০০
প্রতিটি সেমি অটোরাইফেল	ঃ টাকা	২০,০০০.০০
প্রতিটি রকেট লাঞ্চার	ঃ টাকা	২০,০০০.০০
প্রতিটি রাইফেল (বোল্ট অ্যাকশন)	ঃ টাকা	১২,০০০.০০
প্রতিটি পিস্তল/রিভলভার	ঃ টাকা	৭,০০০.০০
প্রতিটি ওয়্যারলেস সেট	ঃ টাকা	১০,০০০.০০ থেকে ২০,০০০.০০
প্রতিটি গ্রেনেড	ঃ টাকা	১,০০০.০০
প্রতিটি এক্সপ্লোসিভ (এক পাউন্ড)	ঃ টাকা	৫,০০.০০
প্রতিটি বুলেট	ঃ টাকা	৫.০০
প্রতিটি কার্ট্রিজ	ঃ টাকা	৫.০০

এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় মোট ৪২ জন শান্তি বাহিনী সদস্য আত্মসমর্পণ করেন । তন্মধ্যে ২৪ জন সশস্ত্র ছিলেন ।

বেগম খালেদা জিয়া পার্বত্য সমস্যা সমাধানে একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেন । ১৯৯৩ সালে এই কমিটি শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনা শুরু করে। এসবের প্রেক্ষিতে প্রায় ৫ হাজার উদ্বাস্তু দেশে ফিরে আসে ।

১৯৯০-৯২ সালে মোট ১২,০০০ উপজাতি পরিবার পুনর্বাসিত হয় । এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫৩১১.০৮৫ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য ও ৬৪.৮০ লক্ষ টাকা । প্রতিটি পরিবার এর আওতায় এককালীন ১৬,০০০.০০ টাকা ও প্রতি সপ্তাহে ২১ কেজি হারে খাদ্য শস্য পেয়েছে ছয় মাস পর্যন্ত।[৫]

এই সব কর্মসূচি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চাকমা শরণার্থী এসময় ভারত থেকে ফিরে আসে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ডিসেম্বর, ১৯৯১ ও জানুয়ারী, ১৯৯২ সালে ভারত থেকে ফিরে আসা চাকমা শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ১,০৩৪ জন । পক্ষান্তরে নভেম্বর, ১৯৯১ সনে ভারত ফেরত শরণার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ জন । সুতরাং সার্বিক চিত্র আশাব্যঞ্জক ছিল । ১০ই আগষ্ট, ১৯৯২ সনে জনসংহতি সমিতি একতরফা অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করলে পরিস্থিতি আরো ভালো হতে থাকে ।

কর্ণেল অলি আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত সংসদীয় কমিটি মোট ৭ বার জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠক করে। ১৯৯৪ সনের মধ্যভাগে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার (বাংলাদেশ, জনসংহতি সমিতি ও ভারত) মাধ্যমে উপজাতি শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সফল ভাবে শুরু হলেও, তা ১৯৯৫ এর প্রথম অর্ধে আকস্মিক ভাবে থেমে যায় ।

১৯৯৬ সনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয় । পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারেই ছিল । ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ কে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয় । জন সংহতি সমিতির সাথে জাতীয় কমিটি মোট ৭টি বৈঠকে মিলিত হয় । এর মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম বৈঠকটি খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয় । বাদবাকী ৬টি বৈঠকই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় । পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যতগুলি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সবগুলিই পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে । ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠানের সম্মতি প্রদান এটাই প্রমাণ করে যে শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি জন সংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ অনেক বেশী আস্থাবান । আর এই আস্থার প্রতিফলন ঘটে ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ।

চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ

১। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ঃ দেশের সংবিধানের আওতায় ভূ-খন্ডগত ঐক্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হয় ।

---

৫. Anwar Hussain, Syed (1999) Ibid, Page-55.

চুক্তির সূচনায় বলা হয় " .....সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন .....।" সাধারণভাবে বলা যায় যে শান্তি চুক্তিটি হল পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের দাবী-দাওয়ার নিরিখে সংবিধানের আওতায় একটি রূপরেখা । আর এই রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ।

২। পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই তিন জেলার সমন্বয়ে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে । পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা (উপজাতি ও অ-উপজাতি) হল ২২ জন । পরিষদের একজন চেয়ারম্যান থাকবেন এবং তিনি জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন । তিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন এবং তিনি অবশাই একজন উপজাতি হবেন । এ ছাড়া উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ) থাকবেন ১২জন ; উপজাতীয় সদস্য (মহিলা) ২ জন ; অ-উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ) ৬জন ও অ-উপজাতীয় সদস্য (মহিলা) থাকবেন ১জন। জেলা পরিষদের সদস্যগণও পদাধিকার বলে সদস্য হবেন ।

নির্বাচন ঃ পরিষদের সকল সদস্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন । তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবেন ও ভোট প্রদান করতে পারবেন। আঞ্চলিক পরিষদে সরকারের যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন । একজন উপজাতীয় কর্মকর্তাকে এই পদে অগ্রাধিকার দেয়া হবে ।

পরিষদের কার্যাবলীঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ পরিচালিত সকল কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে এই আঞ্চলিক পরিষদ । পরিষদ জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করবে । সংরক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুত প্রকল্প, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্প কারখানা ও সরকারের অধিকারে থাকা ভূমি - এই সবের উপরে পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবেনা । পরিষদ করারোপ, টোল সংগ্রহ ও বিভিন্ন প্রকার ফি নির্ধারণ ও তা আদায় করার ক্ষমতা ভোগ করবে । পরিষদ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার উর্দ্ধে নয় এমন নিয়োগ দান করতে পারবেন। এই সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হবে । স্হানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রভৃতিও পরিষদের কার্যাবলীর **অন্তর্ভুক্ত** । উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচারকার্য পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় থাকবে । এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত **মন্ত্রী হবেন একজন উপজাতি** । **জমি জমা**

সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন করা হবে।

৩। পুনর্বাসন ও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ঃ চুক্তির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পুনর্বাসন ও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন। চুক্তি অনুযায়ী যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করবে ও গোলা-বারুদ জমা দেবে তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে। এই লক্ষ্যে জন সংহতি সমিতি চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে তাদের ক্যাডারদের নামের তালিকা ও গোলা-বারুদের তালিকা সরকারের নিকট পেশ করবে। যে সব শান্তি বাহিনী সদস্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আত্মসমর্পণকারী/ প্রত্যাবর্তনকারী সদস্যদের জন্য সরকার পরিবার পিছু এককালীন ৫০ হাজার টাকা প্রদান করবে। সরকারও পর্যায়ক্রমে ছয়টি সেনানিবাস ছাড়া অন্য সকল সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার করে নিবে। এ ছাড়া সরকার যেসব উপজাতির কোন জমি নাই সে সব উপজাতীয় পরিবারকে পরিবার প্রতি ২ একর জমি প্রদান করবে।

চুক্তি মূল্যায়ন

জনগণ শান্তিকামী। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে শান্তি-সমৃদ্ধির একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত কোন জাতি সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করতে পারেনা। যুদ্ধের কারণেই প্রাচীন সভ্যতাগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চগুলো Truce of God বা ঈশ্বর-নির্দেশিত যুদ্ধ বিরতি নামে এক প্রথা জারী করে সামন্ত প্রভূদের মধ্যকার যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করত। ১৬৪৮ সালে স্বাক্ষরিত ওয়েস্টফ্যালিয়া শান্তিচুক্তি অনুযায়ী ইউরোপে ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষের কারণে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাও যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে। জেরেমী বেন্থাম, ইমানুয়েল কান্ট, হুগো গ্রোটিয়াস, ওপেনহেইম প্রমুখ দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণেতাগণ শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা বলেন। আধুনিক কালেও জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত Peace-keeping, peace-making প্রভৃতি কর্মসূচি শান্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। International Confidence Building Measures (ICBM) শান্তি স্থাপনের প্রাথমিক করণীয় হিসেবে ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। যুদ্ধ বিরোধী সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও শান্তি আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ১৯৮৩ সনে ইউরোপের শান্তি আন্দোলন ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় রূপে চিহ্নিত হবে।

সভ্য বিশ্বের সর্বত্রই দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে প্রতিনিয়ত নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। সংহতির বীজ মন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে উন্নত দেশসমূহ এগিয়ে চলছে। এই জাতীয় সংহতির প্রতিফলন রূপেই ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ এ স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ অঞ্চলরূপে স্বীকৃতি পেল। সংবিধান এর ধারা ৯ এ বলা হয়েছে "The state shall encourage local government institution composed of representatives of the areas concerned." সংবিধানের ২৮(৪) নং ধারায় বলা হয়েছে Nothing in this article shall prevent the State from making special provision in favour of women or children or for the advancement or any back ward section of citizen".

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ক, খ, গ ও ঘ এই চারটি ভাগে বিভক্ত। ক ভাগের ৪ নং বিধি অনুযায়ী এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হতে সম্পাদিত ও সই করার তারিখ হতে বলবত হবে। বলবত হওয়ার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ যা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবত থাকবে। চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ এর আগে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ কার্যকর ছিল। পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর বিভিন্ন ধারা সমূহের পরিবর্তন, সংশোধন, অবলোপন ও সংযোজনের বিষয়ে এক মত হয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোন আইনের পরিবর্তন, সংশোধন, অবলোপন ও সংযোজন করা নতুন কোন আইন প্রণয়নের শামিল। আমরা জানি সংবিধানের ৮০ নং ধারানুযায়ী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের। চুক্তিটি যেহেতু জনগুরুত্বপূর্ণ সেহেতু এটা সংসদে আনা উচিত ছিল।

চুক্তির খ-অংশের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানটি সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করেছে। কেননা চুক্তির এই অনুচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তরের জন্য পরিষদের পূর্ব সম্মতিকে শর্ত হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ সংবিধানের ১৪৩ নং ধারানুযায়ী আইন সঙ্গত ভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হবে ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্য সম্পন্ন সামগ্রী ও গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিক বিহীন যে কোন সম্পত্তি। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী বলা চলে পার্বত্যাঞ্চলে কোনরূপ জমি হস্তান্তর চলবেনা। অধিকন্তু, পার্বত্যাঞ্চলের সমুদয় ভূমি ও জমির অন্তঃস্থিত খনিজ সম্পদের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী হল পরিষদ।

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম অংশের ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি একক বা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র যেখানে প্রশাসন যন্ত্রের সকল অংশেই সরকারের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে। কিন্তু চুক্তির ফলে দেশের

একক ও এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটেছে। কেননা বাংলাদেশের ৬১ টি জেলা যে ভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে ৩টি পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে না । আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে এটা সরকারের সমান্তরালে কাজ করার ক্ষমতা সম্পন্ন ।

চুক্তির গ - অংশের ১৩ নং অনুচ্ছেদটিও সংবিধান সম্মত নয় । চুক্তির ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "সরকার পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ে আইন প্রয়োগ করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন ।" বিপরীতে সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে । সংবিধানের আওতায় পরিষদ কোন বিধি প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু সংবিধান কখনো কোন সংস্হার দ্বারস্হ হতে পারেনা আইন প্রণয়নের জন্য ।

চুক্তির ঘ - অংশে বর্ণিত আছে যে ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান করে একটি ভূমি কমিশন গঠন করা হবে । এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে ও এর বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবেনা । চুক্তির এই অংশটিও সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্হী। কেননা কমিশনের কোন না কোন সিদ্ধান্তে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লংঘিত হতে পারে । অধিকন্তু, সুপ্রীম কোর্টকে ডিঙ্গিয়ে কোন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারেনা ।

চুক্তির বাস্তবায়ন

কোন চুক্তিই শতভাগ ত্রুটিমুক্ত নয়। কোন পক্ষের পুরোপুরি সন্তুষ্টি সাধনও এই ধরনের শান্তি চুক্তিতে সম্ভব নয় । কেননা সমঝোতার ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের কোন স্হান নেই । মোদ্দা কথা হলো উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সহিংসতা ছেড়ে শান্তি উদ্যোগের প্রতি আস্হা প্রকাশ করেছে । যার প্রতিফলন ঘটেছে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে চারটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সে তুলনায় শ্লথ । ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বিল আকারে পাশ করার পর মুহূর্ত থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ তদানীন্তন আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে চুক্তি লংঘনের অভিযোগ করে আসছে । রূপায়ন দেওয়ান, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতি এই প্রসঙ্গে বলেন, " অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তি চুক্তিকে লংঘন করে ১২ই মার্চ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৪০টি সংশোধনী করে, পরিবর্তন করে অর্থাৎ চুক্তি অমান্য করে ওখানে (জাতীয় সংসদ) বিল উত্থাপন করা হয়েছিল।"[৬]

৬। দেওয়ান রূপায়ন (১৯৯৯) "সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বাস করে আমরা চুক্তি করেছি" মেসবাহ কামাল ও শারমিন মৃধা সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সঙ্কট ও সম্ভাবনা। ঢাকা: গভেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ।

চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজ চুক্তির মৌলিক শর্তগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে দেখা দিয়েছে শংকা। শান্তি চুক্তির অন্তত সাতটি মৌলিক শর্ত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগহীনতার ফলে স্থবির হয়ে আছে । এগুলো হলোঃ ১) পার্বত্যাঞ্চলের শুধুমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে একটি নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা ২) পাহাড় থেকে সেনাবাহিনী, আনসার ও ভিডিপির সব ধরনের অস্থায়ী ছাউনী গুটিয়ে নেয়া ৩) জটিল ভূমি সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশন গঠন ও পাহাড়ের জমির বিরোধ নিষ্পত্তি করা ৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী পুনর্বাসন ৫) পাহাড়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অভিবাসিত বাঙ্গালী সেটলারদের পার্বত্যাঞ্চলের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ৬) পার্বত্য জেলা পরিষদের দায়িত্বভুক্ত মোট ৩৩ টি বিষয় কার্যকর করা ও ৭) পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে কার্যকর করা ।[৭]

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চুক্তির যেসব শর্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, উন্নয়ন বোর্ডের চেয়াভম্যান পদে একজন উপজাতীয়কে নিয়োগ, ভারত থেকে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্কফোর্স গঠন, বহুমুখী উন্নয়নে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ, চাকরী ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের জন্য কোটা সংরক্ষণ, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও অস্ত্র জমাদানকারীদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা নগদ প্রদান ও মাসিক রেশন প্রদান, অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা ও মামলা প্রত্যাহার, সমিতির প্রত্যাগত সদস্য ও তাঁদের পরিবারভুক্ত ৭১ জনকে চাকরীতে পুনর্বহাল, সমিতির ৭০৫ জন সদস্যকে পুলিশের কনস্টেবল ও ১০ জনকে সার্জেন্ট পদে নিয়োগ দান, পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন বিভাগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমিতির সদস্যদের নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, নিরাপত্তা বাহিনীর ৭০টি ক্যাম্প প্রত্যাহার, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন ও একজন উপজাতীয় মন্ত্রী নিয়োগ ও উক্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন । উপর্যুক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় আবার পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয় নাই । সেগুলো হলো ঃ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা চূড়ান্তকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্যাকেজ সুবিধা প্রদান, পার্বত্য তিন জেলায় ভূমি জরীপের কাজ শুরু করে ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা ও ভূমিহীন পরিবারগুলোকে দুই একর করে জমি প্রদান, ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ঋন মওকুফের বাবস্থা করা, গত ১০ বছরে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় নাই এমন জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা, জনসংহতি সমিতির ঋঢ গ্রহণকারী সদস্যদের ঋণ মওকুফের বাবস্থা করা, সমিতির সদস্যদের আত্ম কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ প্রদান ।

৭। দৈনিক ভোরের কাগজ, ২/১২/২০০১

শান্তি চুক্তির মৌলিক শর্তগুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্যাঞ্চলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে । আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরাসরি সেনা হস্তক্ষেপ ঘটছে। " অপারেশন দাবানল " এর পর সেখানে শুরু হয়েছে " অপারেশন উত্তরণ " নামে নতুন সেনা অভিযান । প্রত্যাগত ৩০৫৫ টি শরণার্থী পরিবার অদ্যাবধি নিজেদের জায়গা জমি ফেরত পাননি । এ ছাড়া জনসংহতি সমিতির অভিযোগ, শান্তি চুক্তির বিরোধিতাকারী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) হামলায় এ পর্যন্ত সমিতির ৩৮ জন সদস্য ও সমর্থক নির্মম ভাবে খুন হয়েছেন । অন্যদিকে ইউপিডিএফ এর পাল্টা অভিযোগ, শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করায় গত চার বছরে সমিতি ও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থকদের হামলায় ইউপিডিএফ-এর খুন হয়েছেন ৬০ জন, কারাবন্দী রয়েছেন প্রায় ২০০ নেতা-কর্মী ।[৮]

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান - এই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচথ গত এক দশকেও না হওয়ায় এর প্রশাসনিক কার্যক্রম জনপ্রতিনিধিত্বশীল হয়ে ওঠেনি। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধি মালা ও কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়নে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গড়িমসির কারণে এ পরিষদটিও পুরোপুরি কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি । ফলে পার্বত্য জেলা সমূহে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন, স্হানীয় সংস্হা ইত্যাদির তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে ।

চুক্তি সম্পাদনের পর আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালে মাত্র চারটি বৈঠক করেছে । এরপর অর্থাৎ ১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০১ সালে আর কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি । তদানীন্তন সরকারের পক্ষ থেকে আরো উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া উচিত ছিল এই ক্ষেত্রে । চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে ঠান্ডা লড়াই শুরু হল এক পর্যায়ে।

তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল বিএনপি চুক্তি স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে কট্টর অবস্হান গ্রহণ করে । ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত লংমার্চ করে চুক্তি সম্পাদনের প্রতিবাদ জানিয়েছিল তারা । অবশ্য এখন তাঁরা সরকার গঠনের পর শান্তি চুক্তি ইস্যুতে আগের সেই অনড় অবস্হান থেকে সরে এসেছে বলে বিশ্লেষকগণের অভিমত । সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্হানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়া বলেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট শান্তি চুক্তি বাতিল করবেনা । তবে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে পুরো চুক্তিটি পর্যালোচনা করার পর এতে প্রয়োজনীয় কয়েকটি সংশোধনী আনা হবে । বিএনপি-র প্রাক নির্বাচনী ইশতেহারেও একই কথা বলা হয়েছে ।[৯]

পার্বত্য শান্তি চুক্তির চতুর্থ বর্ষ পূর্তি হলো গত ২রা ডিসেম্বর, ২০০১ সালে ।

৮। দৈনিক ভোরের কাগজ, প্রাগুক্ত।

৯। দৈনিক ভোরের কাগজ, প্রাগুক্ত।

চতুর্থ বর্ষ পূর্তিতে জনসংহতি সমিতি তাদের এক প্রকাশনায় বলেছে,শান্তি চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় আগের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে । দিন দিন এই পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক হচ্ছে । ব্যাহত হচ্ছে পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন । বেকার সমস্যা প্রকট হয়েছে, ভূমির বিরোধ বাড়ছে । এ ছাড়া চুক্তি লংঘন করে Settler-দের পাহাড়ের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভোটার তালিকাভুক্ত করায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে । জনসংহতি সমিতির এই দলীয় প্রকাশনাটিতে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় ।

চুক্তির বিভিন্ন বিষয় বর্তমানে খতিয়ে দেখছে আইন মন্ত্রণালয় । পার্বত্য চুক্তির বিভিন্ন ধারা সরকার বাস্তবায়ন করছেনা বলে অভিযোগ জানালেও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে আপাতত তাদের কোন সিদ্ধান্ত নেই । বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এডিবি, ডানিডা, ইউএসসএইডসহ বেশ কয়েকটি দাতা সংস্থা তাদের প্রতি চুক্তি সংশোধনের কোন উদ্যোগ না নেয়ার আহবান জানিয়েছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীর সাথে আলাপকালে আশংকা ব্যক্ত করে বলেছেন, এ উদ্যোগ আবারো পার্বত্যাঞ্চলে অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।[১০] সমিতির প্রধান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান সন্তু লারমা ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, চুক্তির ব্যাপারে তার কিছু বলার নেই। তিনি শুধু চান চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন ।[১১]

ইউএনডিপি, এডিবি, বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ প্রতিনিধিরা সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এ চুক্তির ভবিষ্যত নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। সরকার পার্বত্য চুক্তি বিষয়ে দাতাদের কথার প্রতি জোর দিয়েছে । যদি চুক্তি সংশোধন করা হয় তাহলে এ অঞ্চলের জন্য উন্নয়ন সাহায্য নাও আসতে পারে- এই আশঙ্কায় তারা আপাতত চুক্তি সংশোধন করছে না। তবে আইন মন্ত্রণালয় চুক্তির বিভিন্ন ধারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। চুক্তি সংশোধন করতে সরকার আরো সময় নিতে চায় বলেও জানা গেছে ।[১২]

উপসংহার ঃ

আমরা একথা জানি যে Majority must be the custodian of minority rights. সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের দায়-দায়িত্ব বহন করবে, নিশ্চিত করবে তাদের অধিকার । পাহাড়ী জনগণ বাংলাদেশেরই সন্তান । পাহাড়ী-বাঙ্গালী সম্প্রীতির ধারাটি ক্রমান্বয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠুক - এটা মনে রেখে নব নির্বাচিত বিএনপি সরকারের দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলা উচিত । জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

১০। দৈনিক ইত্তেফাক ০৪-০৪-২০০২।
১১। দৈনিক ইত্তেফাক প্রাগুক্ত।
১২। দৈনিক ইত্তেফাক প্রাগুক্ত।

রূপায়ণ দেওয়ান এই প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করেন, "আমাদের আন্দোলন বাংলাদেশে যে আন্দোলন তার মূল স্রোত ধারা থেকে কোন দিন বিচ্ছিন্ন ছিলনা । আমরা কোন দিন বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা করি নাই। আজকে আমি জনসংহতি সমিতির পক্ষে এই জিনিসটা অকপটে বলতে চাই, আমরা দেশেরই মানুষ। দেশের স্বার্থ আমাদের স্বার্থ । দেশের সন্তান হয়ে সুযোগ্য সন্তান হিসাবে আমরা দায়িত্ব পালন করতে চাই ।"[১৩]

দীর্ঘ প্রায় দুই দশকেরও বেশী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সেখানে সহিংসতার অবসান ও পাহাড়ী জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন নিশ্চিত করার একটি সোপান রচিত হয়েছিল । কিন্তু চুক্তির মূল শর্তগুলোর বাস্তবায়ন যথাযথ না হওয়ায় বিভ্রান্তি দেখা দেয় । পাহাড়ীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ চুক্তির বিরুদ্ধে চরম অবস্হান নিয়েছে । ফলে পরিস্হিতি দিন দিন জটিলতর হচ্ছে ।

স্যামুয়েল পি, হান্টিংটন তাঁর বিখ্যাত "The clash of civilization" নামক প্রবন্ধে একটি মৌলিক চিন্তা উপস্হাপন করেন, "এটা আমার বিশ্বাস যে নতুন এই পৃথিবীতে ভবিষ্যতের সংঘাত গুলো আদর্শ বা অর্থনীতির জন্য হবেনা, হবে সাংস্কৃতিক । মানুষে-মানুষে পার্থক্য ও সংঘাতের প্রধান কারণ হবে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা । জাতীয় রাষ্ট্রগুলো হয়তো আগামীতেও শক্তিশালী ভূমিকায় অবিচল থাকবে কিন্তু বিশ্ব রাজনীতিতে বিভিন্ন সভ্যতার উত্তরাধিকারী জাতিতে-জাতিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে সংঘাত সৃষ্টি হবে । আগামীতে সভ্যতার এই সংঘাতই বিশ্ব রাজনীতিতে প্রাধান্য পাবে । বিভিন্ন সভ্যতার পারস্পরিক পার্থক্যের রেখাগুলোই হবে আগামীর যুদ্ধ রেখা ।" পার্বত্য জনগোষ্ঠীর জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার-এ যাতে আঘাত না লাগে সে ব্যাপারে বাঙ্গালীদের সতর্ক ও সচেষ্ট হতে হবে । উন্নত বিশ্বেও আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণের নজির রয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল নগরীর নাম করণ করা হয়েছে একজন আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান চীফ Sealth এর নামানুসারে ।

পূর্বের আলোচনায় দেখেছি বর্তমান সরকারের স্হানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী শান্তি চুক্তির ব্যাপারে কথা বলেছেন ও চুক্তিটি পর্যালোচনা করা হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন । চুক্তি বাতিলের কথা তিনি বলেন নি ।বিশ্লেষকগণ আশা করছে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রশ্নে যেন কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা না দেয় সেটা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব । কেননা সরকারের মৌলিক কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন । পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি সকলের অভিন্ন স্বার্থ । এখানে আবার সন্ত্রাস ও হানাহানি-র প্রত্যাবর্তন কারো কাম্য নয় ।

১৩। কামাল মেসবাহ ও মৃধা শারমিন প্রাগুক্ত ।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ (১৯৯৭), বাংলাদেশ ১৯৯৬ ঃ রাজনীতি ও পররাষ্ট্র নীতি। ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী।

২। আহমদ এমাজউদ্দীন (১৯৯৮), শান্তি চুক্তি ও অন্যান্য প্রবন্ধ। ঢাকাঃ ইনফো পাবলিকেশনস।

৩। কামাল মেসবাহ ও মৃধা শারমিন (১৯৯৯) সম্পাদিত, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট সম্ভাবনা। ঢাকা ঃ গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ।

৪। চাকমা সুগত (১৯৯৩), পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি। রাঙ্গামাটি।

৫। দৈনিক ভোরের কাগজ, ২/১২/২০০১।

৬। Ali Murtaza, Syed (1996), THE HITCH IN THE HILLS CHT DIARY.

৭। AMENA MOHSIN (1997), THE POLITICS OF NATIONALISM The case of the Chittagong Hill Tracts. Dhaka: University Press Ltd.

৮। Anwar Husain, Syed (1986), Insurgency in the Chittagong Hill Tracts : Problem of Ethnic Minorities in Bangladesh : Asian Studies, Vol.4, No.1.

৯। Anwar Husain, Syed (1999), War and Peace in the Chittagoing Hill Tracts Retrospect and Prospect. Dhaka : Agamee Prakashani.

১০। Hurst Hannum (1998), The Specter of Secession : Responding to claims for Ethnic Self-Determination. Foreign Affairs, Vol.77, No.2.

১১। Martin O. Heisler (1977), Ethnic Conflict in the World Today, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.33.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যঃ তত্ত্ব এবং বাস্তবতা

খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব*

Foreign Trade of Bangladesh: Theory and Reality

Abstract

Bangladesh was mainly an import dependant country. The import trade fulfilled most of its development demand and necessary demand. Recently Bangladesh has emerged as an exporting country though its export earnings are still not enough even to cover the import payment. In this article the foreign trade structure of Bangladesh has been discussed in the light of the well-established trade theories. It is found that the country is exporting labour intensive goods and importing mainly capital-intensive goods. The major trade partner of the country and their share in export and import trade has also been highlighted in this article. In the last part of the article the recent problem of the export trade has been explained. According to the findings Bangladesh import more from its neighbors i.e. India, Singapore, Hong Kong and export more to EU and USA. It is found that the incidents of September 11, 2001 and the Afghan-US led force war have seriously affected the major exportables of the country. This matter has been discussed and in conclusion some recommendation and suggestions have been made to overcome the current impasse.)

১.০ ভূমিকা

বর্তমানে সারা বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্যের হাওয়া বইছে। মুক্ত বাণিজ্যের এই যাত্রা কিন্তু শুধুমাত্র গ্যাট কিংবা তার উত্তরসূরী ডব্লুটিও'র হাত ধরে শুরু হয়নি। গ্যাট এবং ডব্লুটিও'র অনেক আগে অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো , ডেভিড হিউম প্রমুখ চিন্তাবিদগণ মুক্ত বাণিজ্যের স্বপক্ষে তাদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরেছিলেন। এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো মুক্ত বাণিজ্যের স্বপক্ষে তাদের বিখ্যাত তত্ত্ব প্রদান করে বলেছেন কম সরকারি হস্তক্ষেপ (laissez-faire) এবং মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে অপ্রচুর উৎপাদনের উপকরণের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক লাভজনক অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত এ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বটি চরম সুবিধা তত্ত্ব (Absolute Advantage Theory) এবং ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্বটি তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব (Cómparative Advantage Theory) নামে পরিচিত।

২.০ বাণিজ্যবাদী ধারণা

১৭৭৬ সালে এ্যাডাম স্মিথের 'The Wealth of Nations' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সময়ে বিশ্বে বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত বাণিজ্যবাদী (Merchantalism) ধারণার প্রচলন ছিল।

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

এই ধারণার ধারক এবং বাহক ছিলেন তৎকালীন বণিক, ব্যাংকার, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ এমনকি একদল দার্শনিকও।[১] এই বাণিজ্যবাদীরা মনে করতেন একটি দেশ শুধুমাত্র স্বর্ণ মজুত বৃদ্ধি করে এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ধনী এবং উন্নত হতে পারে। তাঁরা মনে করতেন যে, শক্তিশালী সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্বব্যপী আদৃত ধাতু স্বর্ণ মজুত বৃদ্ধি একমাত্র বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মাধ্যমেই সম্ভব। সে জন্য বাণিজ্যবাদীরা উচ্চমূল্যে প্রচুর রপ্তানী এবং আমদানী কমানোর জন্য উচ্চহারে আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের পক্ষপাতি ছিলেন। এমনকি তাঁরা রপ্তানী পণ্যের সহজ বাজারের জন্য এবং কাঁচামালের যোগানের জন্য পরদেশ দখলকেও (Colonization) সমর্থন দিতেন।[২] এই বাণিজ্যবাদীরাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেন-দেন ভারসাম্যে অনুকূল (Favourable) এবং প্রতিকূল (Adverse) শব্দের ব্যবহার শুরু করেন।[৩]

৩.০ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বসমূহ

বাণিজ্যবাদীদের এই ধারণার মূলে এ্যাডাম স্মিথ কুঠারাঘাত করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, কোন দেশের পক্ষে ক্রমাগতভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেন-দেন ভারসাম্য অনুকূল রাখা সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন হয় এবং তা কিভাবে বাণিজ্যরত দেশগুলিকে সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে তা তিনি এবং তাঁর যোগ্য অনুসারী ডেভিড রিকার্ডো তাঁদের তত্ত্বের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমে এমনকি কিভাবে আমদানী বাণিজ্যের মাধ্যমেও লাভবান হওয়া যায় সেটার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

৩.১ এ্যাডাম স্মিথের চরম সুবিধা তত্ত্ব

এ্যাডাম স্মিথ তাঁর তত্ত্বে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে laissez-faire অর্থনীতি এবং মুক্ত বাণিজ্য অবস্থায় বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানীকারক এবং রপ্তানীকারক উভয় দেশই লাভবান হবে। একটি গাণিতিক উদাহরণের মাধ্যমে এ্যাডাম স্মিথের Absolute Advantage Theory ব্যখ্যা করা যেতে পারে । মনে করি, দুটি দেশ ক এবং খ দুটি দেশই দুটি পণ্য উৎপাদন করে যথা: ধান ও কাপড় । এছাড়া অন্যান্য শর্তাবলী হলো বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্য অবস্থা বিরাজমান। এখন সারণী-১ এ লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ক ১ শ্রম-ঘন্টা সময় ব্যয় করে ৬ বস্তা ধান অথবা ৪ গজ কাপড় উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে খ ১ শ্রম-ঘন্টা সময় ব্যয় করে ১ বস্তা ধান অথবা ৫ গজ কাপড় উৎপাদন করতে পারে। এই উদাহরণ থেকে এটা স্পস্ট যে, ধান উৎপাদনে খ এর তুলনায় ক এবং কাপড় উৎপাদনে ক এর তুলনায় খ, এর চরম সুবিধা বিরাজিত। এখন চরম সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী ক ও খ এর মধ্যে বাণিজ্য হলে দুটি দেশ চরম সুবিধা অনুযায়ী দুটি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত হবে। ক ধান

১.Diminick Salvatore, *International Economics* (New York: Macmlan Publishing Company, 1983). পৃঃ১৪ ।

২. Walter Enders and Harvey E. Lapan, *International Economics: Theory and Policy,* (New Jersy: Prentice Hill, Inc., 1987), পৃঃ ২৫ ।

৩। পূর্বোক্ত ।

উৎপাদনে বিশেষীকরণ করবে অর্থাৎ বেশী ধান উৎপাদন করে তা খ দেশে রপ্তানী করে সেখান থেকে কাপড় আমদানী করবে এবং একইভাবে খ কাপড় উৎপাদনে বিশেষায়ীত করে তা ক দেশে রপ্তানী করে ক থেকে ধান আমদানী করবে।

সারণী- ১
চরম সুবিধা তত্ত্ব

দ্রব্য	ক	খ
ধান (বস্তা/শ্রম-ঘন্টা)	৬	১
কাপড় (গজ/শ্রম-ঘন্টা)	৪	৫

সারণী-১[৪] এ দেখা যায় যে ক দেশে ধান ও কাপড়ের আভ্যন্তরীণ দাম ৬:৪ অর্থাৎ ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৪ গজ কাপড় পাওয়া যায়। এখন যদি বাণিজ্যের মাধ্যমে ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৪ গজের বেশী কাপড় পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে ক দেশের জন্য লাভজনক। একইভাবে খ দেশে ধান ও কাপড়ের আভ্যন্তরীণ দাম ১:৫ অর্থাৎ ১ বস্তা ধান পাওয়া যায় ৫ গজ কাপড়ের বিনিময়ে। এখন যদি বাণিজ্যের মাধ্যমে ৫গজ কাপড়ের বিনিময়ে ১ বস্তার বেশী ধান পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে খ দেশের জন্য লাভজনক।

ধরি, ক ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে খ দেশ থেকে ৬ গজ কাপড় আমদানী করে। তাহলে ক দেশের লাভ হল ২গজ কাপড় বা ১/২ শ্রম ঘন্টা সাশ্রয় হবে। কারণ দেশের অভ্যন্তরে ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৪ গজ কাপড় পাওয়া যায়। অন্যদিকে ৬ বস্তা ধান যা খ দেশ ৬গজ কাপড়ের বিনিময়ে আমদানী করল তা খ দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যে ৬ শ্রম-ঘন্টার সমান। যা দিয়ে খ দেশের অভ্যন্তরে (৫x৬ =৩০) ৩০ গজ কাপড় উৎপাদন করতে পারে। সুতরাং খ ৬ গজ কাপড়ের বদলে ৬ বস্তা ধান ক দেশ থেকে আমদানী করার ফলে ২৪ গজ কাপড়ের সমান অথবা প্রায় ৫ শ্রম-ঘন্টা বাঁচাতে পারছে যা দিয়ে খ দেশ আরও কাপড় উৎপাদন করে আরও ধান আমদানী করতে পারবে। সুতরাং বাণিজ্য হলে উভয় দেশই বাণিজ্যপূর্ব অবস্থা থেকে উন্নততর হবার সুযোগ পাচ্ছে। চরম সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশ কোন দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা ভোগ করে। যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা ভোগ করে সে দেশ সে দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং অন্যদেশ থেকে যে দ্রব্য উৎপাদনে চরম অসুবিধা আছে সে সব দ্রব্য সামগ্রী নিজের চরম সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে আমদানী করবে । এতে করে বিশ্বে সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং অধিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

৪। সারণী-১ এবং ২ Diminick Salvatore এর *International Economics* (New York: Macmilan Publishing Company, 1983) পৃঃ ১৭-১৮ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য শুধুমাত্র দেশের নাম দুটি পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.২ ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব

অন্যদিকে ডেভিড রিকার্ডো প্রদত্ত তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র চরম সুবিধা থাকলেই যে লাভজনক বাণিজ্য সম্ভব তা নয় বরং চরম সুবিধা না থাকা সত্বেও কিভাবে দুটি দেশের মধ্যে লাভজনক বাণিজ্য সংঘটিত হতে পারে তার ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো যদি কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় দুটি দ্রব্য (আমাদের পূর্বের মডেল দুটি দেশ, দুটি দ্রব্য) উৎপাদনের ক্ষেত্রেই কম দক্ষ হয় তারপরও লাভজনক বাণিজ্য সম্ভব যদি অদক্ষ দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে কম অসুবিধা (less disadvantage) বা তুলনামূলক সুবিধা আছে (Comparative Advantage) সে দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ করে ও রপ্তানী করে এবং যে দ্রব্য উৎপাদনে বেশী অসুবিধা (More disadvantage) বা তুলনামূলক অসুবিধা আছে (Comparative disadvantage) সে দ্রব্য আমদানী করে। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। সারণী- ২ এ আমরা আমাদের আগের মডেল একটু পরিবর্তিতরূপে ব্যবহার করেছি:

সারণী-২

তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব

দ্রব্য	ক	খ
ধান (বস্তা/শ্রম-ঘন্টা)	৬	১
কাপড় (গজ/শ্রম-ঘন্টা)	৪	২

সারণী-২ এ দেখা যাচ্ছে ক দেশে খ দেশের তুলনায় ধান ও কাপড় উভয় দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা বর্তমান। আর খ দেশে দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই চরম অসুবিধা বিরাজমান। কিন্তু আমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব ক দেশে চরম সুবিধা কাপড়ের চেয়ে (৪:২) ধানের ক্ষেত্রে বেশী (৬: ১)। অর্থাৎ ক দেশে খ দেশের তুলনায় ধান উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান। আবার খ দেশে দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে চরম অসুবিধা থাকা সত্বেও কাপড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে চরম অসুবিধা কম। এর অর্থ হলো কাপড় উৎপাদনে খ দেশের তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান। এ অবস্থায় খ দেশ কাপড় উৎপাদনে বিশেষায়ন করলে এবং ক দেশ ধান উৎপাদনে বিশেষায়ন করলে দুটি দেশই লাভবান হবে।

সারণী-২ এ দেখা যাচ্ছে যে ক দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্য ৬:৪। অর্থাৎ ক দেশ ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৪ গজের বেশী কাপড় আমদানী করতে পারলে সেটা হবে লাভজনক। আবার খ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্য ১:২। অর্থাৎ খ দেশ ২ গজ কাপড়ের বিনিময়ে ১ বস্তার বেশী ধান আমদানী করতে পারলে সেটা হবে লাভজনক। ধরি ক দেশ ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৬ গজ কাপড় খ দেশ থেকে আমদানী করল । এ ক্ষেত্রে ক দেশের লাভ হল ২ গজ কাপড় বা ১/২ শ্রম ঘন্টা সময়। অন্যদিকে খ দেশের ৬ বস্তা ধান উৎপাদন করতে লাগত ৬ শ্রম ঘন্টা । কিন্তু খ দেশ ৬ শ্রম ঘন্টা সময় ব্যয় করে ৬ বস্তা ধান উৎপাদন না করে ১২ গজ

কাপড় উৎপাদন করবে এবং ৬ গজ কাপড়ের বিনিময়ে ৬ বস্তা ধান আমদানী করবে। এর ফলে খ দেশের ৬ গজ কাপড় বা ৩ শ্রম ঘন্টা সময় সাশ্রয় হচ্ছে। অর্থাৎ চরম সুবিধার অবর্তমানে শুধুমাত্র তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান থাকলেও লাভজনক বিশ্ব বাণিজ্য সম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তুলনামূলক সুবিধার পার্থক্যের কারণে দাম পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং দাম পার্থক্যের জন্যই লাভজনক বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হতে পারে। এখানে একটা ব্যপার লক্ষণীয় যে, অভ্যন্তরীণ দাম পার্থক্য যে দেশের যত বেশী থাকবে সে দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে তত লাভবান হবে। আলোচ্য উদাহরণে খ বেশী লাভবান হবার কারণ হল খ-এর বাণিজ্য পূর্ব অভ্যন্তরীণ মূল্য পার্থক্য ক-এর চাইতে বেশী ছিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বটি একটি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যখ্যা করা সম্ভব। ধরা যাক, একজন আইনজীবী যিনি প্রতি ঘন্টায় আয় করেন ১০০ টাকা এবং তার টাইপিং এ গতি মিনিটে ৫০ টি শব্দ । তার একজন মুদ্রাক্ষরিক আছে যার টাইপিং এ গতি প্রতি মিনিটে ২৫ টি শব্দ এবং তার মজুরী প্রতি ঘন্টায় ২০ টাকা। এক্ষেত্রে আইনজীবীর টাইপিং এ চরম সুবিধা থাকা সত্বেও (তার মুদ্রাক্ষরিক এর দ্বিগুণ) আইন ব্যবসাই তার জন্য লাভজনক। কারণ তিনি যদি আইন ব্যবসা বাদ দিয়ে মুদ্রাক্ষরিকের কাজ করেন তবে তিনি আয় করবেন প্রতি ঘন্টায় মাত্র ৪০ টাকা। অপরদিকে তিনি আইন ব্যবসার কাজে নিয়োজিত হলে তার আয় হয় ১০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় তিনি ৬০ টাকা পরিমাণ বেশী আয় করতে পারেন। সেজন্য আইনজীবীর মুদ্রাক্ষরিকের কাজে চরম সুবিধা থাকা সত্বেও তার তুলনামূলক সুবিধা (আইন ব্যবসা) অনুযায়ী আইন ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া হবে লাভজনক ।

৩.৩ উপাদানের প্রাচুর্যতা তত্ত্ব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই ভিত্তি তুলনামূলক খরচ সুবিধা তত্ত্ব কিন্তু কেন তুলনামূলক খরচ পার্থক্য দেখা দেয়, সেটার কোন ব্যাখ্যা দেয়না । এই তুলনামূলক খরচ পার্থক্য কেন সৃষ্টি হয় তার ব্যখ্যা দিয়েছেন বিখ্যাত সুইডিশ অর্থনীতিবিদ Eli Heckscher এবং তাঁর ছাত্র Bertil Ohlin যা Heckscher -Bertil Ohlin Theory of International Trade বা উপাদানের প্রাচুর্য তত্ত্ব বা আধুনিক বাণিজ্য তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের উপকরণ সমূহের যোগান এক রকম নয়। কোন দেশে মূলধনের প্রাচুর্য আছে আবার কোন দেশের শ্রমের প্রাচুর্য আছে। যে দেশের মুলধনের প্রাচুর্য আছে সে দেশ মূলধন নিবিড় দ্রব্য উৎপাদন করবে কারণ এখানেই তার তুলনামূলক সুবিধা থাকবে এবং কোন দেশের শ্রমের প্রাচুর্য থাকলে সে দেশ শ্রম নিবিড় দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং রপ্তানী করবে। অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের প্রাচুর্যের পার্থক্যের কারণে দাম পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং এই দাম পার্থক্যের জন্যই বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।[৫]

৫। Dominic Salvatore, *International Economics,* প্রাগুক্ত পৃঃ ৯১-১১০।

৪.০ বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্য এবং বাণিজ্য তত্ত্বসমূহ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই তত্ত্বগুলির নানা রকম সমালোচনা আছে। এখানে সমালোচনাগুলিকে উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই স্বীকৃত তত্ত্বগুলির আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যখ্যা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

উরুগুয়ে রাউন্ড পরবর্তী বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ তার বৈদেশিক বাণিজ্যকে নানাদিক দিয়ে উদার এবং রপ্তানীমুখী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্প সময়ে আমদানী শুল্কের বড় রকমের হ্রাসের ফলে বিগত অর্থ বছরগুলিতে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। সারণী -৩ এ একনজরে বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ন করা হয়েছে।

সারণী-৩
এক নজরে বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

প্রধান আমদানী খাত	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
১.খাদ্য শষ্য	২৯৭	২৬৫	১৭৬	১৫১	৪৭৬	৫৮৬	১৮৪	৩৬৯	৯৯৭	৩৮১
চাল	--	৫	---	১০	২২০	৩৫৮	২৮	২৪৭	৬৮০	১১৫
গম	২৯৭	২৬০	১৭৬	১৪১	২৫৬	২২৮	১৫৬	১২২	৩১৭	২৬৬
২. খাদ্য ব্যতিত অন্যান্য দ্রব্য	৩১৭৩	৩১৯৮	৩৮১০	৩৯১৯	৫১৬১	৬১০০	৬৫৭৬	৬৬৬২	৬৫২৫	৭৩৫৭
৩. ইপিজেড	৪০	৬৩	৮৫	১২১	১৯৭	২৬১	৪০২	৪৯৩	৪৯৬	৬৬৫
মোট (১+২+৩)	৩৫১০	৩৫২৬	৪০৭১	৪১৯১	৫৮৩৪	৬৯৪৭	৭১৬২	৭৫২৪	৮০১৮	৮৪০৩
শতকরা পরিবর্তন*	৭.৭	১.৩	১৫.৮	২.৯	৩৯.২	১৯.১	৩.১	৫.১	৬.৬	৪.৮

উৎস: বার্ষিক আমদানী ব্যয় ১৯৯৯-২০০০, পৃষ্ঠা XLI
*বাংলাদেশ সরকার, *অর্থনৈতিক জরীপ ২০০১*, পৃষ্ঠা ১৭১

সারণী-৩ এ দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় অত্যধিক দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে শুল্কহার হ্রাস এবং উদার বাণিজ্য নীতিই এর প্রধান কারণ। তাছাড়া, দেশে ক্রমবর্ধমান শিল্পের চাহিদা মেটানোর জন্যও আমদানী বেড়েছে। গত ১৪ই জুন, ১৯৯৮ সাল থেকে দেশে ৫ বছর মেয়াদী (১৯৯৭-২০০২) আমদানী নীতি কার্যকর করা হয়।[৬] নতুন এই নীতি অনুযায়ী আমদানী নিষিদ্ধ এবং শর্তযুক্ত পণ্যের সংখ্যা ১২১ এ হ্রাস করা হয়েছে এবং ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরের সর্বোচ্চ শুল্কের হার ৪২.৫% থেকে কমিয়ে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে ৪০% করা হয়েছে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ আমদানী শুল্ক হার

৬। বাংলাদেশ সরকার, অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১ (ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০১) পৃঃ ৩৮।

৩৭.৫% এ হ্রাস করা হয়েছে। ফলে আমদানীও বেড়েছে দ্রুত গতিতে। ১৯৯০/৯১ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৭%। ১৯৯৯/০০ আমদানী বাণিজ্যের বৃদ্ধির হার এসে দাঁড়ায় শতকরা ৪.৮ ভাগে।

তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের সেসব দ্রব্য সামগ্রীই আমদানী করার কথা যে ক্ষেত্রে তার তুলনামূলক অসুবিধা বর্তমান। এবং বাস্তবেও তাই হয়েছে। বাংলাদেশ সেসব সামগ্রীই আমদানী করছে যেখানে তুলনামূলক অসুবিধা বর্তমান । যেমন মূলধনী দ্রব্য সামগ্রী, পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী, গুড়ো দুধ, কাঁচা তুলা, লোহা, ইস্পাত, সার ইত্যাদি (সংযোজনী- ১)।

তবে তুলনামূলক সুবিধা/অসুবিধা এবং উপাদানের প্রাচুর্য কোন স্থায়ী ব্যাপার নয়। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এবং আরও অন্যান্য নানা কারণে এই তুলনামুলক সুবিধা/অসুবিধার পরিবর্তন হতে পারে। যেমন বাংলাদেশ ১৯৯৭/৯৮ সালে ৭৫ মি:মা:ড: মূল্যের সিমেন্ট আমদানী করে। ১৯৯৮/৯৯ সালে এই আমদানী এসে দাঁড়ায় ১০৫ মি:মা:ড: এবং ১৯৯৯/০০ সালে ৮০ মি:মা:ড: হয়েছে। অর্থাৎ সিমেন্টের আমদানী কমে যাচ্ছে। এর কারণ হলো বাংলাদেশ সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতার দারপ্রান্তে। দেশে বর্তমানে প্রায় ৪২টি সিমেন্ট কারখানা সিমেন্ট উৎপাদন করছে যাদের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১ কোটি মেট্রিক টন এবং আরও ৩৫ টি সিমেন্ট কারখানা আগামী ২০০২ সালের মধ্যে উৎপাদনে যাবে। দেশে বর্তমানে সিমেন্টের চাহিদা প্রায় ৫৫ লাখ টন। ১০% হারে বৃদ্ধি পেলে সিমেন্টের বার্ষিক চাহিদা দাঁড়াবে ৬০ লাখ টন। ২০০২ সালে প্রস্তাবাধীন কারখানাগুলোতে উৎপাদন শুরু হলে দেশে সিমেন্ট উৎপাদনে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হবে যা মান সম্মত করা গেলে রপ্তানী করা সম্ভব হবে।[৭] সুতরাং সিমেন্ট উৎপাদনে বাংলাদেশের তুলনামূলক অসুবিধা ক্রমেই তুলনামূলক সুবিধায় পরিণত হতে চলেছে। সিমেন্টের মত আরেকটি খাতের পরিবর্তন লক্ষণীয় সেটি হলো খাদ্য-শষ্য আমদানী খাত। এই খাতেও দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা ইতোমধ্যেই অর্জন করে ফেলেছে। তবে ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যার ফলে খাদ্য শষ্য উৎপাদন দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে ১৯৯৮/৯৯ সালে বাংলাদেশ ৯৯৭ মি: মা: ড: পরিমাণ খাদ্য শষ্য আমদানী করে। তবে খাদ্য শষ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে গিয়ে তৈলবীজ ও ডালের উৎপাদনের পরিমাণ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংযোজনী - ১ এ দেখা যেতে পারে যে ১৯৯০/৯১ সালে যেখানে বাংলাদেশ মাত্র ১৬ মি:মা:ড: মূল্যের পরিমাণ তৈলবীজ আমদানী করেছে সেখানে এই আমদানী ১৯৯৯/০০ সালে বেড়ে হয়েছে ৯০ মি:মা:ড:। বাংলাদেশের সিংহভাগ আমদানী হয়ে থাকে নগদ আকারে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে মোট আমদানী ব্যয় ছিল ৮০৪৩ মি:মা:ড: যার ৭২.৩ শতাংশ হয়েছে নগদ আকারে।

৭। বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচার এসোসিয়েশনের সভাপতি আহমেদ আকবর সোবহান দৈনিক, প্রথম আলো, ২২শে আগষ্ট, ২০০১ এ এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্যগুলো দিয়েছেন। তিনি অবশ্য সিমেন্ট শিল্পের স্বার্থেই এই শিল্পে নতুন বিনিয়োগ বন্ধের দাবী জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্যের যেদিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে, সেটি হলো রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার (ইপিজেড) আমদানী ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ ব্যবহার করে শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৮০ সাল হতে দেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রক্রিয়া চালু করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মংলা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ইপিজেড স্থাপনের পরিকল্পনা থাকলেও এদের মধ্যে ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে চট্টগ্রামে এবং ১৯৯৩-৯৪ সাল হতে ঢাকা ইপিজেডের কার্যক্রম শুরু হয়। তবে খুলনা ইপিজেড এখনও চালু হয়নি।

এক হিসাব অনুযায়ী জুন, ২০০০ পর্যন্ত সময়ে চট্টগ্রাম ইপিজেড অঞ্চলে ৯৮ টি ও ঢাকা ইপিজেড অঞ্চলে ৪২ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। এর মধ্যে এ-টাইপ (সম্পূর্ণ বিদেশী বিনিয়োগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান), বি-টাইপ (দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান) এবং সি-টাইপ (সম্পূর্ণ দেশী বিনিয়োগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান) শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ৮৭, ২৬ ও ২৭ টি। সারণী -৩ এ দেখা যায় যে, এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে আমদানী চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯০-৯১ সালে যেখানে ইপিজেড কর্তৃক আমদানীর পরিমাণ ছিল মাত্র ৪০ মি:মা:ড: সেখানে ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরে এই আমদানী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬৫ মি:মা:ড:।[৮]

৪.০ বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্যের অংশীদারসমূহ

বাংলাদেশের সরবরাহকারী দেশসমূহের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতই বাংলাদেশের প্রধান সরবরাহকারী দেশ। বাংলাদেশ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ভারত থেকে সর্বাধিক মালামাল আমদানী করে । নগদ এবং ওয়েজ আর্নার্স ফান্ড এর অধীনে ভারত থেকে উক্ত অর্থ বছরে ৪১৬৮.৬ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করা হয়েছে যা মোট আমদানী ব্যায়ের শতকরা ১৩.৬ ভাগ । বিগত অর্থ বছরে এই দেশ হতে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫৯০৩.১ কোটি টাকা যা ছিল মোট আমদানী ব্যয়ের ২০.৭%।[৯] উক্ত দেশ হতে প্রধান প্রধান আমদানীকৃত দ্রব্য সামগ্রী হলো: সব ধরনের তুলা, সুতা ও সুতী বস্ত্র, খাদ্য শষ্য, পরিবহণ সরঞ্জাম ও এর যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রপাতি, কফি, মশলা, রাবার ও রাবার জাতীয় সামগ্রী চুন, সিমেন্ট প্রভৃতি ছাড়াও আরও নানা ধরণের পণ্য সামগ্রী। ভারত থেকে আমদানীর মূল কারণ হলো বাংলাদেশের সাথে ভারতের যোগাযোগ সুবিধা। যে কোন পণ্য সামগ্রী স্থলপথে খুবই কম খরচে এবং কম সময়ে একমাত্র ভারত থেকেই আমদানী করা সম্ভব । পৃথিবীর খুব কম দেশই এরকম সুবিধা ভোগ করতে পারে। এমনকি ভারত থেকে কোন কোন পণ্য আমদানীর জন্য কোন পরিবহণ ব্যয়ভার আমদানীকারককে বহন করতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের আমদানীকারকগণ বাস-ট্রাকের চেসিসে শুধুমাত্র চালকের আসন সেট করে সেটিকে সরাসরি চালিয়ে বাংলাদেশে এনে থাকেন।

৮। বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক আমদানী ব্যয় ১৯৯৯/০০ (ঢাকা পরিসংখ্যান বিভাগ) পৃঃ xv
৯। পূর্বোক্ত।

চিত্র-১
বাংলাদেশে প্রধান প্রধান সরবরাহকারী দেশসমূহ

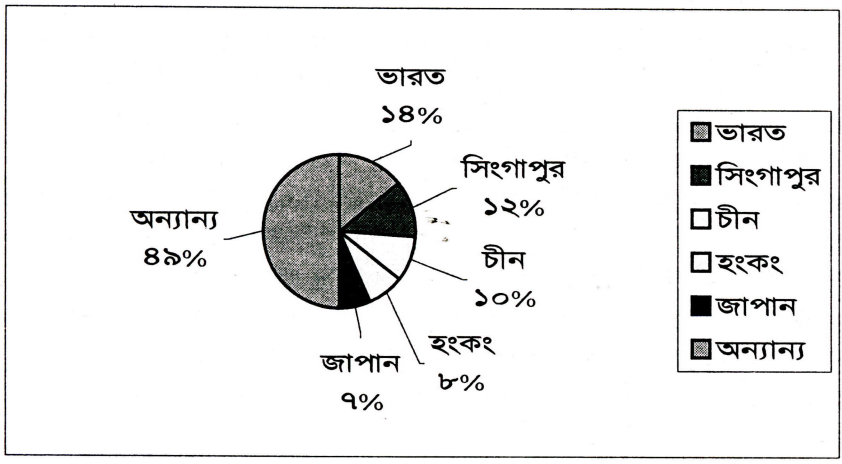

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রপ্তানী আয় ১৯৯৯/০০*

চিত্র-১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সরবরাহকারীদেশ সমূহের একটি তুলনামূলক অবস্থান দেখানো হয়েছে।

চিত্র-১ এ দেখা যাচ্ছে যে ভারতের পরেই দ্বিতীয় সর্বাধিক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে সিংগাপুরের স্থান। ১৯৯৯/০০ অর্থ বছরে সিংগাপুর হতে ৩৫১৪.২ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করা হয়েছে যা ছিল মোট আমদানী ব্যয়ের শতকরা ১১.৫ ভাগ। সিংগাপুর থেকে আমদানীকৃত প্রধান প্রধান পণ্য সামগ্রী হলো খনিজ জ্বালানী, খনিজ তেল, এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যাদি।[১০] বাংলাদেশে পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে তৃতীয় স্থানে রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে উক্ত দেশ হতে ২৭৬২ কোটি টাকার (যা মোট আমদানীর প্রায় শতকরা ৯ ভাগ) তুলা, সুতী বস্ত্র বয়লার, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ইত্যাদি আমদানী করা হয়।[১১]

বাংলাদেশে চতুর্থ বৃহত্তম সরবরাহকারী দেশ হচ্ছে হংকং। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে এই দেশ হতে ২২৮৬.২ কোটি টাকার (যা মোট আমদানী ব্যয়ের শতকরা ৭.৫ ভাগ) তুলা, সুতী বস্ত্র ও সুতী, বিভিন্ন ধরনের ফেব্রিক্স ইত্যাদি আমদানী করা হয়।[১২]

বাংলাদেশে পঞ্চম বৃহত্তম পণ্য সরবরাহকারী দেশ হলো জাপান। বাংলাদেশ জাপান থেকে প্রধানত: লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী আমদানী করে থাকে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাপান থেকে ১৯৯৩.৩ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করে যা

১০। পূর্বোক্ত,পৃঃ vi.
১১। পূর্বোক্ত।
১২। পূর্বোক্ত, পৃঃ viii.

ছিল মোট আমদানী ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৬.৫ ভাগ। ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে জাপান হতে আমদানীর পরিমাণ ছিল ১২৬৫.৮ কোটি টাকা এবং তা ছিল মোট আমদানী ব্যয়ের শতকরা ৪.৪ ভাগ।[১৩]

অধ:ক্রমানুসারে অন্যান্য দেশ হতে আমদানীর পরিমাণ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশ ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরে তাইওয়ান থেকে ১৯৪৩.৩ কোটি, কোরিয়া থেকে ১৫২৬.৭ কোটি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১০২৫ কোটি, অষ্ট্রেলিয়া থেকে ৯৬৬ কোটি, ইন্দোনেশিয়া থেকে ৮১৩.৩ কোটি, যুক্তরাজ্য থেকে ৭৯৮.৬ কোটি, থাইল্যান্ড থেকে ৭৭৪.২ কোটি, সৌদি আরব থেকে ৭০৮ কোটি, জার্মানী থেকে ৬০১.৮ কোটি, সুইজারল্যান্ড থেকে ৫৪৮.৯ কোটি, মালয়েশিয়া থেকে ৫৪০.৮ কোটি, আর্জেন্টিনা থেকে ৪৩১.৮ কোটি এবং পাকিস্তান থেকে ৪২০.২ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করেছে।[১৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ যে সব দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক অসুবিধা বর্তমান সেসব দ্রব্য সামগ্রী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করে থাকে এবং কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অসুবিধা দূর হয়ে তুলনামূলক সুবিধা দেখা দিতে শুরু করেছে।

৫.০ বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য এবং বাণিজ্য তত্ত্বসমূহ

এবার বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে । তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশের যে সব দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান সে সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করবে বা যে সব উপাদান প্রচুর সে দেশ সেসব উপাদান ব্যবহারপূর্বক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানী করবে ।

বাংলাদেশ রপ্তানীখাতের অধিক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদী (১৯৯৭-২০০২) রপ্তানী নীতি ঘোষণা করেছে এবং এ ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক ফলাফল আশা করা হচ্ছে। সারণী-৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, আসলেই বাংলাদেশে যেসব দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান সেসব দ্রব্য সামগ্রীই রপ্তানী করছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় কৃষিজাত প্রাথমিক পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করছে আবার দেশে প্রচুর অদক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্যের কারণে শ্রম নিবিড় গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ ঘটেছে এবং বর্তমানে রপ্তানীর প্রায় সিংহভাগই আসছে এই শ্রম-নিবিড় খাত থেকে (সংযোজনী-২)।

সারণী-৪ এ দেখা যায় যে, ১৯৯০/৯১ সালে তৈরী পোষাক খাত থেকে এসেছে ৭৩৬ মি:মা:ড: যা ছিল মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে খাত থেকে আয় এসেছে ৩০৮৩ মি:মা:ড: যা মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ। মোট শিল্পজাত পণ্য থেকে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পাবার কারণও কিন্তু এই তৈরী পোষাক খাত ।

১৩। পূর্বোক্ত,পৃঃ viii.

১৪। পূর্বোক্ত। পৃঃ xviii-xix

সারণী-৪
এক নজরে বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

প্রধান রপ্তানী পণ্য সমূহ এবং রপ্তানী আয়	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
ক. প্রাথমিক দ্রব্য সমূহ	৩০৭	২৬৮	৩১৪	৩৪৭	৪৫২	৪৭৬	৫২৬	৫০২	৪২২	৪৬৯
তৈরী পোষাক	৭৩৬	১০৬৪	১২৪০	১২৯২	১৮৩৫	১৯৪৯	২২৩৮	২৮৪৩	২৯৮৫	৩০৮৩
নীট ওয়্যার	১৩১	১১৯	২০৫	২৬৪	৩৯৩	৫৯৮	৭৬৩	৯৪০	১০৩৫	১২৭০
অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	৫৪৪	৫৪৩	৬২৪	৬৩১	৭৩৯	৮৬১	৯০০	৮৮৭	৮৮২	৯৩০
মোট শিল্পজাত পণ্য	১৪১১	১৭২৬	২০৬৯	২১৮৭	৩০২১	৩৪০৮	৩৯০১	৪৬৭০	৪৯০২	৫২৮৩
মোট রপ্তানী আয় (ক+খ)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮৪	৪৪২৭	৫১৭২	৫৩২৪	৫৭৫২
শতকরা পরিবর্তন	১২.৭	১৬.১	১৯.৫	৬.৩	৩৭.১	১১৮	১৪০	১৬৮	২.৯	৮.০৩

বাংলাদেশ সরকার , *অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০,* পৃ: থেকে সংকলিত ।

৫.১ বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের অংশীদারসমূহ

বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের ক্রেতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ক্রেতা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে রয়েছে যেখানে বাংলাদেশ ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে প্রায় ৭৮৫২.৪ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করেছে যা ছিল মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৩৬.৯ ভাগ।[১৫] যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যসমূহের মধ্যে তৈরী পোষাক, পাটজাত দ্রব্য, মাছ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য এবং কাঁচাপাট ইত্যাদি ছিল প্রধান। তবে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রধানতম রপ্তানীপণ্য ছিল তৈরী পোষাক, যা থেকে এককভাবে আয় হয়েছে ৬৬৭৯.৯ কোটি টাকা, যা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ।[১৬] বাংলাদেশী পণ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা হলো জার্মানী। ৯৯/০০ অর্থবছরে এই দেশে বাংলাদেশ ২৫৭১.১ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করেছে যা মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ১২.২ ভাগ।[১৭]

বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হলো যুক্তরাজ্য। এই দেশ ৯৯/০০ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে ১৯৪২.১ (মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৯.১ ভাগ) কোটি টাকার তৈরী পোষাক, মাছ, চা, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, শাক-সব্জি, ফল ইত্যাদি আমদানী করে। ফ্রান্স বাংলাদেশ থেকে ১৩৬৩.২ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের পণ্যের প্রধান প্রধান ক্রেতা দেশগুলোর একটি তুলনামূলক অবস্থান চিত্র-২ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

১৫। বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রপ্তানী আয় ১৯৯৯/০০ (ঢাকা-পরিসংখ্যান বিভাগ) পৃঃ x.

১৬। পূর্বোক্ত।

১৭। পূর্বোক্ত।

চিত্র-২
বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান ক্রেতা

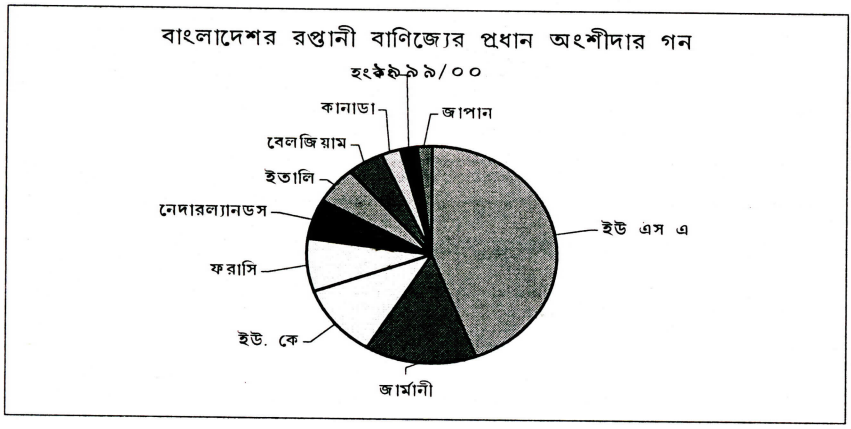

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রপ্তানী আয় ১৯৯৯/০০* পৃ: x-xi

৬.০ বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের সাম্প্রতিক সমস্যাসমূহ

নানা কারণে বাংলাদেশের রপ্তানীদ্রব্যের বাজার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে যে সমস্ত তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান ছিল তা দৃশ্যত তুলনামূলক অসুবিধায় পরিণত হতে চলেছে। সাম্প্রতিক আফগান যুদ্ধের ফলে জুলাই- আগষ্ট মাস জুড়ে কারখানাগুলো যখন প্রচন্ডভাবে ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন ধরনের পোষাক তৈরীর কাজে, সেই একই সময়ে এ বছর (২০০১ সালে) পোষাক রপ্তানী আয় আশংকাজনক হারে প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে।[১৮] এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। বাংলাদেশ তার মোট তৈরী পোষাক রপ্তানীর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে। বস্তুত মার্কিন অর্থনীতির মন্দাভাবের প্রভাবে পড়েছে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক খাত। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার জের বাংলাদেশেও এসে পড়েছে। এর ফলে ইতোমধ্যে সাময়িকভাবে ২০০ এর মত তৈরী পোষাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।তবে এখন পর্যন্ত ইউরোপে বাংলাদেশ রপ্তানী করতে পারছে এইটুকুই যা সান্ত্বনা। দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির তৈরী পোষাকের দাম ব্যপকহারে পড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, গত বছর যে পণ্যের দাম ছিল ৯০ ডলার এবার তা ১২ ডলারে নেমে এসেছে।[১৯]

তাছাড়া, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানী পণ্যগুলো প্রচন্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বছর আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের প্রায় ৭২ টি দেশকে তৈরী পোষাক রপ্তানীতে শুল্ক ও কোটা মুক্ত সুবিধা দিয়েছে। পোষাক

১৮। দৈনিক প্রথম আলো, (ঢাকাঃ ২২শে আগষ্ট, ২০০১)
১৯। পূর্বোক্ত।

শিল্পের সবচেয়ে বড় রপ্তানীকারক দেশ হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাজারে এবার বিশেষ সুবিধা পেতে যাচ্ছে ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ৪২ টি পণ্যকে সেদেশে শুল্কমুক্ত রপ্তানীর সুবিধা দিয়েছে।[২০] এতে করে বাংলাদেশ নতুন চাপের মুখে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই চাপ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার টাকার অবমূল্যায়ন করছে। ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ২০০১ সালের মে পর্যন্ত ডলারের বিপরীতে টাকা ১৮ বার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।[২১] যদিও রপ্তানী প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবমূল্যায়ন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কতটুকু ফলদায়ক তা ভাবার বিষয়।

বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য আরেকটি বিশেষ কারণে হুমকির সম্মুখীন, আর তা হলো তৈরী পোষাকের উপর নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরতার কুফল বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ভোগ করতে শুরু করেছে। গত ২২ শে নভেম্বর ২০০১ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নও বাংলাদেশকে তার রপ্তানী পণ্যের পরিধি বাড়াতে এবং তৈরী পোষাকের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে পরামর্শ দিয়েছে। পণ্যের বিচিত্রতা এবং বহুমুখীতা আনা এবং নতুন নতুন বাজার খুজে পাবার ওপরই যে বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ তা এক কথায় সকলকেই স্বীকার করতে হবে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সব পণ্য একদিনে বাজার পায়না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান রপ্তানী পণ্য তৈরী পোষাক থেকে প্রাপ্ত আয় একদা বিবিধ খাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশের বর্তমান ধ্বসে যাওয়া রপ্তানী বাণিজ্যকে চাঙ্গা করতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত জরুরী। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটা হচ্ছে। বিশ্ব যেখানে অধিকহারে মুক্ত হবার অঙ্গীকার করছে সেখানে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের প্রবেশ সংকুচিত করবার প্রয়াস নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভারত বাংলাদেশের ব্যাটারী রপ্তানীর ওপর এন্টি ডাম্পিং শুল্ক দিচ্ছে যা সাপটা চুক্তির ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের আওতায় পড়েনা। অথচ বাংলাদেশ ভারত থেকেই সর্বাধিক দ্রব্য সামগ্রী আমদানী করে থাকে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের বৈধ বাণিজ্য ঘাটতি বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৫২ কোটি টাকা। ২০০০/২০০১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারত থেকে মোট ৬ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করেছে অপরদিকে রপ্তানী করেছে মাত্র ৩৩১ কোটি টাকার।[২২] প্রায় তিন বছর আগে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের নিকট বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশের ২৫ টি পণ্য ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের প্রস্তাব করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা মেনে নিলেও তা ভারত আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেনি।[২৩]

২০। পূর্বোক্ত।
২১। পূর্বোক্ত।
২২। দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকাঃ ২৪শে ডিসেম্বর, ২০০১)।
২৩। পূর্বোক্ত।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, এশিয়া উইকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের রপ্তানী আয় ছিল ৪ হাজার ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার যা সার্ক দেশগুলোর মধ্যে প্রথম। অন্যদিকে বাংলাদেশ যার অবস্থান সার্কদেশসমূহের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ তার রপ্তানী আয় মাত্র ৫৮০ কোটি মার্কিন ডলার।[২৪] অর্থাৎ ভারতের সাথে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার কোন প্রশ্নই আসে না অথচ তারপরেও বাংলাদেশকে ভারত তার বৃহৎ আয়তনের সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত করছে। তবে একথা সত্য যে, বাংলাদেশ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্য পরিধি বাড়ানোর সুযোগ পেলে বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় দেশই লাভবান হবে।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে বড় ধরণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এই ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের তৈরী পোষাক, চা, হিমায়িত খাদ্য, পাট ও চামড়াসহ রপ্তানীর প্রধান ১৩ খাতের আয় অনেক কমে গেছে। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী গত অক্টোবর মাসে রপ্তানীতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩৩ দশমিক ২০ শতাংশ ঘাটতি পড়েছে আর গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ৪১ শতাংশ রপ্তানী হ্রাস পেয়েছে।[২৫]

৭.০ উপসংহার

রপ্তানী বাণিজ্যের এই ক্রমবর্ধমান ঘাটতি হ্রাসে এবং দেশের রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহের উন্নয়নে কার্যকর এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, এবং নতুন নতুন ফ্যাশন এবং ডিজাইনের উদ্ভাবন করতে হবে। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য তৈরী পোষাক শিল্পের জন্য শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ (Backward linkage) শিল্প গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। এর পাশাপাশি সম্ভাবনাময় বেশ কিছু খাত যেমন সফটওয়্যার এবং ডাটা প্রসেসিং, চামড়া শিল্প, জুয়েলারী, প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, পোলট্রি খামার ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে রপ্তানী পণ্যে বহুমুখীতা আনয়ন জরুরী। তাছাড়া সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ফরোয়ার্ড লিংকেজ (Forward linkage) শিল্প স্থাপন করেও রপ্তানী পণ্যে বিচিত্রতা আনয়ন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ হিমায়িত খাদ্য দেশেই প্রসেস করে রেডী ফুড হিসেবে রপ্তানী করা যেতে পারে। তাছাড়া কিছু অপ্রচলিত পণ্য যেমন সুগন্ধি চাল এবং পান পাশ্ববর্তী দেশসমূহে সরকারি উদ্যোগে রপ্তানীর চেষ্টা করা যেতে পারে। সর্বোপরি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য মিশনগুলোকে রপ্তানী পণ্যের বাজার সংরক্ষণ এবং নতুন বাজারের সন্ধানে কার্যকর এবং দক্ষ ভূমিকা নিতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানী বাড়াতে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বৈদেশিক বাণিজ্য মিশনগুলোকে পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[২৬] একই সঙ্গে নতুন নতুন তুলনামূলক সুবিধা খুজে দেখাও একান্ত জরুরী।

২৪। দৈনিক প্রথম আলো, (ঢাকাঃ ২২শে আগষ্ট, ২০০১)।

২৫। দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকাঃ ২৪শে ডিসেম্বর, ২০০১)।

২৬। দৈনিক প্রথম আলো, (ঢাকাঃ ২৫শে আগষ্ট, ২০০১)।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে যত তত্ত্বকথাই বলা হোক না কেন এই বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণ একান্ত জরুরী । এখানে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সরকারকে সমাজের সর্বস্তরে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে যাতে বিদেশী বিনিয়োগকারী এবং রপ্তানীকারকগণ আস্থা খুঁজে পান। আর এভাবেই হয়ত বাংলাদেশ বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠবে।

সংযোজনী - ১
বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্যের একটি প্রবাহ চিত্র (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

প্রধান আমদাণীকৃত দ্রব্য সামগ্রী	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
১.খাদ্য শষ্য	২৯৭	২৬৫	১৭৬	১৫১	৪৭৬	৫৮৬	১৮৪	৩৬৯	৯৯৭	৩৮১
চাল	--	৫	---	১০	২২০	৩৫৮	২৮	২৪৭	৬৮০	১১৫
গম	২৯৭	২৬০	১৭৬	১৪১	২৫৬	২২৮	১৫৬	১২২	৩১৭	২৬৬
২. খাদ্য ব্যতিত অন্যান্য দ্রব্য	৩১৭৩	৩১৯৮	৩৮১০	৩৯১৯	৫১৬১	৬১০০	৬৫৭৬	৬৬৬২	৬৫২৫	৭৩৫৭
দুগ্ধজাতীয় পণ্য	৭২	৬৩	৬৫	৩৭	৪১	৫৩	৫৩	৪৫	৫৬	৬০
মশলা	১৯	১৫	২৪	২২	১৬	২৩	১০	১০	২৭	১৮
তৈল বীজ	১৬	৯	৩৫	৪০	৮০	৮৯	৬২	৯৩	১০০	৯০
ভোজ্য তেল	১৫৩	১৬৩	১৫২	১১৭	২২০	১৭৯	২১৬	২১৬	২৮৭	২৫৬
নারিকেল তেল	৩	১১	২	২	৪	৫	৫	৬	৫	৬
চিনি	--	১	১৩	১৩	৩২	৬	৪৯	২৯	৪২	৩০
সিমেন্ট	৭৫	৭৭	১১৫	১০০	১১৬	১৭১	১৫৬	১৫২	১০৫	৮০
ক্রুড পেট্রোলিয়াম	১৪৪	১৫২	১৮১	১১৬	১৭৭	১৬৬	১৭৪	১৪০	১১৮	২৩২
পিওএল	২০৪	১৬৮	১৭২	১৬৮	২০৬	২৯০	৩৪১	২৯৫	২৭০	৪০৬
কেমিক্যালস	১২৫	১০১	১২৬	১৪৪	১৫৫	২০১	২৫৭	২৪৮	২৫০	২৭৮
ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য	৯	২৫	১৩	১৫	১৬	২০	২২	২৭	২৯	২৭
সার	৯০	১১৭	১৩১	১৩৫	১৪২	৯৭	১৫০	১০৮	১২০	১৪০
ডাইং , ট্যানিং ইত্যাদি	২০	২২	৩৪	৩৬	৫০	৫৫	৬২	৬৬	৬৬	৭১
কাঁচা তুলা	৬৮	৭১	৮২	৭২	১৩৫	১৮৫	১৯৫	২০৭	২৩৩	২৭৭
ইয়ার্ন	৫২	৯২	১২৭	১৬৮	২০০	২৯৬	৩৯৫	৩২৭	২৮৩	৩০০
টেক্সটাইল ও অন্যান্য	৪১১	৫১২	৬৮৭	৮৪১	১০২৫	১০৪৩	১০৯৮	১২৬৪	১১০৯	১১৫৩
ষ্ট্যাপল ফাইবার	১২	১৯	৩১	৩১	৪০	৪৩	৪৫	৪৮	৩৯	৪৩
লৌহ ও ইস্পাত	৯৭	৯৯	১০৬	১৩০	২০৬	৩২২	৪৩৭	৩৯১	৩৪৫	৩৯৩
মূলধনী দ্রব্যাদি	১২৩১	১২৮৯	১৩৪৬	১২৯৯	১৬৮৮	১৯৬৮	১৯৩৭	২০৭২	১৯৬৯	২১৩৩
অন্যান্য	৩৭২	১৯২	৩৬৮	৪৩৩	৬১২	৮৮৮	৯১২	৯১৮	১০৭২	১৩৬৪
সাব টোটাল	৩৪৭০	৩৪৬৩	৩৯৮৬	৪০৭০	৫৬৩৭	৬৬৮৬	৬৭৬০	৭০৩১	৭৫২২	৭৭৩৮
ইপিজেড	৪০	৬৩	৮৫	১২১	১৯৭	২৬১	৪০২	৪৯৩	৪৯৬	৬৬৫
মোট	৩৫১০	৩৫২৬	৪০৭১	৪১৯১	৫৮৩৪	৬৯৪৭	৭১৬২	৭৫২৪	৮০১৮	৮৪০৩

উৎস ঃ বার্ষিক আমদানী ব্যয় ১৯৯৯-২০০০, পৃষ্ঠা XLI

সংযোজনী-২

সংযোজনী -২
বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের একটি প্রবাহ চিত্র (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
ক)প্যাথমিক পন্যসমুহ										
১। কাচা পাট	১০৪	৮৫	৭৪	৫৭	৭৯	৯১	১১৬	১০৮	৭২	৭২
২। চা	৪৩	৩২	৪১	৩৮	৩৩	৩৩	৩৮	৪৭	৩৯	১৮
৩। হিমায়িত খাদ্য	১৪২	১৩১	১৬৫	২১১	৩০৬	৩১৪	৩২১	২৯৪	২৭৪	৩৪৪
৪। কৃষিজ পণ্য	৮	১০	১৫	১৫	১৩	২২	২৯	৩৯	২২	১৮
৫।অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমুহ	১০	১০	১৯	২৬	২১	১৬	২২	১৪	১৫	১৭
মোট প্রাথমিক দ্রব্য সমুহ (১-৪)	৩০৭	২৬৮	৩১৪	৩৪৭	৪৫২	৪৭৬	৫২৬	৫০২	৪২২	৪৬৯
খ. শিল্পজাত পণ্য										
৬। পাটজাত দ্রব্য সমূহ	২৯০	৩০১	২৯২	২৮৪	৩১৯	৩২৯	৩১৮	২৮১	৩০৪	২৬৬
৭। চামড়া	১৩৪	১৪৪	১৪৮	১৬৮	২০২	২১২	১৯৫	১৯০	১৬৮	১৯৫
৮। ন্যাপথা ফার্নেস অয়েল এবং বিটুমিন	৩২	৮	৩৭	১৬	১৪	১১	১৬	১১	৫	১১
৯। তৈরী পোষাক	৭৩৬	১০৬৪	১২৪০	১২৯২	১৮৩৫	১৯৪৯	২২৩৮	২৮৪৩	২৯৮৫	৩০৮৩
১০। নীট ওয়্যার	১৩১	১১৯	২০৫	২৬৪	৩৯৩	৫৯৮	৭৬৩	৯৪০	১০৩৫	১২৭০
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	৪০	২৫	৫৫	৫৪	১০৮	৯৮	১০৮	৭৪	৭৯	৯৪
১২। কাগজ ও সহজাত দ্রব্য	৫	৬	৩	--	--	--	--	--	--	--
১৩।হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫	৯	৫	৭	৬	৬	৬	৬	৮	৫
১৪। ইনিজনিয়রীং দ্রব্য	৬	৯	১৮	৪	১০	১৩	১৬	২০	১১	৮
১৫। অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য	৩২	৪১	৬৬	৯৮	১৩৪	১৯১	২৪১	৩০৫	৩০৭	৩৫১
মোট শিল্পজাত পণ্য (৬-১৫)	১৪১১	১৭২৬	২০৬৯	২১৮৭	৩০২১	৩৪০৮	৩৯০১	৪৬৭০	৪৯০২	৫২৮৩
মোট রপ্তানী আয় (ক+খ)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮৪	৪৪২৭	৫১৭২	৫৩২৪	৫৭৫২
শতকরা পরিবর্তন	১২.৭	১৬.১	১৯.৫	৬.৩	৩৭.১	১১.৮	১৪.০	১৬.৮	২.৯	৮.০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ সরকার, *অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১*

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Enders, Walter and Harvey E. Lapan. *International Economics: Theory and Policy.* New Jersy: Prentice Hill, Inc., 1987.

Ricardo, David. *The Principles of Political Economy and Taxation.* Homewood III: Irwin, 1963.

Salvatore, Dominick. *Theory and Problems of International Economics 2nd ed.* New York: Mc Graw Hill, 1984.

Salvatore,Diminick. *International Economics.* New York: Macmilan Publishing Company, 1983.

Smith, Adam. *The Wealth of Nations.* New York: The Modern Library, 1934.

আইয়ূব, মিয়া মুহাম্মদ এবং আবুল কাসেম হায়দার (সংগ্রহ ও সংকলন)। *বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা।* ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০০।

দৈনিক প্রথম আলো ঢাকা: ২৫ শে আগষ্ট, ২০০১।

দৈনিক ইত্তেফাক ঢাকা: ২৪ শে ডিসেম্বর, ২০০১।

দৈনিক প্রথম আলো। ঢাকা: *২২ শে আগষ্ট, ২০০১।*

বাংলাদেশ ব্যাংক। *বার্ষিক আমদানী ব্যয় ১৯৯৯/০০* । ঢাকা:পরিসংখ্যান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *বার্ষিক রপ্তানী আয় ১৯৯৯/০০।* ঢাকা:পরিসংখ্যান বিভাগ ।

বাংলাদেশ সরকার, *অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১* । ঢাকা: অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০১।

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ইতোপূর্বেকার ষান্মাসিক প্রশাসন সমীক্ষা) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এ'টি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্ণাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি, এ মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।
- লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পান্ডুলিপির সঙ্গে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ
  বাংলা কম্পোজ ঃ "প্রশিকা শব্দ (লিপি নরমাল)" ফন্ট
  ইংরেজী কম্পোজঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট।
- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হবে।
- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- মূল কপিসহ পান্ডুলিপির ২(দুই) প্রস্ত (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।
- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পাদটিকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খন্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।
- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।
- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।
- মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং মেসার্স ইছামতি অফসেট প্রেস, ১/১ ডিআইটি রোড, হাজীপাড়া, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ষান্মাষিক বাংলা জার্নাল) টাঃ ২০/-
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা টাঃ ৪০/-

২। Bangladesh Journal of Public Administration
Vol-1, No. 1&2
Vol-2, No. 1&2
Vol-3, No. 1&2 টাঃ ২০/-
Vol-4, No. 1&2 টাঃ ৪০/-
Vol-5, No. 1&2
Vol-6, No. 1&2
Vol-7, No. 1&2

৩। Post Entry Training in Bangladesh Civil Service টাঃ ৪০/-

৪। Career Planning in Bangladesh টাঃ ১২০/-

৫। Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh: A Case Study of Gonoshasthaya Kendra টাঃ ৪০/-

৬। Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of RD-1 Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৭। বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসে মহিলা টাঃ ১২০/-

৮। Sustainability of Primary Education Project: A Case Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৯। Co-ordination in Public Administration in Bangladesh টাঃ ১০০/-

১০। (ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (board binding) টাঃ ১৫০/-

(খ) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (Paper back) টাঃ ১২৫/-

১১। প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতা টাঃ ৭০/-

১২। Social and Administrative Research in Bangladesh টাঃ ৭০/-

১৩। Problems of Municipal Administration টাঃ ২৮/-

১৪। Bangladesh Public and Senior Civil Servants টাঃ ৫০/-

১৫। প্রশাসনের মূলনীতি টাঃ ১৮/-

১৬। অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ টাঃ ৬/৫০

১৭। সরকারী কর্মকাণ্ডে মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা টাঃ ৬/৫০

১৮। প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি টাঃ ৬/৫০

১৯। Famine Manual টাঃ ৭/-

২০। The Deputy Commissioner in East Pakistan টাঃ ১৬/-

২১। Social Change and Development Administration in South Asia টাঃ ৪৫/-

২২। Hospital Administration টাঃ ১৮/-

২৩। District Administration in Bangladesh টাঃ ২২/-

২৪। Hand Book for the Magistrates টাঃ ১০০/-

২৫। লোক-প্রশাসন সাময়িকী ১ম সংখ্যা-১৫তম সংখ্যা টাঃ ১৫/-

২৬। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি টাঃ ১২৫/-

২৭। Bureaucracy in Bangladesh Perspective টাঃ ৫০০/-

২৮। Limiting the Rule of State Prescription of the World Bank and the Bangladesh Economy টাঃ ১০০/-

২৯। The Assessment of EL. Nino Impacts and Responses টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।